প্রশ্নোত্তর

অধ্যাপক গোলাম আযম

www.amarboi.org

প্রশ্নোত্তর

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৮৬

১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৯ ; ২য় প্রকাশ ১৯৯৮ ; ৩য় প্রকাশ ২০০০ ;

৪র্থ প্রকাশ (আধুঃ ১ম)

শাওয়াল	১৪২৭
কার্তিক	১৪১৩
নভেম্বর	২০০৬

বিনিময় মূল্য ঃ ১৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

PRASHNOTTAR (A Collection of varieties of question & Answers on Islam) by Prof. Ghulam Azam, Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 140.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রাসঙ্গিক কথা

মাসিক পৃথিবী ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে আমার লেখা যেসব প্রশ্নের জওয়াব প্রকাশিত হয়েছে সেসবের সংকলিত রূপই হলো 'প্রশ্নোত্তর' নামের এ বইটি।

১৯৮৯ সালে স্নেহভাজন সোলায়মান আহসানের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সংকলনটি তৈরি হয় এবং মাওলানা মুহাম্মদ মূসা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও বিন্যাসে মূল্যবান অবদান রাখেন। আমি তাদের উভয়ের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞ।

সাহিত্য প্রকাশনার পক্ষ থেকে স্নেহাস্পদ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'প্রশ্নোত্তরের আসর' নামে এ সংকলনটি প্রথম প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে সোলায়মান আহসান আরও কতক প্রশ্নোত্তর ঐ সংকলনের সাথে শামিল করে এর কলেবর বৃদ্ধি করেন। এর জন্যও শুকরিয়া জানাই।

প্রশ্নোত্তর নামে গ্রন্থমালঞ্চ নামক এক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বর্ধিত আকারে সংকলিত এ বইটি ১৯৯৮ এর জানুয়ারীতে প্রকাশ করে। আল আযামী পাবলিকেশন্স ২০০০-এর মে-তে বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে। এখন বইটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব আধুনিক প্রকাশনীকে দিলাম।

এ গ্রন্থটির সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের খিদমত আল্লাহ্ পাক কবুল করুন। আমীন!

মে, ২০০৬
মগবাজার

গোলাম আযম

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

মানুষকে মানুষ হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই। আবার মুসলমান হতে হলেও জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে তার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন—এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানই তাকে পরিশিলিত সংস্কৃতিবান, দায়িত্বশীল উন্নত মানুষ হতে সহায়তা করে। ইসলামী জীবন যাপনের জন্য ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয় থেকে শুরু করে বিস্তৃত নানা দিক আমাদের জানা থাকা দরকার। ইল্‌মহীন ব্যক্তি আমলেও ব্যর্থ হন। বিশেষ করে অনেক সময় মানুষ সওয়াবের কাজ মনে করে অজ্ঞতা বশতঃ অবলীলায় গোনাহর কাজ করতে থাকেন। এ অবস্থা থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের সাথে পরিচিত হওয়া। আধুনিক সময়ে মানুষ নানা রকম নতুন বিষয়ের সাথে পরিচিত হচ্ছে এবং জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হচ্ছে। এমতাবস্থায় সিয়াম, সালাত, হজ্জ ও যাকাত-এর সাথে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও খেলাধুলাসহ বিস্তৃত বিষয়ে সমৃদ্ধ ব্যাপক সমাদৃত বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ্ ও নন্দিত জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম-এর প্রশ্নোত্তর গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলের চিন্তার খোরাক যোগাতে সহায়ক হবে।

একটি বই শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে প্রকাশ ও পরিবেশন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে মুদ্রণ ত্রুটি এড়ানো আরো কঠিন। আমরা নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। এর পরও কারো কাছে কোন ত্রুটি লক্ষিত হলে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর করলে আমরা বাধিত হবো।

পরিশেষে আধুনিক প্রকাশনীর জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করছি।

—প্রকাশক

www.amarboi.org

সূচীক্রম

কুরআন শরীফ ১১
ইসলাম ২৭
নামায ৩৬
সিয়াম ৪৮
যাকাত ৪৯
হজ্ব ৫১
পোশাক ৫৩
পর্দা ৫৭
বিবাহ ও তালাক ৬১
নির্যাতীতা স্ত্রী ৬৮
তালাকের অপব্যবহার রোধ ৬৮
হালাল-হারাম ৭০
ঘুষ ও জুয়া ৭৫
অর্থনীতি ৭৮
মীরাস (উত্তরাধিকার) ৮৩
তকদীর ৮৭
ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন ৯১
ইসলামী সমাজ ১১৪
রাজনীতি ১৪১
আন্তর্জাতিক ১৫০
ইতিহাস-ঐতিহ্য ১৫১
গান-ছায়াছবি ও খেলাধুলা ১৫৩
ইসলামী সাহিত্য ১৫৭
বিবিধ বিষয় ১৫৯

www.amarboi.org

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন, একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফুরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

৩ : ১৯

www.amarboi.org

কুরআন শরীফ

প্রশ্ন ঃ টাকার বিনিময়ে আলেমদের দ্বারা কুরআনখানি করালে কোনো সওয়াব আছে কি ?

উত্তর ঃ আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোক মারা গেলে কুরআন খতম করে মৃতের জন্য সওয়াব পাঠানো হয়। মৃতের সন্তানাদি, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব স্বাভাবিকভাবেই মৃতের প্রতি মহব্বতের কারণে কুরআন খতম করে সওয়াব পৌছানোর চেষ্টা করে। কুরআন তিলাওয়াত খুবই ভালো কাজ। মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলে সওয়াব ছাড়া তাদেরকে আর কিছুই পাঠানো যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ধনী লোকেরা কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য সময় খরচ করতে চায় না বা অনেকেই কুরআন ঠিকমতো পড়তে জানে না বলে আলেম-হাফেজ ও ক্বারীদের এনে কুরআন খতম করায়। যারা আত্মীয় নয় তারা নিজেদের গরজে কেন সময় খরচ করতে আসবে ? তাই ধনী লোকেরা কুরআন খতমের বিনিময়ে তাদেরকে টাকা-পয়সা দেয়। এভাবে যারা টাকার বিনিময়ে কুরআন পড়ার জন্য দাওয়াত করে আনে তারা এটাকে রেওয়াজ বানিয়ে নিয়েছে।

যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে জানে তারা যদি টাকা পাওয়ার নিয়তে আসে তাহলে এ তিলাওয়াতে কোনো সওয়াবই হবে না। যদি সওয়াব না হয়, তাহলে মৃতের জন্য কী পাঠাবে ? আল্লাহর ওয়াস্তে নিঃস্বার্থভাবে যদি তিলাওয়াত না করা হয়, তাহলে এ দ্বারা মৃতের কোনো উপকার হবে না।

তা ছাড়া মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব পৌছানোর এ ধরনের রেওয়াজ বা পদ্ধতি নবী করীম (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম এমনকি তাবেঈদের যুগেও চালু ছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এটাকে অনেক আলেম এক ধরনের বিদয়াত বলেই মনে করেন।

প্রশ্ন ঃ না বুঝে কুরআন (দেখে বা মুখস্থ) পড়া অর্থহীন-কথা কি সত্য ?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদ আল্লাহর বাণী। আল্লাহ পাক দুনিয়ার মানুষকে কুরআনের মারফতেই সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাই কুরআন শুধু পাঠ বা তিলাওয়াত করার জিনিসই নয়, অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেও পাঠ করা কর্তব্য। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কী উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন তা না বুঝলে পালন করাই-বা কিভাবে সম্ভব ? এদিক লক্ষ্য করেই কোনো কোনো লোক মন্তব্য করেন—'না বুঝে কুরআন পড়া একেবারেই বেহুদা কাজ।'

www.amarboi.org

কিন্তু তারা যদি বিষয়টিকে আর একদিক হতে বিবেচনা করেন তাহলে এ ধরনের মন্তব্য কিছুতেই করতে পারবেন না। ধরুন, এমন এক ব্যক্তি মুসলমান হলো যার মাতৃভাষা আরবী নয় এবং তার পক্ষে আরবী ভাষা বুঝার মতো বিদ্যা অর্জন করাও সম্ভব নয়। এ ব্যক্তি কি বুঝতে অক্ষম বলে কুরআন পড়বে না ? যদি না বুঝে পাঠ করা বা মুখস্থ পড়া অর্থহীন হয়, তাহলে কি নামাজে ক্বিরাআতও পড়বে না ? এ অবস্থায় যারা আরবী ভাষা বুঝতে সক্ষম, একমাত্র তাদেরই মুসলমান হওয়া সম্ভব। অথচ মুসলমান হওয়াকে আরবী ভাষার জ্ঞানের শর্তাধীন করা হয়নি।

আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করাই মুসলমান হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আরবী ভাষা জানা প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য ফরযে আইন নয়। মুসলিম সমাজে এরূপ কতক আলেম থাকা ফরযে আইন—যাঁদের নিকট হতে সাধারণ মুসলমানগণ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের সুন্নাত কী তা জানতে পারে। এ হিসেবে আরবী ভাষা শিক্ষা করাকে মুসলমানদের উপর 'ফরযে ক্বেফায়া' বলা যেতে পারে।

যারা আরবী ভাষা বুঝতে অক্ষম তারা আল্লাহর বিধান ও রাসূলের তরীকা মাতৃভাষার মাধ্যমে আলেমগণের নিকট হতে শিক্ষা করে মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করবেন। আল্লাহ পাক কোনো অসম্ভব কাজ মানুষের উপর চাপিয়ে দেন না। আরবী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে অনেকের বেলায়ই তা অসম্ভব হতো। কিন্তু একথা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করতে হবে যে, যেসব মুসলমান ১৫/২০ বছর সময় ব্যয় করে বি.এ/এম.এ/ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডাক্তারী ইত্যাদি ডিগ্রী হাসিল করলেন তাদের পক্ষে কুরআন বুঝার যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ তারাই সমাজের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী হন ; সাধারণ মুসলমানগণ তাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। তাই কুরআনের ভাষা বুঝে সমাজকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালনা করার দায়িত্ব ঐসব ডিগ্রিধারীদেরই। যারা কুরআন ও হাদীসের ইল্‌ম হাসিল করেন এবং অজ্ঞ সমাজকে ইসলামের আলো বিতরণ করেন তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব হতে দূরে থেকে এসব ডিগ্রিধারীর অবহেলিত দায়িত্ব পালনের-ই চেষ্টা করেন। তাই দায়িত্বের দিক দিয়ে হিসেব করলে ঐ ডিগ্রিধারী রাষ্ট্রনায়কগণের উপরই মুসলিম হিসেবে কুরআনকে ভালরূপে বুঝার চেষ্টা করা ফরযে আইন। আলেম সমাজে মুসলিম সমাজের সর্বসাধারণের উপর প্রযোজ্য ফরযে কেফায়ার দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্ত এর দ্বারা সমাজ পরিচালকদের ঐ ফরযে আইনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাঁদের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্তই থাকবে।

যারা শুধু রোজগারের জন্য এতো গবেষণা ও পরাশুনা করতে সক্ষম, তারা ডিগ্রি হাসিলের জন্য এবং অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে বহু বিদেশী ভাষাও শিক্ষা করেন। অথচ মূর্খ লোকেরা বহু টাকা-পয়সা উপার্জন করে। তাই মুসলিম হিসেবে শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কুরআন বুঝতে চেষ্টা করা অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা কুরআনকে না বুঝলে মুসলিম নেতৃত্বই গড়ে উঠতে পারে না।

www.amarboi.org

এখন প্রশ্ন হলো, যারা কুরআন বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম বা এখনও সেই যোগ্যতা অর্জন করেনি। তারা না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করবেন কিনা ? এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (সঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন—'কুরআন তিলাওয়াতকারী প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্য দশটি করে পুরস্কার পাবেন।' তিনি এখানে বুঝে পড়ার শর্ত আরোপ করেননি। কিন্তু সে রাসূলই আবার বলেছেন-'আলেম ব্যক্তি আবেদের চেয়ে ততখানি শ্রেষ্ট, পূর্ণ চন্দ্র সমস্ত তারকার উপর যতখানি শ্রেষ্ঠ।' এটা হতে বুঝা যায় যে, কুরআন বুঝে পড়লে অসীম পুরস্কার ও উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবে, কিন্তু না বুঝে পড়লেও আল্লাহ তাকে বঞ্চিত করবেন না, যদিও পুরস্কার স্বাভাবিকভাবেই কম হবে। সে কমটুকুও এই যে, প্রতি অক্ষরের জন্য দশটি করে পুরস্কার দেয়া হবে। এ প্রসংগে এটুকু জেনে রাখা দরকার, কোনো বইয়ের কথা বুঝার অর্থ এই যে, পাঠক বা শ্রোতার মনে তার প্রভাব পড়ে। যে ব্যক্তি কুরআনকে আল্লাহর বাণী মনে করে অর্থ না বুঝেই পড়ে তার অন্তরে যে পবিত্রভাব জাগ্রত হয় এবং কোনো কোনো সময় যে চোখে পানি এসে পড়ে এর কি কোনোই মূল্য নেই ? দুনিয়ার এই একটি কিতাবই রয়েছে যা না বুঝেও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে লক্ষ লক্ষ লোক পাঠ করে—যারা আর কোনো বিদেশী ভাষাই পড়তে জানে না, কিন্তু কুরআন পড়তে জানে। শুধু অর্থ বুঝে পড়ার রেওয়াজ যদি প্রথম হতেই চালু হতো, তাহলে দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় মূল কুরআন মানুষ বহু পূর্বেই হারিয়ে বসতো এবং একমাত্র অনুবাদের উপর নির্ভর করার ফলে বিভিন্ন ধরনের কুরআন সৃষ্টি হতো।

সর্বশেষ কথা এই যে, যারা বুঝার চেষ্টা করার ক্ষমতা রাখে, তারা যদি না বুঝে পড়লেই চলবে মনে করে তাহলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। এ বিষয়ে আখিরাতের আদালতে আল্লাহর কাছে তার অক্ষমতার ওজর টিকবে বলে বিবেক সাক্ষী দেয় কিনা তা-ও জিজ্ঞেস করা দরকার। আর যারা বুঝে না পড়া অর্থহীন বলে তিলাওয়াতই করেন না তারা আরও মারাত্মক ভুল করেন।

'যেদিন বুঝে পড়তে অবসর পাওয়া যায়, সেদিন কুরআন পাঠ করবো' —এ মনোভাব যাদের আছে তাদের কুরআন পাঠ হয়েই ওঠে না। প্রকৃত কথা এই যে, বুঝার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরও কেবল তাফসীর পড়া দ্বারাই কুরআন পাঠ শেষ করা উচিত নয়, কুরআনের তিলাওয়াতও প্রয়োজন। নবী করীম (সঃ) মানুষকে কুরআনের অর্থই শুধু শিখান নাই, তা তিলাওয়াত করেও শুনিয়েছেন। কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা দীলে মহব্বত ও পবিত্র ভাবের উদয় হয়—তা শুধু তাফসীর পড়া বা অর্থ বুঝে পড়া দ্বারা সৃষ্টি হয় না। কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস যার নাই, তিনি অভ্যাস করে এই কথাটি যাচাই করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ বিজ্ঞানের মতে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে—এই মতটিই যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু কুরআন এর বিপরীত মত পোষণ করে, কোনটি সত্য ?

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নটিই ভুল। কুরআন যে মত পোষণ করে বলে আপনি উল্লেখ করেছেন তা কুরআনের কোথাও পাওয়া যাবে না। আর বিজ্ঞানের মত সম্পর্কেও আপনার জ্ঞান বহু প্রাচীন। বৈজ্ঞানিকগণ এককালে বিশ্বাস করতেন—'পৃথিবী ঘোরে

www.amarboi.org

না, সূর্যই ঘোরে।' অতঃপর বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণিত হলো—সূর্য ঘোরে না, পৃথিবী ঘুরে। বেশ কিছুকাল পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান–সূর্য ও পৃথিবীর কোনোটিই স্থির নিশ্চল নয়; উভয়ে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।' এটাই আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সর্বশেষ মত।

আল-কুরআনের সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে—সূর্য তার নির্ধারিত পথে পরিভ্রমণ করে, চন্দ্রের জন্যও মঞ্জিলসমূহ ঠিক করে দেয়া হয়েছে।' এর পরের আয়াতে কুরআন বলে 'কুল্লুন ফী ফালাকি-ই ইয়াসবাহুন'-সবই মহাশূন্যে বিচরণ করে। তাহলে কুরআনের মতে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহই গতীশীল, কোনোটাই নিশ্চল নয়।

বিজ্ঞান সম্পর্কে এতটুকু জেনে রাখা প্রয়োজন যে, বিজ্ঞান সৃষ্টিলোকের কোনো শক্তিকেই তৈরি বা সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে বিজ্ঞান তা Discover করে মাত্র, Create করতে পারে না। মানুষ এককালে যা জানে না বিজ্ঞানের সাহায্যে পরবর্তীকালে তা জানতে পারে। পারমাণবিক শক্তিকে পূর্বে মানুষ নিজেদের কাজে লাগাতে জানতো না, বর্তমানে তা আয়ত্বে এনেছে। কিন্তু মানুষ এই শক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। বিজ্ঞান সৃষ্টিজগতের কোনো নিয়মকে বদলাতেও পারে না।

এতে বুঝা গেল, বিজ্ঞান সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে সকল বিষয়ে জ্ঞান দান করতে পারে না। বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ যা করার জন্য চেষ্টা করে তা সকল সময় নির্ভুলও নয়। কিন্তু মানুষ বিজ্ঞানের মারফতে সঠিক তথ্য জানতে পারলেও সৃষ্টির তত্ত্বসমূহ ঠিক একই অবস্থায়ই আছে। মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে এক সময় যখন জানতে পারলো সূর্য স্থির, তখনও প্রকৃতপক্ষে সূর্য গতিশীল ছিল। সুতরাং বিজ্ঞান ভুল করলেও প্রকৃতির অবস্থা সেই ভুলের সাথে বদলিয়ে যায় না।

মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে এরূপ ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারে, কিন্তু অনন্ত অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তাঁর বাণীতে ভুল করেন না। যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে তারা কুরআনের কোনো কথার বিপরীত মত বৈজ্ঞানিকগণের নিকট শুনলে কুরআন সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ পোষণ করার পরিবর্তে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকেই ভ্রান্ত বলে মনে করে। বিজ্ঞানের কোনো সিদ্ধান্ত যখন কুরআনের সঙ্গে মিলে তখনই নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, এই মত নির্ভুল হয়েছে। কুরআনে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পূর্বে জানতে চেষ্টা করবে যে, তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কুরআন কোনো মত পোষণ করে কিনা। গবেষণার ফল কুরআনের বিপরীত হলে সে নিজের সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত মনে করবে এবং সঠিক তত্ত্ব জানার জন্য আবার গবেষণা চালাবে, কিন্তু কুরআনকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করার ন্যায় মূর্খতা প্রকাশ করবে না।

সবশেষে একথাও জেনে রাখা দরকার, কুরআন কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে নাযিল হয়নি। কুরআন জড় বিজ্ঞানের কিতাব নয়।

www.amarboi.org

কুরআনের প্রত্যেকটি কথাকে তার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে অর্থ করতে হবে। চন্দ্র-সূর্য সম্পর্কে কুরআন যা বলেছে তা বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করার যুক্তি হিসেবেই বলা হয়েছে। 'চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি যে আল্লাহর নির্দেশে চলছে তাদেরকেও সেই আল্লাহর দাসত্বই গ্রহণ করা উচিত'-একথা বুঝাবার উদ্দেশ্যই সে সবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে যদিও কুরআন নাযিল হয়নি, তবু কুরআনের কোনো কথাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভুল নয়। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানে এমন কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়নি—যা কুরআনের বিপরীত। প্রমাণ সাপেক্ষে কিছু মত কুরআনের বিরুদ্ধে থাকলেও তা এখনও বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি।

প্রশ্ন ঃ কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন–'কুরআনের তাফসীর সাধারণ মানুষের জন্য নয়। তাই সাধারণ মানুষের তাফসীর করা বা শোনা ঠিক নয়।' এ ব্যাপারে আপনার সুস্পষ্ট জবাব জানতে চাই।

উত্তর ঃ কুরআনের আলো জনসাধারণের কাছে না দেয়ার ফলেই ইসলামের প্রতি মহব্বত থাকা সত্ত্বেও জনগণ ইসলাম সম্বন্ধে এতটা জাহেল রয়ে গেছে। যখন কুরআন নাযিল হয়েছিল তখন সব ধরনের মানুষের কাছেই এই কুরআন পেশ করা হয়েছিলো কিনা ?

নবী করীম (সাঃ) নিজেই নির্দেশ করেছেন—'তোমরা কুরআন শেখো এবং লোকদেরকে শেখাও।' তিনি আরো বলেছিলেন—'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন নিজে শেখে এবং অন্যদেরকে শেখায়।' বলা বাহুল্য, এখানে কুরআন শেখানোর অর্থ শুধু তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া নয়।

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে খুব অল্প লোকই লেখাপড়া জানতেন। অক্ষরজ্ঞান ছাড়াই তাঁরা কুরআনের বক্তব্য যোগ্যতার সঙ্গে বুঝতেন। আজ যারা-'সাধারণ লোকের জন্য কুরআনের তাফসীর নয়'-একথা বলেন তারা কি মনে করেন জ্ঞান-বুদ্ধি ও বুঝার ক্ষমতা শুধু কেতাবী বিদ্যার উপরই নির্ভর করে ? অতি অল্প শিক্ষিত লোককেও অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকের চেয়ে বেশী সমজদার দেখা যায়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইংরেজ আমলে এক সময় কুরআন-হাদীস চর্চা করা এক প্রকার বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামকে পালন করার জন্য মাওলানা-মাশায়েখ তালাশ করার মধ্যেই ইসলামের চর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর প্রচেষ্টার ফলে কুরআন-হাদীসের অধ্যয়নের রেওয়াজ বাড়তে থাকে। আর বর্তমান যুগে বিশেষত ঃ 'মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)-এর ইসলামী আন্দোলন ও তাঁর সহজ তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'-এর বদৌলতে আজ সাধারণ লোকদের মধ্যেও কুরআন বুঝার ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার অশিক্ষিত লোক পর্যন্ত তাফসীর মাহফিলগুলোতে অত্যন্ত মজা ও তৃপ্তিসহকারে

www.amarboi.org

কুরআনের তাফসীর শুনে উপকৃত হচ্ছেন। এরপরও যদি কেউ ঐ রকম কথা বলেন তাহলে তাঁরা মানুষের কাছে হাস্যস্পদই হবেন।

প্রশ্ন ঃ সূরা তাওবার ৪নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন—'মুশরিকদের যেখানে পাও-ধরো, মারো, হত্যা করো এবং তাদের ঘাঁটি ঘেরাও করো।' তাহলে বাংলাদেশের মুশরিকদের ব্যাপারে কী করা যায় ?

উত্তর ঃ কুরআন শরীফের অর্থ সঠিকভাবে বুঝার একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমতঃ একথা জানতে হবে যে, দুনিয়ার অন্যান্য পুস্তকের মতো একটি গ্রন্থ হিসেবে কুরআন নাযিল হয়নি। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে দায়িত্ব পালন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন সে দায়িত্ব পালনের পথ নির্দেশক হিসেবে যখন যেটুকু দরকার তখন সেটুকুই নাযিল করা হয়েছে।

উক্ত দায়িত্ব পালনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২৩ বছর সময় লেগেছে এবং এ দীর্ঘ সময়েই কিছু কিছু করে কুরআন নাযিল হয়েছে। এই ২৩ বছরের ঘটনাবলীর ভিত্তিতে সৃষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী বুঝার চেষ্টা করলেই কুরআন বুঝা সহজ হবে।

আল্লাহর দাসত্ব, রাসূলের নেতৃত্ব ও আখিরাতের জবাবদিহির ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানকে বিজয়ী করাই রাসূলের দায়িত্ব ছিল। সমাজ পরিবর্তনের এ দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই একটি আন্দোলনের রূপ নেয় এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজের কায়েমী স্বার্থের সাথে আন্দোলনের সংঘর্ষ হয়।

প্রত্যেক আন্দোলনেরই দু'টি যুগ থাকে। প্রথম যুগকে 'সংগ্রামী যুগ' বলা যায় এবং দ্বিতীয় যুগকে 'বিজয়ী যুগ' বলা চলে। নবী করীম (সাঃ)-এর আন্দোলনের প্রথম ১৩ বছর সংগ্রামী যুগ ছিল এবং কুরাইশদের নেতৃত্বে মুশরিকরাই কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী হিসেবে এ আন্দোলনকে খতম করার চেষ্টা করে। মদীনায় হিজরতের পর যখন বিজয় যুগের সূচনা হয় তখন মক্কার মুশরিকরা গোটা আরব শক্তিকে সংগঠিত করে রাসূলের পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। ফলে ক্রমাগত ৮ বছর যুদ্ধের পর রাসূল (সাঃ) মক্কা জয় করেন। নবুওয়াতের শুরু থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত ২১ বছর মক্কার মুশরিকরা রাসূলের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে সূরা তাওবার ঐ আয়াতটি নাযিল হয়। ঐ আয়াতে রাসূল (সাঃ)-কে অনুমতি দেয়া হয় যে, এত কিছুর পরও যেসব মুশরিক ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালাবে তাদেরকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে হত্যা করা যাবে। বিশেষতঃ আলোচ্য আয়াত যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে নাযিল হয়। কিন্তু দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতিতে মুশরিকদের হত্যা করার জন্য ইসলাম কখনো অনুমতি দেয়নি। সুতরাং উপরোক্ত আয়াত বাংলাদেশের মুশরিকদের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়।

www.amarboi.org

প্রথমেই আমি বলেছি, কুরআন শরীফকে বোঝার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের ২৩ বছরের ঘটনাবলীর সাথে মিলিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহকে বুঝতে হবে। রাসূল (সাঃ)-এর আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে যার যেমন খুশি বোঝার চেষ্টা করলে কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার পরিবর্তে পথভ্রষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা থাকবে।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ এক অদ্বিতীয় অথচ কুরআনে 'নাহনু' (আমরা) বলে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ আছে, এর মানে কী?

উত্তর ঃ এটা সৌজন্যমূলক ব্যবহার। এ রকম সৌজন্য সব ভাষাতেই আছে। বাংলাতেও ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে সম্পাদক এক বচনের বদলে বহুবচন 'আমরা' ব্যবহার করেন। ইংরেজীতেও Editorial Courtesy হিসেবে বহুবচনই ব্যবহার করা হয়।

কুরআন যখন নাযিল হয় তখন মক্কার কাফিররা এর উপর বহু প্রশ্ন তুলেছে, কিন্তু 'আমরা' ব্যবহার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। এ রকম সৌজন্যমূলক ব্যবহার যদি আরবী ভাষায় পূর্ব হতে প্রচলিত না থাকতো অর্থাৎ এটা যদি আল্লাহর একত্বের ধারণার বিপরীত কোনো অর্থে ব্যবহৃত হতো তাহলে অবশ্যই এ ব্যাপারে তারা প্রশ্ন তুলতো। তারা শিরকের পক্ষে যুক্তি হিসেবে 'আমরা' ব্যবহার করাকে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করার সুযোগ গ্রহণ করতো। তাওহীদের বিরুদ্ধে এতবড় একটা প্রমাণ তারা কিছুতেই হাতছাড়া হতে দিতো না। কিন্তু এটা তারা করেনি। উর্দু ভাষায়ও এর প্রচলন আছে ছোটদের সাথে বড়দের কথা বলার সময় 'মায়' এর স্থলে 'হাম'–অর্থাৎ 'আমি' না বলে 'আমরা' ব্যবহার করা হয়। 'আমরা' শব্দ দ্বারা বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রকাশ করার রীতি বহু ভাষায়ই প্রচলিত।

তাছাড়া কোনো রাজকীয় ফরমান বা ঘোষণা জারি করার সময় বাদশাহ বা রাজা নিজের নামের আগে 'আমি' ব্যবহার না করে 'আমরা' ব্যবহার করে থাকেন। যেমন সউদী বাদশাহ কোনো ঘোষণা জারি করার সময় বলেন–'নাহনু ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ।' আরবী ভাষার এ রীতিকে অনুসরণ করেই কুরআন মজীদের বহু জায়গায় রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালার সর্বনাম বহুবচন অর্থাৎ 'নাহনু' ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ 'আর যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে, তোমাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী করে রাখবো।'(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৫ আয়াত)

কিন্তু বাস্তবে কালামে পাকের এ আয়াতের আলোকে আমাদের অবস্থান নেই। বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ সূরা আলে ইমরানের ৫৫ নম্বর আয়াতটি উম্মতে মুহাম্মদীর উপর প্রযোজ্য নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন—

www.amarboi.org

'যারা তোমাকে অনুসরণ করবে তাদেরকে তোমাকে অস্বীকারকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী করে রাখবো।'

ঈসা (আঃ)-কে অস্বীকারকারী জাতি বলতে ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনা দূরের কথা, তাঁকে ফাঁসী দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলো। ঐ করুণ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—'আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনবো এবং আমার নিকট উঠিয়ে নেবো। যারা তোমাকে মানতে অস্বীকার করেছে তাদের পরিবেশ থেকে তোমাকে আমি পবিত্র করবো।' এই আয়াতের প্রথম অংশে একথাগুলো বলার পর আয়াতের শেষাংশে উক্ত প্রশ্নে উল্লেখিত কথাগুলো রয়েছে।

এ আয়াত সবটুকু এক সাথে পড়লে একথা সহজে বুঝা যায় যে, ইয়াহুদীরা ঈসা (আঃ)-কে শূলে চড়াবার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তা থেকে তাঁকে উদ্ধার করার নিশ্চয়তা দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা এ ওয়াদাও করলেন যে, ইয়াহুদী জাতি কিয়ামত পর্যন্ত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাসীদের অধীনে থাকতে বাধ্য হবে।

'ইসরাঈল' নামে ইয়াহুদী রাষ্ট্রটি খৃষ্টান দেশগুলোরই সৃষ্টি এবং আমেরিকা ও বৃটেনের মতো দেশগুলোই অন্যায়ভাবে এ অবৈধ রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এর দ্বারা ঐ আয়াতের বক্তব্যের সত্যতাই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ঃ কুরআনে রূহ্ তৈরির পর আল্লাহর যে ঘোষণা (আমি কি তোমাদের রব নই ?) আমরা দেখতে পাই তার বিন্দুমাত্র আমাদের স্মরণে আসে না। তাহলে এইরূপে আমাদের থেকে স্বীকৃতি নিয়ে কী লাভ বা আমাদের কী-ইবা উপকার হলো ?

উত্তর ঃ যদি আমাদের স্মরণ থাকতো তাহলে ওহীর মাধ্যমে জানানোর কোনো প্রয়োজন হতো না। যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে তারা কুরআনের এ আয়াত থেকে এ শিক্ষাই পেয়ে থাকে যে, আল্লাহর সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক তা আমাদের সৃষ্টির শুরু থেকেই মজবুতভাবে স্থাপিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুনিয়ায় যে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন সে পরীক্ষা এটাই যে, তিনি তাঁর সত্তা, আখিরাতের চিত্র এবং রূহের সঙ্গে তার সম্পর্কের খবর 'গায়েবের' অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ, বেহেশত ও দোযখ ঈমানের বিষয় না হয়ে যদি বাস্তবে দেখার বিষয় হতো তাহলে দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষার কোনো অবকাশ থাকতো না। ঠিক এই কারণে আল্লাহর সঙ্গে রূহের যে কথা বিনিময় হয়েছে তা-ও আমাদের স্মরণ থেকে গায়েব করে দেয়া হয়েছে। যদি সে কথা মনে থাকতো তাহলে দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতো। ঐ কথা মনে থাকলে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধ্য হতো। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। ঈমানের ভিত্তিতেই সে ইখতিয়ারকে কাজে লাগাতে হয়। আমরা যখন রূহজগতে ছিলাম তখনকার কথা মনে থাকা তো দূরের কথা, দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার পর আমাদের জীবনের বেশ কয়েকটি বছর এমন অবস্থায় কেটে যায়, যে সময়কার কথা আমরা মনে রাখতে পারি না।

www.amarboi.org

আমরা যখন একটু বড় হই তখন আমাদের পিতা-মাতা ও মুরুব্বীগণ তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে ঐ সময়ের ঘটনাবলী উল্লেখ করে উপদেশ দিয়ে থাকেন। শৈশবের যে সমস্ত কথা আমাদের মনে নেই সে কথা জানলে আমাদের মনে যে আবেগের সৃষ্টি হয় তা পিতামাতার প্রতি মহব্বত ও শ্রদ্ধা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয়। এমনিভাবে সৃষ্টির শুরুতে আমাদের মহান রবের সাথে আমরা যে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম তা আমাদের মনে অবশ্যই আবেগ জাগ্রত করে। আল্লাহর সঙ্গে আমাদের মহব্বতের সে সম্পর্ক হওয়া উচিত তার জন্য ঐ আবেগটুকু অত্যন্ত মূল্যবান। আল্লাহর সাথে যারা মহব্বত অনুভব করেন তাদের নিকট আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়া এ ঘটনাটুকু অবশ্যই ইতিবাচক অবদান রাখে।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ বলেন—'তা মেঘ হতে তোমরা নামিয়ে আনো না, আমরা বর্ষণ করি ?'–(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৬৯ আয়াত)

অথচ বর্তমানে আমেরিকায় মেঘের ভিতরে গ্যাস ছিটিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করানো হয়। তাহলে আয়াতটা বাস্তবতার দিকে থেকে সাংঘর্ষিক কিনা ?

উত্তর ঃ মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করার যে বিধান আল্লাহ তৈরি করেছেন সে অনুযায়ীই বৃষ্টি হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আল্লাহ তায়ালার রচিত প্রাকৃতিক বিধানের জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর বিধানকে ব্যবহার করা সম্ভব, কিন্তু আল্লাহর বিধানকে অগ্রাহ্য করে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। সে হিসেবে মেঘ বৃষ্টিতে পরিণত হওয়ার জন্য আল্লাহর যে বিধান রয়েছে সে বিধান অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পন্থায় কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি বর্ষণ করার দ্বারা আল্লাহর ঐ দাবী ভুল প্রমাণিত হয় না।

সূরা ওয়াকিয়ার ৬৩ ও ৬৪ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—'তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, তোমরা যে বীজ বপন করো তা থেকে কি তোমরা ফসল উৎপাদন করো, না আমি উৎপাদনকারী' ?

আমরা যে জমি চাষ করি এবং ফসল ফলাই সে বিষয়েও আল্লাহর দাবী এটাই যে, বীজ বপন করা পর্যন্ত আমাদের ইখতিয়ার, ফসল ফলানো আমাদের ইখতিয়ারে নেই।

ফসল হওয়ার উপযোগী করে জমিকে তৈরি করার যে কাজ আমরা করি সে নিয়মও আল্লাহরই তৈরি। ঐ নিয়মটা জানাই বিজ্ঞানের কাজ। সে নিয়ম জেনেই আমরা চাষাবাদ করি। বীজ থেকে অংকুর গজাবার কাজ এবং বীজ থেকে ফসল ফলানো পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে একটু যত্ন নেয়া ছাড়া আমাদের কিছুই করণীয় থাকে না। তারপর যখন ফসল তোলার উপযুক্ত সময় হয় তখন আমরা ফসল কেটে আনি।

তেমনিভাবে নদী-নালা ও সমুদ্র থেকে বাষ্পের আকারে পানিকে আকাশে নিয়ে মেঘে পরিণত করা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। এ কাজটুকু করার পরই বিজ্ঞানের সাহায্যে আংশিকভাবে কোথাও মেঘকে বৃষ্টিতে পরিণত করা সম্ভব হতে পারে। এর দ্বারা বর্ষণের গোটা ব্যবস্থাপনার কৃতিত্ব মানুষের হয়ে যায় না।

www.amarboi.org

কৃত্রিম উপায়ে মেঘ থেকে কোথাও গবেষণামূলকভাবে একটু বৃষ্টি বর্ষণ করা গেলেও একথা দাবী করা সম্ভব নয় যে, বৃষ্টি বর্ষণের প্রয়োজন কৃত্রিম উপায়েই পূরণ হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদে সূরা আল বাকারায় আল্লাহ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না'।

উক্ত আয়াতে শহীদদের মৃত না বলার কারণ কী ? 'জীবিত' দ্বারা আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন ? আর এ পরোক্ষ জীবন নিহতদের জন্য কি কোনো বাড়তি মর্যাদা স্বরূপ ?

উত্তর ঃ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়টাকে 'বারযাখ' বলা হয়। এ সময় যারা নেককার তাদের কোনো আযাব হয় না। বরং তাদেরকে বেহেশতের সুগন্ধ উপভোগ করার সুযোগ দেয়া হয়। আর যারা নেককার নয় তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আযাব দেয়া হয়।

শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন বলেই কুরআন পাক থেকে প্রমাণিত। সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ আয়াতে বলা হয়েছে—'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। আসলে তারা জীবিত, তারা তাদের রবের কাছ থেকে রিয্ক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে নিজের দয়া থেকে যা দিয়েছেন তা পেয়ে তারা খুশী ও তৃপ্ত।' এ থেকে বুঝা যায় যে, তারা সাধারণ নেককারদের মতো বেহেশতের শুধু সুগন্ধই পান না, বেহেশতের বাগানে বিচরণ করেন এবং তারা এমন রিয্ক পান যা পেয়ে তারা খুশী ও তৃপ্ত হন। তাদের জীবিত থাকার বিবরণ এর চেয়ে বেশী জানার কোনো উপায় নেই।

প্রশ্ন ঃ আল-কুরআনে তিন জায়গায় আল্লাহ তায়ালা মানুষের (বান্দাহর) কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কেন মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছেন ? এর কারণ আয়াত দ্বারা বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে রুজি-রোজগারের যোগ্যতা দান করেন এবং যা কিছু সে কামাই করে সবই আল্লাহর দান। আল্লাহর দেয়া মাল আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য মানুষকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তাই এটা মানুষের কর্তব্য। কিন্তু এ কর্তব্য পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা কাউকে বাধ্য করেননি। মানুষকে তিনি ইখতিয়ার দিয়েছেন যে যার ইচ্ছা আল্লাহর কথামত খরচ করবে, আর যার ইচ্ছা অন্যভাবে খরচ করতে পারে।

মানুষকে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এ দানকে 'কর্জে হাসানা' বলে গণ্য করেছেন। যেহেতু আল্লাহ এ দানের বদলা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন সে জন্য এটাকে তিনি 'কর্জ' বলে ঘোষণা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর কোনো অভাব নেই তবু তিনি মানুষের কাছে কর্জ চান। এটাও তাঁর আরেক বিরাট

www.amarboi.org

মেহেরবানী। যারা আল্লাহর পথে দান করে তারা কিন্তু কর্তব্য পালনের নিয়তেই করে, আল্লাহকে 'কর্জ' দিয়ে কোনো উপকার করছে বলে মনে করে না। যদিও আল্লাহ নিজেই এটাকে কর্জ বলে গণ্য করেন।

তেমনিভাবে মানুষকে আল্লাহর হেদায়াতের এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে সাহায্য করা হয় বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। যারা এ কাজ করে তারা অবশ্যই আল্লাহকে সাহায্য করার নিয়তে এ কাজ করে না। কারণ আল্লাহ দুর্বল নন যে, তাঁকে সাহায্য করা দরকার। দ্বীন যেহেতু আল্লাহর এবং মানুষকে হেদায়াত করার আসল ক্ষমতা যেহেতু আল্লাহর এবং দ্বীনকে বিজয়ী করার চূড়ান্ত ক্ষমতা আল্লাহরই হাতে, সেহেতু যারা এসব কাজে নিয়োজিত তাদেরকে আল্লাহ সাহায্যকারীর মর্যাদা দেবেন বলে তাঁর বান্দাহদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, কিসের ভিত্তিতে আয়াতগুলোকে এক একটি সূরায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে—যদিও এক একটি আয়াত বিষয়ের দিক থেকে অন্য আয়াত থেকে আলাদা। বিভিন্ন আয়াত কিভাবে বোঝা যায় যে, এটি মাক্কী অথবা মাদানী ? হিজরী কোন সময়ে বিভিন্ন আয়াতগুলোকে এক একটি সূরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় ? কিসের উপর ভিত্তি করে কুরআন পাককে ৩০ পারায় ভাগ করা হয় ? এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত বলুন।

উত্তর ঃ কুরআন মজীদের আয়াতগুলো যেমন রাসূলুল্লাহর রচনা নয়, কোন্ সূরায় কোন্ কোন্ আয়াত সন্নিবেশিত হওয়া উচিত এবং কোন্ সূরার পর কোন্ সূরা সাজানো উচিত এ বিষয়েও রাসূল (সাঃ)-এর কোনো ইখতিয়ার ছিল না। আল্লাহর নির্দেশে জিব্রাইল (আঃ) এই সব ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবিত থাকাকালেই আয়াত ও সূরাগুলোকে সাজাবার কাজ সম্পন্ন হয়।

কোন্ সূরা মাক্কী বা মাদানী তা প্রধানতঃ সূরার আলোচ্য বিষয় থেকেই বোঝা যায়। হাদীসের রেওয়ায়েত থেকেও এ বিষয়ে অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ প্রশ্নের বিস্তারিত জওয়াব পেতে হলে মাওলানা মওদূদী (রাহঃ)-এর তাফহীমুল কুরআনের 'ভূমিকা' পড়তে হবে। আমার লেখা 'কুরআন বুঝা সহজ' বইটি থেকেও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

কুরআন পাককে ৩০ পারা এবং এক একটি সূরাকে বিভিন্ন রুকূ'তে বিভক্ত করার কাজটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) করে যাননি। এমনকি রাসূলের সময়ে যের, জবর পেশ-ও দেয়া ছিল না। পরবর্তীকালে কুরআন তিলাওয়াতকারীদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই এসব করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ সূরা আল মায়েদার ৯৯ আয়াতাংশে বলা হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ)-এর উপর শুধু পয়গাম পৌছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সূরা ইয়াসীন ও কুরআন মজীদের কোনো কোনো আয়াতেও এমন কথা বলা হয়েছে। অথচ সূরা আসসাফ, জুম'আ ও

www.amarboi.org

বাকারায় দেখা যায়, তাঁর (সাঃ) উপর দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব ছিল। প্রশ্ন হলো, প্রথমোদ্ধৃত আয়াতের সাথে পরের আয়াতগুলোর সমন্বয় সাধন কিভাবে করা হয়েছে?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে যত জায়গায় সূরা আল মায়েদার এই আয়াতের মতো কথা বলেছেন তার সাথে রাসূল (সাঃ)-এর ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। একথাগুলো বলা হয়েছে ঐসব লোকদের প্রসঙ্গে যারা রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াত কবুল করার বদলে শুধু বিরোধিতাই করেছে। এসব কথা আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ)-কে বিরোধীদের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যেই বলেছেন।

রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত মেহেরবান মানবদরদী হওয়ার কারণে যারা তাঁর দ্বীনের দাওয়াত কবুল করতো না, তাদের পরিণাম চিন্তা করে ব্যথিত হতেন। তাই রাসূল (সাঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা একথাও বলেছেন-'এরা ঈমান আনছে না, তার জন্য কি আপনি জান দিয়ে দেবেন?'

আল্লাহ তায়ালা একথাই বলতে চাচ্ছেন যে, আমি মানুষকে নবীর দাওয়াত কবুল করা বা না করার জন্য বাধ্য করিনি। প্রত্যেক মানুষকে আমি এ ইখতিয়ার দিয়েছি যে, দাওয়াত কবুল করা না করার সিদ্ধান্ত নেয়া তাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আপনার দায়িত্ব তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। তাদেরকে দাওয়াত কবুল করিয়ে দেয়া আপনার দায়িত্ব নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি 'তাফহীমুল কুরআন' আমপারার তাফসীর বইয়ের ১৬১ পৃষ্ঠায় আরবী শব্দের তালিকায় 'শয়তান' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—'শাতানা অর্থ দড়ি দিয়ে বাঁধা।' 'শয়তান মানে যাকে অভিশপ্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং এ অবস্থা থেকে যার মুক্তি নেই।'

শয়তানকে যদি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখাই হয় তাহলে শয়তান কিভাবে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে?

উত্তর ঃ 'শয়তান' শব্দটি 'শাতানুন' বা 'শাতানা' শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে। অভিধানে এর অর্থ লিখেছে 'দড়ি দিয়ে বাঁধা।' এ অর্থ অনুযায়ী 'শয়তান' মানে আল্লাহর অভিশাপের দড়ি দিয়ে সে এমনভাবে আবদ্ধ যে, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার তার আর কোনো উপায় নেই। 'লুগাতুল কুরআন' নামক অভিধান থেকে জানা যায় যে, 'শাতানা' শব্দের অর্থ আরো আছে। যেমন—'দূর হওয়া, ধ্বংস হওয়া।' এ দুটো অর্থ সুস্পষ্ট শয়তান আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে দূরে আছে এবং সে ধ্বংসের পথেই রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আমরা জানি, আল্লাহ ব্যতীত কারও নামে কসম করা ঠিক নয়। কিন্তু কুরআন শরীফের সূরা বালাদ-এ 'আমি এ শহরের কসম করছি ; সূরা আসর-এ সময়ের কসম ; সূরা আদিয়াত-এ 'কসম ঐ (ঘোড়া)গুলোর যারা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ায়; সূরা তীন-এ 'কসম ত্বীন ও জায়তুনের,' 'কসম তূর-ই সীনার' 'কসম এই শান্তিপূর্ণ শহর (মক্কার)' উল্লেখ আছে। কুরআন শরীফে কেন আল্লাহ ঐ সকল জীব ও বস্তুর নামে কসম করেছেন? বিস্তারিত জানাবেন।

www.amarboi.org

উত্তর ঃ আমরা কসম করি শ্রোতাকে কথা সত্য বলে গ্রহণ করার জন্য। কসম করে বললে শ্রোতা মনে করে যে, আমি সত্য বলছি। কিন্তু আল্লাহ যা-ই বলেন সব অবস্থায়ই তিনি সত্য বলেন। তাঁর কথাকে সত্য প্রমাণ করাবার জন্য কসম করার দরকার হয় না। তাহলে প্রশ্ন থাকে আল্লাহ কসম করেন কেন ?

আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বিষয় উল্লেখ করে কসম করেন সেই কসমের পর পরই যে বক্তব্য পেশ করেন সে বক্তব্যের সাথে ঐ কসমের ঘনিষ্ট সম্পর্কে রয়েছে। তাঁর বক্তব্যের যুক্তি হিসেবেই তিনি কসম করে থাকেন। যেমন সূরা আল আসর। 'আসর' মানে 'সময়, 'কাল' বা 'যুগ'। এই কসম করার পরপরই তিনি বলেছেন যে, মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। একথাটির যুক্তি হিসেবে তিনি কালের কসম করেছেন। অর্থাৎ ইতিহাসে যুগে যুগে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ চারটি গুণের অভাবে চিরকাল ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রয়েছে। এভাবে যেকোনো তাফসীর পড়লে আল্লাহর প্রতিটি কসমের স্পষ্ট ব্যাখ্যা বুঝা যায়।

প্রশ্ন ঃ কুরআনে 'সূরা তাওবাহ'-এর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' কেন লেখা হয়নি ? এর বৈজ্ঞানিক যুক্তি কী ? এ প্রশ্নের উত্তরে হয়ত আসতে পারে, ঐ সূরাটি কাফিরদের উপর রাগান্বিত হয়ে এবং অনেক হুমকি দিয়ে নাযিল করেছেন বিধায় 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয়নি। তাহলে সূরা লাহাবে কেন বিসমিল্লাহ লেখা হলো ? কারণ সেখানেও আবু লাহাবের ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

উত্তর ঃ এ বিষয়ে যতটুকু জানার চেষ্টা করেছি। তাতে এ ধারণাই হয়েছে যে, কুরআন মজীদের সূরাগুলো সাজাবার সময়ে রাসূল (সাঃ) এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখার নির্দেশ দেননি। রাসূল যেভাবে কুরআনকে সাজিয়ে দিয়েছেন। কুরআন সে অবস্থায়ই আছে। কোন্ আয়াতের পর কোন্ আয়াত, কোন্ সূরার পর কোন্ সূরা হবে তা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং জিব্রাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-কে জানিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং রাসূল (সাঃ) 'বিসমিল্লাহ' লিখাননি বলেই এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হয় না। এ ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোনো রকম ব্যাখ্যাই যুক্তিপূর্ণ মনে হয় না। সূরায়ে তাওবাতে আল্লাহ তায়ালা যে ধরনের ধমকের আয়াত নাযিল করেছেন সে রকম ধমক আরো অনেক সূরাতেই রয়েছে। সুতরাং শুধু এ কারণে বিসমিল্লাহ লেখা না হলে আরো কোনো কোনো সূরাতেও বিসমিল্লাহ না লেখারই কথা ছিল।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন—'আমি অধিকাংশ জ্বীন ও মানুষ দ্বারা দোযখকে পরিপূর্ণ করবো।' তাহলে আল্লাহর কি এটা ইচ্ছা ? আর যদি ইচ্ছা না হয় তাহলে কোন্ দিকটা লক্ষ্য করে একথা বলেছেন ?

উত্তর ঃ সাধারণতঃ মানুষের একটা ভুল ধারণা আছে যে, অধিকাংশ মানুষ যা করে তাই ঠিক। তাই সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, কুপ্রথা, কুঅভ্যাস অনেকেই বিনা বিবেচনায় অনুকরণ করে চলে। তাই দেখা যায়, যখন কোনো নবী মানুষকে সঠিক পথের দিকে ডেকেছেন তখন অধিকাংশ লোকই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।

www.amarboi.org

এ কারণেই কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ বলেছেন যে, বেশীর ভাগ লোকই ভুল পথে আছে বা বুঝে না। অধিকাংশ লোক কোনো পথে চললেই যে তা সঠিক নয় একথার গুরুত্ব বুঝাবার জন্য আল্লাহ তায়ালা এভাবে কথা বলেছেন যে, তোমরা যে অধিকাংশ লোকের দোহাই দিচ্ছো তারা তো দোযখের পথই ধরেছে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালো এবং মন্দের জ্ঞান দান করেছেন বটে, কিন্তু ভালো বা মন্দ কোনোটাকেই গ্রহণ করতে বাধ্য করেননি। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ ব্যাপারে যে ইখতিয়ার দিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষ চলে। বাস্তবেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ লোকই নফস-এর তাড়নায়, দুনিয়ার আকর্ষণে ও শয়তানের ওয়াসওয়াসায় ভালোকে ভালো জানা সত্ত্বেও মন্দের পথেই চলে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জ্বীন ও ইনসানের মধ্যে অধিকাংশই দোযখের অধিবাসী হবে। এমনকি ঈমানদার লোকদেরও বিরাট অংশ আমলের ত্রুটির কারণে বেহেশতে যাওয়ার আগে একটা নির্দিষ্ট সময় দোযখের শাস্তি ভোগ করবে।

আল্লাহ তায়ালা একথাটাকেই ঐ ভাষায় প্রকাশ করেছেন যে, তিনি অধিকাংশ জ্বীন ও ইনসানকে দোযখে দেবেন। দোযখে দেয়ার কাজটা যেহেতু তাঁরই, সেজন্যই এ কথাটা এভাবে বলা হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, মানুষ নিজের ইচ্ছায় নাফরমানী করছে বলেই আল্লাহ তাদেরকে দোযখে দেবেন। অনন্ত অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখেন বলেই তিনি অধিকাংশ লোক দোযখী হবে বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, একই সূরায় একই বিষয় বারবার আলোচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো সূরায় ধারাবাহিক আলোচনাও দেখা যায় না। এর কারণ কী ? কুরআনে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথাই-বা এত বেশী আলোচিত হলো কেন ? কারণ জানতে চাই।

উত্তর ঃ মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) লিখিত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকায় এর বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে এখানে জবাব দেয়া হচ্ছে।

কুরআন মজীদ কোনো গ্রন্থকারের রচিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে একসাথে নাযিল হয়নি। যখন লেখক কোনো একটি বই প্রকাশ করে তখন একথার দিকে লক্ষ্য রাখে, যেন এক কথা বারবার লেখা না হয়। কুরআন শরীফ এ জাতীয় কোনো বই নয়।

আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী (সাঃ)-এর উপর আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে মানব সমাজে বিজয়ী করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক-ভাবেই সমাজ বিপ্লবের উপযোগী একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়। এ আন্দোলনের সূচনা থেকে বিপ্লব সফল হওয়া পর্যন্ত যখন যে পরিমাণ হেদায়াত প্রয়োজন ততটুকুই রাসূল (সাঃ)-এর উপর ওহীযোগে নাযিল করা হতো। এভাবে তেইশ বছরে নাযিলকৃত ওহীর সংকলিত রূপই হলো কুরআন মজীদ।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, একটি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এর বুনিয়াদী আকিদা-বিশ্বাস, এ আন্দোলনের উপযোগী মানুষের প্রয়োজনীয় গুণাবলী ইত্যাদি

www.amarboi.org

বিষয় আন্দোলনের সকল পর্যায়ে বারবার জনগণের সামনে তুলে ধরা দরকার। আন্দোলনের একই বক্তব্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন উপমায়, কোনো সময় যুক্তিসহকারে, কোনো সময় আবেগ মিশ্রিত করে পেশ করা প্রয়োজন হয়। এ কারণেই কুরআন পাকে বহু বিষয় বারবার বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সকল নবীই যেহেতু ইসলামী আন্দোলন করেছেন সেহেতু শেষ নবীর আন্দোলনের সময় অতীতের অনেক নবী ও রাসূলগণের উদাহরণ কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী হযরত মূসা (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর উল্লেখ করেছে। এর আসল কারণ আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। আমাদের ধারণা, আরবের ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিক-কাফির সকলেই ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাদের সকলের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে মনে করতো। শেষ নবী যে তাঁরই বংশধর এবং তাঁরই আদর্শ নতুন করে চালু করার চেষ্টা করছেন সে কথা বুঝাবার জন্যই বারবার ইব্রাহীম (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। আর আরবে ওহীর ধারক হিসেবে বনী ইস্রাইলই সবচেয়ে সুসংগঠিত ধর্মীয়গোষ্ঠী ছিল। বিশেষ করে মদীনায় তাদের ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং তারাই ধর্মীয় দিক দিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সবচেয়ে বেশী অপচেষ্টা চালাতো। তাই মুহাম্মদ (সাঃ) যে বনী ইস্রাইলের নবী মূসা (আঃ)-এর উল্লেখ বারবার করে একথাই বুঝানো হয়েছে এবং বনী ইস্রাইল জাতি তাদের নবীর যে আদর্শ ও শিক্ষা ভুলে গেছে তা নতুন করে চালু করার জন্যই শেষ নবী এসেছেন।

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআনে সূরা আল কাহাফে বর্ণিত 'ইয়াজুজ-মাজুজ' সম্প্রদায় কারা ? তারা কি মানুষ, না অন্য কোনো জন্তু ? যদি মানুষই হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান দুনিয়াতে তাদের আবাসস্থল কোথায় অবিস্থিত ?

উত্তর ঃ এ বিষয়ে গবেষণা করে তাফহীমুল কুরআনে যতটুকু লেখা হয়েছে তার চেয়ে বেশী আমার জানা নেই। তাফহীমুল কুরআনের সূরা কাহাফের অংশ দেখুন।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে মুসলমানদেরকে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার কোনো তাগিদ দিয়েছেন কিনা ? আর যদি দিয়ে থাকেন, তবে কি তা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত না নফল ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সৃষ্টিজগতের অনেক বিষয়ে উল্লেখ করে তাওহীদ ও আখিরাতের যুক্তি পেশ করেছেন। ঐ যুক্তি অনুধাবন করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ঐসব বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা প্রয়োজন। যেমন সূরায়ে আলে ইমরানের ১৯০ আয়াতে আল্লাহ বলেন—'নিশ্চয় আসমান-জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।' এ আয়াতের যে বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে আহবান জানানো হয়েছে তা স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানচর্চার ইঙ্গিত বহন করে।

কুরআন বিজ্ঞানের বই নয়, কিন্তু যে আল্লাহ এ কুরআন নাযিল করেছেন তিনি এ জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাওহীদ ও রিসালাতের পক্ষে যুক্তি হিসেবে

www.amarboi.org

সৃষ্টিজগতের যেসব বিষয় এবং মানব দেহের যেসব অংশের উল্লেখ করেছেন সেসব বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে তাওহীদ ও আখিরাতের যুক্তি অনুধাবন করা আরো সহজ হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন সরাসরি বিজ্ঞানচর্চার আহবান জানায়। আল্লাহ তায়ালা একথাও কুরআনে ঘোষণা করেছেন–'পৃথিবীর সবকিছুই তিনি মানুষের জন্য পয়দা করেছেন।'

তাই দেখা যায় যে, মানুষ বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সৃষ্ট বস্তুকে জানার চেষ্টা করে এবং তা মানুষের কাজে লাগায়। যদি বিজ্ঞানচর্চা মানুষ না করতো তাহলে সৃষ্টিজগৎকে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না এবং মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট যাবতীয় বস্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতো।

বিজ্ঞান যে বস্তুজগৎ নিয়ে গবেষণা করে তা আল্লাহর সৃষ্টি। তাই সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে কুরআন মজীদে যা কিছু বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে সত্য। কারণ সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর ধারণা বে-ঠিক হতে পারে না। এ কারণেই কুরআন ও বিজ্ঞানে কোনো বিরোধ হওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের গবেষণায় এ পর্যন্ত এমন কোনো সত্য উৎঘাটিত হয়নি—যা কুরআনের কোনো বক্তব্যকে ভুল প্রমাণিত করতে পারে। সুতরাং কুরআনে সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তাকে নির্ভুল সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে বিজ্ঞানচর্চা করা হলে সত্য আবিষ্কার করা সহজ হবে। যেমন মাতৃগর্ভের 'ভ্রূণ' সম্পর্কে কুরআন মজীদে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা এতদিনে আধুনিক বিজ্ঞান জানতে সক্ষম হয়েছে।

উক্ত আলোচনা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিজ্ঞানচর্চা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য ফিকাহ'র পরিভাষায় এটা করা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত না নফল সে বিষয়ে ফতোয়ার ভাষার কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে সূরা আলে ইমরানের ১৯১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন 'যারা সকল অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে (আল্লাহর কথা স্মরণ করে) এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে তারাই একথা উপলব্ধি করার যোগ্য হয় যে, আল্লাহ তায়ালা এ সৃষ্টিজগৎ অনর্থক সৃষ্টি করেননি।'

বর্তমান বিশ্বে লক্ষ্য করা যায় যে, যারা বিজ্ঞানচর্চা করছে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে না আর যারা আল্লাহর যিকিরে মশগুল আছে তারা বিজ্ঞানচর্চা করে না। এর ফলে বিজ্ঞানের ফসল অমুসলিমদের হাতে এবং তা মানুষের অকল্যাণেই বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। আর আল্লাহওয়ালারা বিজ্ঞানচর্চা না করার ফলে আল্লাহর সৃষ্টিকে ব্যবহার করারই যোগ্যতা অর্জন করছে না। কুরআনের এ আয়াতে আল্লাহ যিকির ও ফিকির (স্মরণ ও গবেষণা) একই সাথে করার তাগিদ দিয়েছেন।

(উক্ত বিষয়ে ডঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযামের লেখা 'কুরআনে বিজ্ঞান' বইটি বিশেষ উপযোগী।)

www.amarboi.org

ইসলাম

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে মসজিদ কেবলমাত্র নামায পালনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমার জানতে ইচ্ছা করে, কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে মসজিদে কি কি কাজ করার অনুমতি রয়েছে।

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের জবাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন থেকেই সন্ধান করতে হবে। ওহী নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূল (সাঃ)-এর ২৩ বছরের জীবনে তিনি যা কিছু বলেছেন ও করেছেন তার সবটুকুই ইসলামের বাস্তব রূপ। তাঁর জীবনী বিস্তারিতভাবে লিখিত আকারে বাংলা ভাষায়ও যথেষ্ট রয়েছে। এসব জীবনীর তথ্য হাদীস থেকেই সংকলিত।

রাসূল (সাঃ)-এর জীবনী থেকে আমরা জানতে পাই যে, তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার পর মসজিদকেই মুসলিম সমাজের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি মসজিদে সাহাবায়ে কেরামকে দ্বীনের ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, যখন প্রয়োজন মনে করেছেন মসজিদেই বক্তৃতা করেছেন। এসব বক্তৃতা শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই ছিল না, মুসলমানদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংস্কার সাধন, কুরআন অনুযায়ী জীবনে উন্নতি বিধান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা করণীয় তার উপদেশ দান, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান, এমনকি যুদ্ধের জন্য প্রেরণাদান ও যুদ্ধের ময়দানে বাহিনী প্রেরণ উপলক্ষে হেদায়াত দান ইত্যাদি যাবতীয় কাজ তিনি মসজিদেই সমাধান করতেন।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম না থাকার কারণেই বর্তমানে মসজিদ শুধু কয়েকটি ধর্মীয় কাজের কেন্দ্র হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন তাঁরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সব কাজ করতেন তাহলে তারাও রাসূল (সাঃ)-এর মতো মসজিদকেই মুসলিম সমাজের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতেন।

কুরআন ও সুন্নাহ যেসব কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে তার কোনোটাই মসজিদে করতে আপত্তির কোনো কারণ নেই। ঐসব কাজ যা মসজিদের মধ্যে করা সম্ভব নয় সেগুলোর কথা আলাদা।

প্রশ্ন ঃ 'ইসলামে নবীর মর্যাদা' বইতে আপনি লিখেছেন—নবী মাটির মানুষ, নবীর শরীর মাটির দ্বারা তৈরি।' অথচ আমরা জানি, নবী (সাঃ) নূরের তৈরি। একথাটা আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিবেন।

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁর রাসূলকে একথা ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন —'আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী আসে (তোমাদের কাছে ওহী আসে না আর এটাই তোমাদের সাথে আমার পার্থক্য)।'–সূরা আল কাহাফ ঃ ১১০ আয়াত

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে একথাও ঘোষণা করেছেন যে, মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ)-কে মাটি থেকেই পয়দা করা হয়েছে। রাসূলও ঘোষণা করেছেন—সব মানুষ আদম সন্তান, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি।

ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, নবী করীম (সাঃ) পিতার ঔরষে এবং মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। সব মানুষের মতো তাঁর খেতে হতো, ঘুমাতে হতো। অন্য মানুষের মতো তাঁর অসুখও হতো। তিনি যাঁদেরকে বিয়ে করেছেন তাঁরাও মাটির মানুষ ছিলেন। তাঁর ঘরে যে সন্তান হয়েছে তাঁরাও মাটির মানুষ ছিলেন। আর সব মানুষের মতই তিনি মৃত্যুও বরণ করেছেন। যদি তিনি মাটির মানুষ না হতেন তাহলে তায়েফে তার গায়ে পাথরের আঘাত লাগলো কেন ও যুদ্ধে তিনি আহত হলেন কেন? এ সত্ত্বেও যারা তাঁকে মাটির মানুষ বলে স্বীকার করে না তাদের জ্ঞানের ভিত্তি কী তা আমার জানা নেই। 'আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ' একথাটির অর্থ তাহলে কী?

আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে জানতে পাই যে, মানুষ মাটি থেকেই সৃষ্টি, জ্বীন আগুন থেকে আর ফেরেশতা নূর থেকে।

মানুষের দেহটি আসল মানুষ নয়। আসল মানুষ হচ্ছে রূহ। আর এ রূহটি মাটির তৈরি নয়। সুতরাং সব মানুষই মাটির সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও রূহ তাকে ঐ মর্যাদা দান করেছে—যার ফলে মানুষ সমস্ত পশু-পক্ষীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ মানুষদের মধ্যে নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। আবার নবীদের মধ্যেও কোনো কোনো নবীর মর্যাদা অনেক উন্নত। আর নবীদের মধ্যেও যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চ। এ নবুয়ত মাটির তৈরি নয়। নবুওয়াতে মুহাম্মদী অবশ্যই আল্লাহর বিশেষ নূর। কিন্তু নবীর দেহ অন্য সব মানুষের মতই।

রাসূল যদি অন্য সব মানুষের মতো না হতেন তাহলে তিনি মানুষের আদর্শ হওয়ার যোগ্য হতেন না। আল্লাহ মাটির মানুষকেই এজন্য আদর্শ বানিয়েছেন যাতে আর সব মানুষ তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব মনে করে। রাসূল অতিমানব বা মানব-প্রকৃতির উর্ধের কোনো জীব ছিলেন না। অবশ্য তিনি গুণের দিক দিয়ে মহামানব ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ কেউ অনশন ধর্মঘট করে মারা গেলে তার মৃত্যু কি আত্মহত্যার শামিল হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ইচ্ছাকৃতভাবে না খেয়ে থাকার কারণে মারা গেলে তা আত্মহত্যা বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ 'শাহাদাত' শব্দের অর্থ কী? ইসলামের দৃষ্টিতে 'শহীদ' কাকে বলে?

উত্তর ঃ 'শাহাদাত' শব্দের অর্থ 'সাক্ষ্য'। কালেমা শাহাদাতে একথাই বলা হয়—'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।' ইসলামের পরিভাষায় শহীদ তাঁকেই বলা হয়, যে আল্লাহর পথে জীবন দান করে। এ কারণেই তাঁকে শহীদ বলা হয় যে, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে একথারই সাক্ষ্য দিলেন, তিনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য

www.amarboi.org

জীবন কুরবানী দিতে প্রস্তুত। নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবনকে যাঁরা ত্যাগ করেন তাঁদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা এ পরিভাষা নিজেই সৃষ্টি করেছেন।

আর কোনো ভাষায় 'শহীদ' শব্দটির মর্যাদাসম্পন্ন কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। তাই নিঃস্বার্থভাবে বৃহত্তর কোনো উদ্দেশ্যে যাঁরা জীবন দেয় তাঁদেরকে 'শহীদ' শব্দ দিয়েই মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। দেশের জন্য, ভাষার জন্য এমনকি ইসলাম বিরোধী কোনো মতবাদের জন্য জীবন দিলেও তাদের সমর্থকরা 'শহীদ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতপক্ষে 'শহীদ' হিসেবে কাদেরকে গণ্য করবেন সেটা তিনিই জানেন। আমরা এটুকু জানি যে, 'শহীদ' শব্দের সঠিক প্রয়োগ তাঁদের পক্ষেই খাঁটে যারা আল্লাহর পথে জীবন দেয়। তারাই সত্যিকারের শহীদ। এছাড়াও যদি ঈমানদার লোক জনগণের কোনো কল্যাণে জীবন দেয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তাঁকেও শহীদের মর্যাদা দিতে পারেন। এমনকি হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত যে, আল্লাহ তায়ালা ঐসব লোককেও শহীদ বলে গণ্য করবেন—যারা আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে, দুর্ঘটনায়, কলেরায় ও প্লেগ ইত্যাদি রোগে মারা যায়।

প্রশ্ন ঃ তাওবাহ করলে গুনাহ মাফ হয়। কিন্তু তাওবাহ করেও আবার সেই পাপকাজে লিপ্ত। এখন আবার তাওবাহ করলে গুণাহ মাফ হবে কিনা ? যদি মাফ হয় তাহলে আবার হয়তো পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে। এভাবে তাওবাহ আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হবে কি ? মেহেরবানী করে কুরআন-হাদীসের আলোকে জানাবেন।

উত্তর ঃ 'তাওবাহ' শব্দের অর্থ হলো 'অনুতাপ'। যখন কোনো মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করে তখন স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর সঙ্গে তার একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন পিতার আদেশ অমান্য করলে সন্তান নিজেই পিতা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। সে যদি অনুতপ্ত হয় তাহলে অস্থির হয়ে পিতার কাছেই ফিরে পায়ে পড়ে মাফ চায়। এমনিভাবে গুনাহগার ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে অনুতপ্ত হয় তাহলে সে আল্লাহর কাছে ধরনা দিয়ে মাফ চাইতে থাকবে। গুনাহ করার ফলে সে আল্লাহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। তাওবাহ করে সে আবার আল্লাহর কাছে ফিরে আসলো। এ জন্যই 'তাওবাহ' শব্দের আর একটি অর্থ 'ফিরে আসা'।

হাদীস থেকে তাওবার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে 'তাওবাহ' বলতে তিনটি জিনিস বুঝায়। প্রথমতঃ অনুতাপ, দ্বিতীয়তঃ কাতরভাবে ক্ষমা চাওয়া এবং তৃতীয়তঃ এ গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। এ ধরনের তাওবাহকেই কুরআন পাকে 'তাওবাতুন নাসুহা' বা আন্তরিক তাওবাহ বলা হয়েছে।

সূরা আন-নিসার ১৭ ও ১৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন—'তাদেরই তাওবাহ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার যোগ্য যারা না বুঝে কোনো খারাপ কাজ করে বসে এবং দেরী না করে তাওবাহ করে। কিন্তু তাদের তাওবাহ অর্থহীন—যারা পাপ কাজ করতেই থাকে আর মৃত্যু উপস্থিত হলে তাওবাহ করে।'

www.amarboi.org

এ আয়াত থেকে মনে হয়, ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে-শুনে পাপ করলে তা ক্ষমার যোগ্য নয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বারবার ঘোষণা করেছেন শিরক ছাড়া সকল গুনাহ তাঁর নিকট ক্ষমা পেতে পারে।

সূরা আয যুমারের ৫৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন—'হে রাসূল ! আপনি বলে দিন, হে আমার ঐ বান্দাহ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না।'

সুতরাং তাওবাহ করার পরেও বারবার গুনাহ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়, তাওবাহ করতে থাকাই উচিত। আল্লাহ তায়ালা মানুষের দীলের খবর রাখেন। কে নিজেকে সংশোধন করার ইচ্ছা রাখে কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় বারবার গুনাহে লিপ্ত হয় আর কে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এই ধারণা নিয়েই ইচ্ছা করে বারবার গুনাহ করে এবং তাওবার অভিনয় করে। সত্যিকার তাওবার প্রমাণ এটাই যে, তাওবাকারী যে গুনাহ থেকে তাওবা করলো তার থেকে ফিরে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে নবী না পাঠিয়ে আদম সন্তানকে কেন নবী করা হলো ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে নিজেই সরাসরি হুকুম করেন। তারা আল্লাহ তায়ালার বিশাল সৃষ্টির একান্ত অনুগত কর্মচারী। সূরা আন নাহলের ৫০ আয়াতে আল্লাহ বলেন—'তাদেরকে যা হুকুম করা হয় তারা তাই পালন করে।' আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ইখতিয়ার তাদেরকে দেয়া হয়নি। তাই তারা আল্লাহর নির্দেশ ঠিক ঠিকভাবে পালন করা সত্ত্বেও পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী হবে না। আর আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা না থাকার কারণে তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্যও নয়।

কিন্তু মানুষ এমন এক সৃষ্টি যাকে আল্লাহর হুকুম পালন করা ও অমান্য করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। তাই এ এখতিয়ার অনুযায়ী তারা পুরস্কার ও শাস্তি পাবে। তাদেরকে ভালো ও মন্দ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দেয়ার জন্যই নবী পাঠানো হয়েছে। তাই মানুষ মন্দ কাজ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তা থেকে ফিরে থাকে তাহলে সে অবশ্যই পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী হবে। সব মানুষকে এসব বিষয়ে আল্লাহ সরাসরি নির্দেশ দেননি, তাই তাদের নিকট নবী পাঠানোর প্রয়োজন হয়েছে। ফেরেশতাদেরকে যেহেতু আল্লাহ সরাসরি নির্দেশ দেন সেহেতু তাদের নিকট নবী পাঠানো প্রয়োজন নেই।

যেহেতু মানব জাতির হেদায়াতের জন্যই নবী পাঠানো হয়েছে, সেহেতু মানুষের মধ্য থেকেই নবী পাঠানো স্বাভাবিক হয়েছে। নবী শুধু আল্লাহর বাণীবাহক নন, আল্লাহর বিধানকে বাস্তবে আমল করে দেখিয়ে দেয়াও নবীর দায়িত্ব। রোগ-শোক, জ্বরা-মৃত্যুর কারণে মানুষের জীবনের যে সমস্যা রয়েছে ফেরেশতারা এ সকল সমস্যা থেকে মুক্ত। তাই যদি ফেরেশতাদের নবী করে পাঠানো হতো তাহলে ফেরেশতাদের মধ্যে মানুষ কোনো অনুকরণযোগ্য আদর্শ পেতো না। মানুষ আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য এ অজুহাতকেই যথেষ্ট মনে করতো যে, আমরা ফেরেশতাদের মতো

www.amarboi.org

সমস্যামুক্ত নই। সুতরাং আমাদের পক্ষে ফেরেশতার অনুসরণ করা অসম্ভব। তাই মানুষের জন্য 'মানুষ' নবী হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

কুরআন মজীদে একথা উল্লেখ রয়েছে, কাফিররা বলেছিলো—'আমাদের মতো একজন মানুষ কী করে নবী হতে পারে? কোনো ফেরেশতারই নবী হওয়া উচিত।'.

আল্লাহ তার জবাবে বলেছেন—'জমিনে যদি মানুষের জায়গায় ফেরেশতারা বাস করতো, তবে তাদের নিকট ফেরেশতাদেরই নবী করে পাঠাতাম।'(সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৫৫ আয়াত)

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সাঃ)-এর জামানার মানুষ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর মধ্যে কি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের ডাক পেয়েছিলো? নাকি আল কুরআনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিকভাবে আহ্বান ও সংগঠনের পর পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের ডাক পেয়েছিল যা পূর্বের অবতীর্ণ (মক্কী) আয়াতগুলোতে ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত? (মক্কী যুগের কোনো আয়াতে এ পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের ডাক এলে তার আয়াত নম্বর ও সূরার নাম উল্লেখ করুন।)

যদি উপরোক্ত কালেমাতেই তখনকার মানুষ পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের ডাক পেয়ে থাকে তাহলে অন্তত আরবী ভাষাভাষি আজকের মানুষ কেন পায় না?

উত্তর ঃ সব রাসূলের জামানায়ই রাসূলগণের দাওয়াত প্রথম থেকেই পূর্ণাঙ্গ ছিল। কুরআন মজীদে বিভিন্ন নবীর নাম উল্লেখ করে তাঁরা মানুষকে যে দাওয়াত দিয়েছেন তা একই ভাষায় প্রকাশ হয়েছে। বিশেষ করে সূরা আল আ'রাফ ও সূরা হুদ-এ নবীগণের ঐ দাওয়াত বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। দাওয়াতের ঐ বাক্যটি হলো-'হে আমার কাওম, এক আল্লাহরই দাসত্ব করো। কেননা তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"

এ দাওয়াত যারা কবুল করতেন তারাই 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে নবীর ডাকে সাড়া দিতেন। নবী মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্বের দাওয়াত দিতেন। এই দাওয়াত যে ভাষায় কবুল করা হতো সেটাকেই আমরা 'কালেমা তাইয়্যেবা' বলে থাকি।

নবীর এই দাওয়াতকে বিপ্লবের ডাক হিসেবে বুঝতে কোনো মানুষের বেগ পেতে হয়নি। তাই দেখা যায়, সব যুগেই নবীগণকে তাদের নিজ নিজ দেশের মানুষ সবচেয়ে ভালো মানুষ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাদের দাওয়াতকে সহজে কবুল করতে রাজী হয়নি। বিশেষ করে সমাজের সকল শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় লোকেরাই নবীদের সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা করেছে। মূসা (আঃ)-ও এ দাওয়াতই দিয়েছিলেন। ফিরাউন এ দাওয়াতের অর্থ বুঝতে ভুল করেনি। শেষ নবীর সময়ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একথা ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলো যে, জনগণ যদি একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের এ বিপ্লবী দাওয়াতকে কবুল করে বসে তাহলে মনগড়া শাসন ও শোষণের সুযোগ খতম হয়ে যাবে। তাই চিরকালই সকল রকমের কায়েমী স্বার্থ নবীর ঐ দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে।

এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সেকালে নমরূদ, ফিরাউন ও আবু জেহেলেরা নবীদের দাওয়াতকে যতটুকু বুঝেছিল, আজ বহু মুসলমানও ততটুকু বুঝে না। তারা

www.amarboi.org

নবীর বিপ্লবী দাওয়াতকে বুঝতে পেরেছিল বলেই বিরোধিতা করা প্রয়োজন মনে করেছে। আর আজ মুসলমানরা অনেকেই নবীর অনুসরণের দাবীদার হয়েও তাদের দাওয়াতের বিপ্লবী দিককে উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে না।

একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কবুলের দাওয়াতের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীত সকল আনুগত্যের দাবীদার শক্তিকে অস্বীকার করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকার কারণেই ঐসব আনুগত্যের দাবীদাররা নবীদের বিরোধিতা করেছে। যেসব শক্তি আল্লাহর দাসত্বের বিপরীত আনুগত্য মানুষের নিকট দাবী করে তাদেরকে কুরআন মজীদে 'তাগুত' বলা হয়েছে।

আয়াতুল কুরসীতে (সূরায়ে আল বাকারার ২৫৬ আয়াতে) বলা হয়েছে—'যে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো সে এমন মজবুত রশি ধারণ করলো যা কখনো ছিড়তে পারে না।'

উক্ত আয়াতে একথাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনতে হলে তাগুতকে প্রথমেই অস্বীকার করতে হবে। এ কারণেই কালেমা তাইয়্যেবাতেও পয়লা 'লা-ইলাহা' বলার দ্বারা তাগুতকে অস্বীকার করা বুঝাচ্ছে এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলার দ্বারা আল্লাহর প্রতি ঈমান বুঝাচ্ছে।

নবীগণের ঐ বিপ্লবী দাওয়াত না বুঝার কারণেই বহু ওলামা ও মাশায়েখ পর্যন্ত তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদের চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করেন না। নবীদের দাওয়াতের বিপ্লবী দিককে সঠিকভাবে বুঝার অভাবেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের ব্যাপারে তাদের নিয়তে কোনো ত্রুটি নেই এবং তাদের ইখলাসেরও কোনো কমতি নেই। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বুঝারই অভাব। তাদের এ বুঝার অভাব আরবী ভাষা না জানার কারণে নয়। তারা আরবী জানেন। তাই যাদের মাতৃভাষা আরবী তাদের মধ্যেও নবীর বিপ্লবী দাওয়াত উপলব্ধি করার অভাব থাকতে পারে।

এখানে ভাষা কোনো সমস্যা নয়, নবীর বিপ্লবী দিককে উপলব্ধি করার অভাবই আসল সমস্যা।

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআনে একটি আয়াতে বলা হয়েছে—'আমি তোমাদেরকে (মানুষকে) মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি।' আবার অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে—'আমি তোমাদেরকে একবিন্দু নাপাক পানি ও জমাটবদ্ধ রক্ত হতে সৃষ্টি করেছি।' এ দুটি আয়াত স্ববিরোধী নয় কি ? তাফসীরসহ আয়াত দু'টি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ এ দুটো আয়াতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানুষটিকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন এবং তার দেহ থেকে তার স্ত্রীকে তৈরি করেছেন। অতঃপর তাদের মাধ্যমে মানব জাতির বংশবিস্তারের ব্যবস্থা করেছেন। পুরুষ ও নারীর মিলনের ফলে যে বস্তু থেকে মানব শিশুর দেহ গড়ে ওঠে সে বস্তুও মূলতঃ মাটির দেহ থেকে সৃষ্টি। মানুষের দেহ গঠন ও বৃদ্ধির জন্য এবং যতদিন সে বেঁচে থাকে ততদিন তার জীবন ধারণের জন্য যেসব খাদ্য ও পানীয় সে গ্রহণ করে তা মাটিতেই উৎপন্ন হয়। পানির যে বিন্দু থেকে মায়ের পেটে মানব শিশু তৈরি করা হয়

www.amarboi.org

তা মানুষের দেহ থেকেই উৎপন্ন হয়। তাই আল্লাহর একথার মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই।

সূরা আল মু'মিনূনের ১২ থেকে ১৪ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে—'আমি মানুষকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে শুক্রে পরিণত করে এক নিরাপদ জায়গায় রেখেছি। এরপর শুক্র জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত করেছি। তারপর এ রক্তখণ্ডকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছি। এরপর মাংসপিণ্ডকে হাড়ে পরিণত করেছি। তারপর এ হাড়ের ওপর জামা পরিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ সূরা নিসার ১৩৫ আয়াতে ঈমানদারকে 'সত্যের সাক্ষী' হয়ে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। এ কোন্ সত্যের সাক্ষ্য? এতে যদি যে সত্যের ওপর আমরা ঈমান এনেছি সেই সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে বলা হয়ে থাকে তবে বলুন, সেই সত্যটা কি?

উত্তর ঃ এ আয়াতে 'সত্যের সাক্ষ্য' হিসেবে দাঁড়াবার যে নির্দেশ রয়েছে তা অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। যারা ইসলামের প্রতি ঈমান আনার দাবীদার তাদেরকে এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের কথা, কাজ, আচরণ এবং তাদের জীবনের সকল কর্মে একথা প্রমাণ করে যে, ইসলামই একমাত্র সত্য। ইসলামের দাবীদার হয়ে যদি নিজেরাই ইসলামকে পালন না করে তাহলে তাদের এ আচরণ অমুসলিমদের নিকট একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, ইসলামকে তারা সত্য মনে করে না।

সুতরাং সত্যিকার মুসলিম হতে হলে তার গোটা জীবন মানুষের সামনে 'ইসলামের সাক্ষী' হিসেবে তুলে ধরার যোগ্য হতে হবে। এই দায়িত্ব পালনেরই নির্দেশ এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহঃ)-এর 'সত্যের সাক্ষ্য' পুস্তিকাটি পাঠ করা অবশ্যই কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী অর্থাৎ ঈমানদার হয়ে অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম গ্রহণ করলে অসুবিধা কোথায়?

উত্তর ঃ যদি কেউ আল্লাহ ও রাসূলে সত্যিকার বিশ্বাসী হয় তাহলে সে অর্থনৈতিক বিধানও কুরআন থেকেই নেবে। মানব রচিত কোনো অর্থনৈতিক মতবাদ যদি কুরআনের বিরোধী না হয় তাহলে তা গ্রহণ করায় কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম যে মতবাদ প্রচার করে তা শুধু অর্থনৈতিক নয়, তা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে বহু বিষয়ে কুরআনের বিরোধী। তাই একজন ঈমানদারের পক্ষে এ মতবাদ গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

অর্থনীতিই মানুষের একমাত্র দিক নয়। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক যে কাঠামো পেশ করে তার সাথে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কারণেই কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই। কিন্তু গণতন্ত্র মানুষের এমন মৌলিক দাবী যা দাবিয়ে রাখা যায় না। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশেও গণতান্ত্রিক হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং এর সাথে সাথে সমাজতন্ত্রের কঠোর অর্থনৈতিক বিধানও পরিবর্তন

www.amarboi.org

করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় একজন মুসলিমের নিকট অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে সমাজতন্ত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া অস্বাভাবিক। এ চিন্তা তারাই করতে পারে যারা কুরআন থেকে শুধু ধর্মীয় দিকটুকুই গ্রহণ করতে চান। ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে বিশ্বাস করলে এ ধরনের চিন্তা মগজে স্থান পেতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ (ক) বাতিল সরকার মানব রচিত আইন দ্বারা মুসলিম বা অমুসলিম লোককে কি ফাঁসির রায় দিতে পারে ? যে হাকিম ফাঁসির রায় দিলেন পরকালে কি তার শাস্তি হবে ? মৃত ব্যক্তি মু'মিন বা কাফির যা-ই হোক, পরকালে তার কী ফয়সালা হবে ?

(খ) একটা লোক ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছে, কিন্তু লোকটার তিনটি খারাপ অভ্যাস ছিল। সে জীবনে নামাজ পড়ে নাই, মদাসক্ত ছিল এবং যিনা করতো। শহীদ হওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তওবাহ করেনি। এভাবে 'শহীদ' নাম দিয়ে কি হিসেবে বেহেশতে যেতে পারবে ?

উত্তর ঃ এ দু'টো প্রশ্নই এমন বিষয়ে যার ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই হাতে। এ জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করায় কোনো লাভ নেই। প্রশ্ন চিন্তাশীল লোকের মনেই সৃষ্টি হয় এবং তারাই পথের সন্ধানী হয়ে থাকে। তাই যাদের মনে বেশী বেশী প্রশ্ন জাগে তাদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন যাতে দুনিয়ায় দ্বীনের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় প্রশ্নকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। যেসব প্রশ্নের মীমাংসা মানুষের হাতে নয় সেগুলোতে মন-মস্তিষ্ক প্রয়োগ করে পেরেশান হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ঃ তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করতে গিয়ে এখানে এসে আটকে গেলাম— 'ব্যাপার হলো আল্লাহ আদম ও ফেরেশতাদেরকে পরীক্ষা করেছেন—কে শ্রেষ্ঠ অথচ পূর্বেই আদমকে সকল প্রশ্নের জবাব শিখিয়ে দিলেন আর ফেরেশতাদের সামনে তা বলতে বললেন। কিন্তু ফেরেশতারা উত্তর দিতে না পেরে বললেন, আমরা ততটুকুই জানি যতটুকু আপনি আমাদেরকে জানিয়েছেন।'

বুঝা গেল, আদমকে প্রশ্নের উত্তর জানালেন আর ফেরেশতাদেরকে জানালেন না ? সুতরাং এটা আমাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নয় কি ? আল্লাহ পক্ষপাত করলে তার গূঢ় রহস্য কী ? বুঝিয়ে বললে উপকৃত হবো।

উত্তর ঃ আপনি তাফহীমুল কুরআন মনোযোগ দিয়ে পড়লে এ প্রশ্নের জবাব সেখানেই পাবেন। আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এর পরীক্ষা নিয়েছেন বলে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ তায়ালার পক্ষে এ রকম পক্ষপাতিত্ব করার ধারণা অত্যন্ত অন্যায়।

আসল ব্যাপার হলো, দুনিয়ায় আল্লাহ খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাবেন বলে ঘোষণা শুনে ফেরেশতাদের মনে এ খটকা সৃষ্টি হলো যে, তারা তো আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব যথাযথই পালন করেছেন, তাহলে আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী ?

www.amarboi.org

ফেরেশতাদের ধারণা ছিল যে, তারা যে দায়িত্ব পালন করেছেন এতে আল্লাহ পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। তাই ঐ দায়িত্বটি আরো ভালোভাবে পালন করার জন্যই হয়ত আদমকে সৃষ্টি করার প্রয়োজন মনে করেছেন। ফেরেশতাদের এ ধারণা যে সঠিক ছিল না সে কথা বুঝাবার জন্যই আল্লাহ তায়ালা ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে দায়িত্ব পালনের উপযোগী জ্ঞান তাদের দিয়েছেন। আদমকে যে দায়িত্ব আল্লাহ দিতে চাচ্ছেন সে দায়িত্বের উপযোগী জ্ঞানও তাকে দিলেন। ফেরেশতাদের কাছে আদমকে দেয়া জ্ঞান যে নেই একথা প্রমাণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বুঝিয়ে দিলেন, আদমকে অন্য রকম দায়িত্ব পালনের জন্যই পয়দা করা হয়েছে। যেমন যাকে ডাক্তারী করার দায়িত্ব দেয়া হবে তাকে ডাক্তারী বিদ্যাই শিক্ষা দেয়া হয়। আর যাকে দেশরক্ষার দায়িত্ব দেয়া হবে তাকে তার উপযোগী জ্ঞানই দেয়া হয়। তাই ডাক্তার শ্রেষ্ঠ, না সেনাবাহিনীর অফিসার শ্রেষ্ঠ, সে তুলনা অবান্তর। প্রত্যেকে যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল। ঠিক তেমনি ফেরেশতার জায়গায় ফেরেশতা যোগ্য। খেলাফতের দায়িত্বের বেলায় আদম যোগ্য। এখানে আদম ও ফেরেশতার মধ্যে তুলনার কোনো ভিত্তি নেই।

সম্ভবতঃ আদমকে ফেরেশতাদের সেজদা করার হুকুম থেকে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আদম শ্রেষ্ঠ বলেই তাকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের হুকুম করা হয়েছে। যদি শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতেই সেজদা করার নির্দেশ দেয়া আল্লাহ সঠিক মনে করতেন তাহলে পিতাকে সেজদা করার জন্য সন্তানদের নির্দেশ দিতেন, উস্তাদকে সেজদা করার জন্য ছাত্রদের নির্দেশ দিতেন, শাসককে সেজদা করার জন্য জনগণকে নির্দেশ দিতেন। এতে বুঝা গেল আদমকে সেজদা করার নির্দেশের কারণ ভিন্ন। সে কারণটি হলো, খেলাফতের সহযোগিতা না পেলে দুনিয়ায় কোনো কাজই করতে পারবে না। মানুষকে যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী করার ইখতিয়ারও দেয়া হয়েছে সেহেতু আল্লাহর মর্জির খেলাপ মানুষ কোনো বস্তুর ব্যবহার করতে চাইলে সেই বস্তুর হেফাজতকারী ফেরেশতা যদি বাধা দেয় তাহলে মানুষের ইখতিয়ার থাকে না।

ফেরেশতারা আল্লাহর নাফরমানী করে না এবং আল্লাহর নাফরমানী পসন্দও করে না। তাই আল্লাহর নাফরমান বান্দাদেরকে দুনিয়ায় চলার পথে পদে পদে বাধা দিলে আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা ব্যাহত হতে বাধ্য। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা আদমকে সেজদা করার মাধ্যমে ফেরেশতাদেরকে একথা মেনে নিতে বাধ্য করেছেন যে, তারা যেন মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে। মানুষ কোনো বস্তুকে আল্লাহর পসন্দমতো ব্যবহার করুক বা আল্লাহর মর্জির খেলাফ ব্যবহার করুক, উভয় অবস্থাতেই ফেরেশতারা যেন মানুষের সহযোগিতা করে। যেমন কেউ যদি আগুন দিয়ে একজনের বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তখন ফেরেশতা আগুনে জ্বালাবার ক্ষমতা নষ্ট করে দিলে ঐ ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। বস্তুজগতের ব্যবহারে মানুষের এই ইখতিয়ারকে মেনে নেয়ার জন্যই সেজদার মাধ্যমে ফেরেশতাদেরকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ কোনো কোনো মসজিদে দেখা যায়, ছোট সাইনবোর্ডে লেখা আছে— 'মসজিদে দুনিয়ার কোনো আলাপ করা হারাম'। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যা চাই।

উত্তর ঃ সাধারণত দেখা যায়, যারা ব্যস্ত মানুষ তারা নামায সেরে তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু যাদের প্রচুর অবসর আছে তারা নামাযের পরে, বিশেষ করে আসর ও এশার নামাযের পর মসজিদে বসেই নানা রকম আলাপ-সালাপ করেন। এতে মনে হয়, মসজিদকে বৈঠকখানার মতোই ব্যবহার করা হচ্ছে। মসজিদের কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় বৈঠকী গল্প-গুজব থেকে মুসল্লিদেরকে বিরত রাখার জন্যই এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে।

মসজিদে নামায ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা, ওয়াজ ও সীরাত মাহফিল ইত্যাদি হয়ে থাকে। কোথাও দারসে কুরআনের নিয়মিত মাহফিল হয়। এসব মাহফিলে দুনিয়ার মানুষের বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে বক্তাগণ অনেক কথাই বলেন। এসবকে 'দুনিয়াবী আলাপ' হিসেবে মসজিদ কমিটি গণ্য করেন না। এতে একথাই প্রমাণিত হয়, দ্বীনের ভিত্তিতে দুনিয়ায় প্রয়োজনীয় আলোচনা নিষেধ করা উক্ত বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য নয়।

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর পশু জবেহ করার সময় গরু হলে ৭ জনের, ছাগল হলে ১জনের নাম উল্লেখ করা হয়। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো গায়রুল্লাহর নামে পশু জবেহ করা নিষিদ্ধ। কুরবানীর পশু জবেহ করার প্রচলিত প্রথা কি ভুল হচ্ছে না ? সঠিক পন্থা জানতে চাই।

উত্তর ঃ কুরবানী করার সময় যে দোয়া পড়া হয় এবং পশুর গলায় ছুরি বসানোর সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' এবং 'আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা' বলা হয় তাতে একথা সুস্পষ্ট যে, একমাত্র আল্লাহরই নামে কুরবানী দেয়া হয়।

গরুর বেলায় ৭ জন আর ছাগলের বেলায় ১ জনের নাম এজন্য উল্লেখ করা হয় যে, কুরবানী তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া হয়। আল্লাহরই নামে কুরবানী দেয়া হলো, কিন্তু কুরবানী দিল কে—সে কথা উল্লেখ করার জন্যই কুরবানীদাতাদের নাম বলা হয়।

নামায

প্রশ্ন ঃ জুমআ'র আযান দু'রকমের হলো কেন ? আযানের এ নিয়ম কি রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ? মসজিদের ভিতরে ইমামের সামনে আস্তে আযান দেয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত বা হাদীস সঙ্গত ?

উত্তর ঃ জুমআ'র যে আযান খুৎবার পূর্বে দেয়া হয় তা-ই জুমআ'র আসল আযান। রাসূল (সাঃ)-এর সময় এ আযানই প্রচলিত ছিল। তা জোরে দেয়ারই

www.amarboi.org

নিয়ম। পরবর্তীকালে হযরত উসমান (রা)-এর সময় কর্মব্যস্ত লোকদের নামাযের জন্য যথাসময়ে প্রস্তুতি গ্রহণের সুবিধার্থে খুৎবার বেশকিছু সময় পূর্বে আরও একটি আযান দেয়ার নিয়ম চালু করা হয়। জুমআ'র আযানের এই নিয়মের ব্যাপারে যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের ইজমা আছে, তাই এতে আপত্তির কিছু নেই।

প্রশ্ন ঃ আমার মধ্যে নফল নামায পড়ার ব্যাপারে অনীহা দেখা দিয়েছে। কী করি?

উত্তর ঃ অনীহা দেখা দেয়া আপত্তিকর। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–'নফল ইবাদত আল্লাহর নৈকট্য বাড়ায়।' যে কর্মচারী অতিরিক্ত কাজ করে সে-ই মালিকের শুভাকাঙ্খী ও কল্যাণকামী বলে প্রমাণিত হয়।

হাদীস শরীফে আছে, হাশরের দিন যখন নামাযের হিসাব নেয়া হবে তখন ফরয নামাযে ত্রুটি পাওয়া গেলে নফল নামাযের সাহায্যে সে ত্রুটি পূরণ করা হবে। ফরয নামাজ জামায়াতের সাথে পড়ার হুকুম রয়েছে। আবার জামায়াতের নামাযে রিয়ার বা প্রদর্শনেচ্ছাভাব থেকে বাঁচার জন্য একান্তে নফল নামায আদায় করা দরকার।

নফল নামায চব্বিশ ঘন্টাই কালেমা তাইয়্যেবার দাবী অনুযায়ী চলার অভ্যাসকে দৃঢ় করে। নফল নামায সর্বদাই একা পড়ার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ যুবক-যুবতীর পর্দাসহ একত্রে জামায়াতে নামায পড়া জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ জায়েয, তবে মেয়েরা পেছনে থাকবে আলাদা কাতারে। নবী করীম (সাঃ)-এর জামানায়ও মেয়েরা জামায়াতে শরীক হয়েছে। এখন মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফেও এরূপ হয়। মসজিদে নববীতেও মেয়েদের জন্য আলাদা এক এলাকাই রাখা হয়েছে। মক্কার হারাম শরীফে এ ব্যবস্থা নেই। অনেক সময় দেখা যায়, মেয়েরা এক সঙ্গে অনেকে আছে, এর পরেই পুরুষ। কারণ কাবা শরীফের চারপাশেই মসজিদের এলাকা। সেখানে মেয়েদের পেছনে নির্দিষ্ট জায়গা রাখা অসম্ভব।

যুবক ও যুবতীর এক জামায়াতে নামায হতে পারে। তবে যেন একে অপরকে দেখার সুযোগ না পায়। হাদীসে আছে, নবী (সাঃ) বলতেন 'নামাযের পর মেয়েদের চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কেউ বেরিও না। 'নফল ও সুন্নাত পড়ার জন্য মেয়েদের দেরী করা উচিত নয়। ফরয পড়ে তারা চলে যাবে যাতে পুরুষের সামনা-সামনি হতে না হয়। সেভাবে নামাযের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু মেয়েদের জন্য জামায়াত ওয়াজিব নয়। ঘরে নামায আদায় করাই তাদের জন্য বেশী ভালো। মসজিদে অন্ততঃ জুমআয় তাদের নামায পড়ার সুব্যবস্থা থাকা উচিত।

প্রশ্ন ঃ জারজ সন্তান আলেম হলে তার পেছনে নামায পড়া জায়েজ হবে কি?

উত্তর ঃ জারজ সন্তান আলেম হলেও তার ইমামতি মাকরূহ। অবশ্য তার পেছনে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। তিনি আলেম হলে তার নিজেরই ইমামতি না করা উচিত যেহেতু তিনি এ মাসয়ালা জানেন। মুসল্লীরা যদি জানে যে, ইমাম জারজ তাহলে তাদের এমন ইমামের পেছনে নামায পড়তে রাজী হওয়া উচিত নয়। অবশ্য

www.amarboi.org

ইমামতি করার যোগ্য কোনো লোক না পাওয়া গেলে বাধ্য হয়ে কোনো সময় এমন লোকের ইমামতিতে নামায আদায় করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ নামাযে মনোযোগ ধরে রাখা যায় কিভাবে ? জামায়াতে নামায ও একাকী নামায-উভয় অবস্থাকে সামনে রেখে বলুন।

উত্তর ঃ শয়তান নামাযের সময়ই বেশী তৎপর হয়। তাই দেখা যায়, নামাযের সময় আজেবাজে কথা মনে আসে, অন্য সময় তত কথা মনে আসে না। কারণ শয়তান মু'মিনকে নামায থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করার পরও যখন বান্দাহ নামায আদায় করে তখন শয়তান সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে ঐ বান্দাহর নামায নষ্ট করার জন্য।

শয়তানের সাথে সংঘর্ষ করেই নামাযে মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য নামাযে আল্লাহকে হাজির নাজির জানতে হবে। হাজির নাজির জানার অর্থ তিনি উপস্থিত আছেন এবং তিনি আমাকে দেখছেন—একথা মনে দৃঢ়ভাবে জাগরুক রাখা।

জামায়াতে নামাযের সময় ইমামের ক্বেরাতের দিকে খেয়াল করতে হবে। যে ওয়াক্তে বা যে রাকাতে ইমাম চুপে চুপে ক্বেরাত পড়েন তখন মনকে খোদার দিকে রুজু রাখার চেষ্টা করতে হবে। ইমাম যখন শুধু সূরা ফাতেহা পড়েন তখন মুক্তাদি সূরা ফাতেহা মনে মনে পড়বেন, না মুখেও পড়বেন, না আদৌ পড়বেন না—এ ব্যাপারে ইখতেলাফ আছে। ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে ইমাম সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলান, কিন্তু মুক্তাদি জানতে পারেন না যে, ইমাম কোন্ সূরা পড়ছেন। তাই এ সময় মনকে নিবিষ্ট রাখার জন্য মনে মনে যিকির করতে থাকবেন। মন এমন জিনিস যা খালি থাকে না। মনকে একদিকে ব্যস্ত না রাখলে সে অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। শয়তান তাকে অন্যদিকে কাজে লাগাবে। তাই নামাযে যা পড়া হয় তার মর্মকথার দিকে খেয়াল রাখতে চেষ্টা করতে হবে যাতে শয়তান ধোঁকা দেয়ার ফাঁক না পায়।

একাকী নামায পড়ার সময় আল্লাহকে হাজির নাজির জানার সাথে সাথে পঠিত সূরা ও দোয়াগুলোর অর্থ, তাৎপর্য ও দাবীর দিকে খেয়াল রেখে নামায পড়লে মন নামাযে আবদ্ধ থাকবে। এ সময় মুখে অনেক কিছু পড়ার পরও মন অন্যদিকে চলে যেতে চায়। তাই দাঁড়ানো, রুকু বা সেজদারত অবস্থায় মুখে যা পড়া হয়, মনকে তার সাথে যুক্ত রাখতে হবে। এটা সাধনার ব্যাপার। শয়তানের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন ঃ নামাযরত অবস্থায় কোনো কোনো ব্যক্তিকে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। কেউ কেউ চোখ বন্ধ করেও থাকেন। এ অবস্থা থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও মুক্ত নন। সংশোধনে আপনার চিন্তা কী ?

উত্তর ঃ নামাযরত অবস্থায় ধ্যান ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করা জায়েজ হবে, কিন্তু সম্পূর্ণ সময় চোখ মুদে রাখা ঠিক নয়। কারণ তাহলে চোখের ট্রেনিং হবে

www.amarboi.org

না। নামাযের কোন অবস্থায় কোথায় চোখ রাখতে হবে তা নির্ধারিত রয়েছে। নামায হচ্ছে কর্মজীবনে সর্বাবস্থায় ইসলামকে মেনে চলার দৈনন্দিন ট্রেনিং। নামাযে চোখকে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা গেলে নামাযের বাইরেও চোখকে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। অতএব নামাযে চোখ সবসময় বন্ধ রাখা ঠিক নয়। আবার এদিক ওদিক দৃষ্টি দেয়ার দুর্বলতা কারো থাকলে ব্যক্তিগতভাবে ভদ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই তিনি সংশোধন হয়ে যাবেন বলে আশা করা যায়। কারণ কেউ নিশ্চয় ইচ্ছাপূর্বক নামাযের আদবের খেলাফ কাজ করে না।

প্রশ্ন ঃ খুৎবা সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং কি কি বিষয় তাতে স্থান পাবে ? এ ব্যাপারে আমার সাথে বেশ কয়েকজন আলেমের তর্ক হয়েছে। তাদের কথা হলো খুৎবা শুধু আরবী ভাষাতে হতে হবে। তা অন্য ভাষায় জায়েজ নয়। কিন্তু আমার কথা হলো খুৎবা অর্থ যেহেতু বক্তৃতা, সুতরাং তা মুসল্লীগণের হৃদয়ঙ্গম করতে হলে অবশ্যই মাতৃভাষাতে হওয়া উচিত এবং তাতে ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়, এমনকি রাজনীতি তথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও স্থান পেতে পারে। এ সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী ? জানতে চাই।

উত্তর ঃ প্রথম কথা হলো, দ্বীন ইসলাম যেমন জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্যই আল্লাহ দিয়েছেন, ইসলাম যেমন শুধু মানুষের ধর্মীয় জীবনের জন্য নয়, জীবনের সবক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব এবং নবীর নেতৃত্ব মেনে নেয়ার জন্যই ইসলাম, তেমনি জীবনের সব ব্যাপারে ইসলাম কী বলেছে তা খুৎবাতে আলোচনা হতে পারে। তবে কী ভাষায় হবে এ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে—একথা ঠিক। আমি কিছুদিন আগে মোমেনশাহী কাতলাসেন মাদ্রাসার হেড মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ নুরুল ইসলাম সাহেবকে এখানে জুমআ'র নামায পড়াতে দিয়েছিলাম। তিনি আরবীতে খুৎবা দেয়ার সাথে সাথে বাংলায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে নামাযের পূর্বে তাঁর আলোচনা করার সময় মোমেনশাহী টাউনের জামেয়া ইসলামিয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ ফজলুল হক সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—'খুৎবা দেয়ার সময় আরবীর সাথে বাংলায় বলা সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী ?'

একজন জবাব দিলেন—'এটা অনেকে পছন্দ করে না।'

জিজ্ঞেস করলাম—'পছন্দ না করার কারণ কী ? আরবীর সাথে বাংলা অর্থ বলা কি হারাম ?

তিনি বললেন—'না, হারাম বলার উপায় নেই। তবে অনেকেই মাকরূহ বলেন।'

মাওলানা হাফেজ নূরুল ইসলাম সাহেব বললেন—'আমি দু'জন এমন লোককে আরবীর সাথে উর্দুতে খুৎবা দিতে দেখেছি—যাদের ব্যাপারে সকলেই জানে যে, তাঁরা দ্বীনের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। একজন হলেন হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রাহঃ)। তিনি একদিন ঢাকার বেগমবাজার জামে মসজিদে খুৎবা

www.amarboi.org

দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে আরবীতে বলেছেন আর বেশীর ভাগই উর্দুতে বলেছেন। আর একজন হলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা তাইয়্যেব সাহেব। আমি তাঁর পিছনে নামাজ পড়েছি। তিনি আরবী যা বলেছেন, তার চেয়ে উর্দু বেশী বলেছেন।

এছাড়া মুফতী মাওলানা দ্বীন মুহাম্মদ (রাহঃ) মৌলভী বাজার মসজিদে খুৎবা দেবার সময় উর্দু ভাষা বলতেন।

খুৎবা যদি আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় হওয়া নাজায়েজ হয় তাহলে উর্দুতেও তা নাজায়েজ হওয়া উচিত। সুতরাং উর্দুতে যদি চলে, তাহলে বাংলায় না চলার কোনো কারণ নেই।

যারা একথা বলেন যে, শুধু মাতৃভাষায়-খুৎবা হতে হবে, তারা ভুল বলেন। কারণ খুৎবা নামাযের অংশ। নামায যেমন আরবী ছাড়া হতে পারে না, খুৎবাও আরবী ছাড়া হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু ভাষা আরবী শ্রোতারা বুঝে না সেহেতু খুৎবার প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ মাতৃভাষায় হওয়া দরকার। অবশ্য এ বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। এ বিষয়ে ইমামকে বাধ্য করার চেষ্টা খুবই দূষণীয়। গ্রামাঞ্চলে বহু ইমাম আছে যারা খুৎবা বাংলায় বুঝাতে অক্ষম। তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ী অন্যায়।

খুৎবা আরবীতে অবশ্যই হতে হবে। যদি কেউ বলে—আরবীর দরকার নেই, শুধু বাংলায় হতে হবে'—একথা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে দুটি কথা। একটি হচ্ছে খুৎবা দিতে হবে কুরআন-হাদীস হতে। যিনি খুৎবা দিবেন তিনি কুরআন হাদীস থেকে সরাসরি আয়াত ও হাদীসগুলো যদি পেশ করতে না পারেন, তাহলে লিখিত আরবী খুৎবা পড়বেন। আসল কথা হলো কুরআন-হাদীসের কথাগুলো আসতে হবে। পরে ব্যাখ্যাটা বাংলায় বলা প্রয়োজন যাতে খুৎবার আসল উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে নামায পড়ার জন্য বিভিন্ন দেশের ও ভাষার লোক থাকতে পারে। সব ভাষার মধ্যে মুসলিমদের জন্য যদি একটা ভাষা বাছাই করতে হয় তাহলে সেটা কুরআন-হাদীসের ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা হতে পারে ? এজন্য আরবী ভাষা জরুরী। আরবী ভাষা বাদ দিয়ে শুধু মাতৃভাষায় খুৎবা হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ (ক) ফজরের নামাযের আগে এমন সময় ঘুম ভাঙলো যখন গোসল ফরয, কিন্তু গোসল করলে সূর্য উঠে যাবে। আবার গোসল করলে ফরয ক্বাজা হবে। এমতাবস্থায় কি শুধু কাপড় বদলিয়ে নামায পড়া যাবে ?

(খ) শরীর ভালো লাগছে না, তেমন কোনো অসুখ নেই, কিন্তু গোসল করলে অসুখ করার ভয় আছে। এমতাবস্থায় কি শুধু কাপড় বদলিয়ে নামায পড়া যাবে ?

উত্তর ঃ (ক) গোসল করলে যদি জামায়াত ধরা না যায় তবু গোসল করতে হবে। নামাযের সময় চলে যাবে এবং নামায ক্বাজা হয়ে যাবে এ আশংকা থাকলেও প্রথমে ফরজ গোসল সেরে নিতে হবে। গোসল না করে নামায পড়া যাবে না। নামাযের

www.amarboi.org

সময় পার হয়ে গেলে ক্বাজা পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন—"পবিত্রতা ছাড়া নামায গ্রহণযোগ্য হয় না।'

(খ) না, শুধু সন্দেহের কারণে এমন করা ঠিক হবে না। অসুখ হলে আলাদা কথা। অসুখ নেই অথচ গোসল করলে অসুখ হবে এ সন্দেহের উপর নাপাক অবস্থায় গোসল বাদ দেয়া যাবে না। প্রবীণ মুসলিম চিকিৎসক যদি বলেন, গোসল করলে রোগ বেড়ে যাবে—কেবল তখনই তাইয়াম্মুম করে নামায পড়া যায়।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাকে বায়েন দেয় আবার সে স্ত্রীকে স্ত্রীরূপে বরণ করে, তার সাথে কিরূপ আচার ব্যবহার করা উচিত ? তার পিছনে নামায পড়া কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ যদি সাক্ষী সুবাদে প্রমাণিত হয়, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক বায়েন দিয়ে অতপর শরীয়তসম্মত পন্থায় তাকে রুজু না করে তার সাথে স্ত্রীসুলভ আচরণ করছে, তাহলে তার ইমামতি করার পজিশন থাকে কী করে ? মোক্তাদীরা তাকে এ ব্যাপারে পাকড়াও করার কথা। কিন্তু যদি তিনি তিন তালাক দেবার কথা অস্বীকার করেন এবং সাক্ষী-প্রমাণ যদি তিন তালাকের পক্ষে না পাওয়া যায় তাহলে তিন তালাক দিয়েছে বলে মনে করার ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা জায়েজ নয়। শুধু এ অজুহাতে তার পেছনে নামায না পড়ার কোনো যুক্তি নেই।

প্রশ্ন ঃ জুমআ'র নামাযের খুৎবার সময় অনেক মুসল্লী ঘুমিয়ে পড়েন, কেউ কেউ ঝিমান। খুৎবা শেষে এ অবস্থা থেকে উঠে নামাযে দাঁড়ান। এতে নামায শুদ্ধ হবে কি ? ঐ ভাবে ঝিমালে কি অযু থাকে ? এই ঝিমিয়ে পড়া ঘুমন্ত মুসল্লীদেরকে জাগিয়ে তুলতে হলে ইমাম সাহেবরা কী ভূমিকা রাখতে পারেন ? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ হেলান দিয়ে না ঘুমালে অযু নষ্ট হয় না বলে মনে করা যায়। কিন্তু যদি হেলান দিয়ে ঘুমান তাহলে পুনরায় অযু না করে নামায পড়া যাবে না। এ রকম ঘুম কারো আসলে আশেপাশের মুসল্লী ভাইয়েরা ঐ ভাইকে সাহায্য করা উচিত, আর ইমাম সাহেবদেরও যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে মুসল্লীরা খুৎবা শোনা থেকে বঞ্চিত না থাকে। কারণ খুৎবা শোনা ওয়াজিব। খুৎবার কথাগুলো না বুঝার কারণেও ঘুম পেতে পারে। তবে সাবধান থাকা উচিত যাতে ঘুমের দরুন অযু নষ্ট হয়ে না যায়। তাই মসজিদে কোনো কিছুর সাথে ঠেস দিয়ে বসা এদিক দিয়ে নিরাপদ নয়।

প্রশ্ন ঃ (ক) গোসল করার পর কি অযু করতে হবে ? (খ) গোসল করার পর যদি অযু করি তখন উক্ত অযুর পানির ছিটে যদি শরীরে লেগে যায় তাতে কি অযু নষ্ট হয় ?

উত্তর ঃ গোসল করার যে নিয়ম রাসূল (সাঃ) দিয়েছেন সে নিয়ম পালন করলে গোসলের পর অযু নষ্টের প্রশ্নই ওঠে না। গোসলের নিয়ম প্রথমে অযু করা পা অযুর সময় না ধুলেও চলে। কারণ গোসলের সাথে পা ধোয়া হয়ে যায়। আর যদি কাঁচা জায়গায় গোসল করা হয় তাহলে পরে পা ধুতেই হয়। অযুর জন্য যেহেতু নিয়ত শর্ত নয়,

www.amarboi.org

তাই কেউ গোসল করলে শরীরের অযুর জায়গা ধোয়া হয়ে যায়। ফলে অযু না করলেও অভ্যাস করা একান্ত উচিত।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে সূর্য উদিত হয় মাত্র কিছু সময়ের জন্য। সেই এলাকার লোকজনের উপর কি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হবে ? পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যে পাঁচটি ওয়াক্ত প্রয়োজন তা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ওয়াক্ত, তা পাওয়া যাচ্ছে না। ওয়াজিব হয় কিভাবে এবং কিভাবে ওয়াক্ত নির্ধারণ করা যাবে ?

উত্তর ঃ এক সময়ে এ প্রশ্নটি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে করা হতো। সে উদ্দেশ্যটি মহৎ কিনা জানি না। কিন্তু কিছুসংখ্যক মানুষের মনে এটি একটি প্রশ্ন হিসেবেই রয়েছে।

আইন-কানুনের ব্যাপারে এটাই সাধারণ নিয়ম যে, সর্বসাধারণের অবস্থাকে সামনে রেখেই আইন রচনা করা হয়। কিছু সংখ্যক লোকের অবস্থা যদি ভিন্ন হয় তাহলে সকলের জন্য রচিত আইনের সঙ্গে খাপ খাইয়েই তাদের বেলায় ঐ আইনকে প্রয়োগ করা হয়।

আল্লাহ তায়ালা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সূর্যের উদয়, অস্ত ও অবস্থানের ভিত্তিতে সময়কে বিভক্ত করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে ফরয করেছেন। এটাই হলো সাধারণ আইন এবং মুসলমানদের জন্য বিধান। দুনিয়ার সব জায়গায় সূর্যের স্থায়িত্ব একরকম নয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে সূর্য যখন ১৪ ঘন্টারও বেশী অবস্থান করে তখন রাত মাত্র ১০ ঘন্টা হয়। আবার শীতে যখন রাত ১৪ ঘন্টারও বেশী হয় তখন সূর্য মাত্র ১০ ঘন্টা অবস্থান করে। এভাবে সূর্যের অবস্থান ১৪ থেকে ১০ অর্থাৎ ৪ ঘন্টা বেশ-কম হয়। ইংল্যাণ্ডে সূর্যের অবস্থান ৬ থেকে ১৮ ঘন্টা হয়ে থাকে। এভাবে কোনো দেশে ১ ঘন্টা ও ২৩ ঘন্টা হয়ে থাকে। কিছু এলাকায় তার চেয়েও বেশ-কম হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা সূর্যের হিসেবেই নামায-রোযা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দেশে ১৫ ঘন্টার বেশী কখনো রোযা রাখতে হয় না। কিন্তু স্কটল্যান্ডে ১৯ ঘন্টাও রোযা রাখতে হয়। আবার ছোট দিনে তারা মাত্র ৫ ঘন্টা রোযা রাখে। সেই হিসেবে কোনো দেশে সাড়ে ২৩ ঘন্টাও রোযা রাখতে হতে পারে আবার আধা ঘন্টাও রোযা রাখতে হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। প্রত্যেক দেশেই সূর্যের উদয়, অবস্থান ও অস্তকে ভিত্তি করে সে দেশের ওলামায়ে কেরাম নামাযের সময় নির্ধারণ করে থাকেন। যে দেশে সূর্য সামান্য কিছু সময়ের জন্য দেখা দেয় সেখানকার আলেমগণ তাদের জন্য সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদের নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারণ করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই উদ্দেশ্য সূর্যের অবস্থান আসল উদ্দেশ্য নয়। দিন-রাতের মধ্যে পাঁচবার আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিয়ে আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্য করার অভ্যাস করার যে মহান উদ্দেশ্য নামাযে

www.amarboi.org

রয়েছে তা পূরণ করতেই হবে। সূর্যের অবস্থানের অজুহাতে নামাযের সংখ্যা কমানো চলবে না।

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে—'নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কর্ম থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে।' সত্যিই যদি তা হয় তাহলে নামাযী ব্যক্তি পাপ কাজ করে কেন?

উত্তর ঃ নামায অশ্লীল ও অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাখে বলে আল্লাহ যে দাবী করেছেন তা যেসব নামাযীর জীবন সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে না তাদের নামাযই প্রকৃতপক্ষে ত্রুটিপূর্ণ। আল্লাহর দাবী ভুল হতে পারে না। সংখ্যায় কম হলেও এমন নামাযীও সমাজে আছে যাদের জীবনে আল্লাহর ঐ দাবী সত্য বলে প্রমাণিত।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, নামায একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে আদায় করা হয়। এ নামাযের আসল উদ্দেশ্য কম লোকই জানে। ছোট সময় যখন নামায শিখানো হয় তখন সহজভাবে নামাযের উদ্দেশ্য যদি বুঝিয়ে দেয়া হয় তাহলে নামায একটা নিছক অনুষ্ঠানে পরিণত হবে না। সূরা ত্বাহার ১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আমাকে স্মরণ রাখার জন্য নামায কায়েম করো।'

আল্লাহ তায়ালা ২৪ ঘন্টার মধ্যে পাঁচটি সময়ে নামায আদায় করার মাধ্যমে বান্দাহকে বারবার একথাই স্মরণ করার ব্যবস্থা করেছেন—'নামাযী ব্যক্তি যেন একথা ভুলে না যায় যে, সে আল্লাহর গোলাম।'

চব্বিশ ঘন্টার রুটীন ফজরের নামায দিয়ে শুরু করা এবং এশার নামায দিয়ে সমাপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, নামাযী তার দুনিয়ার দায়িত্ব শুরু করার পূর্বে প্রতিদিন সকালে আল্লাহর ঘরে হাজির হয়ে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর গোলাম হিসেবে তার চেতনাকে জাগ্রত করবে। নামায শেষে দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করার বেলায় এই চেতনাকে সদা জাগ্রত রাখার জন্যই আরও চারবার দুনিয়ার ঝামেলার ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহর ঘরে হাজির হয়ে ঐ চেতনাকে মজবুত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা জুমআ'র ১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—'যখন নামায শেষ হয় তখন হালাল রুজি তালাশ করার জন্য বেরিয়ে যাও এবং বেশী বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ রাখো।'

এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধু নামাযের সময়ই আল্লাহকে স্মরণ করা যথেষ্ট নয়। দু'নামাযের মাঝের সময়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি, বরং আরও বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ রাখতে বলা হয়েছে। আল্লাহ একথা বলেননি যে—'আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম করো এবং এরপর আরেক নামাযের সময় আসা পর্যন্ত আমার কথা ভুলে গিয়ে যেমনি খুশি তেমনি দুনিয়ার দায়িত্বে লেগে থাকতে পারো।' বরং আল্লাহর নির্দেশ এটাই-'নামাযের মধ্যে যেভাবে আমাকে হাজির জেনে দেহ-মন সম্পূর্ণ আমার নিকট সমর্পণ করে থাকো তেমনিভাবে সবসময় আমার গোলামীর এ চেতনা নিয়ে দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করো।'

www.amarboi.org

কালেমা তাইয়্যেবার মাধ্যমে এ শপথই গ্রহণ করা হয় যে, আমি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো চলবো এবং এর বিপরীত কারো হুকুম ও তরীকা মানবো না। এ শপথের বলিষ্ঠ ট্রেনিং হলো নামায। নামাযের এ ট্রেনিংকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করলে নামায একটা অর্থহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

নামাযে তাকবীর তাহরীমা থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত দেহের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ এবং মন-মস্তিষ্ককে এ ট্রেনিংই দেয়া হয় যে, নামাযের মধ্যে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী সব কাজ করতে হবে। মনগড়া কোনো কাজ করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। তেমনি নামাযের বাইরেও প্রতিটি চিন্তা ও কর্ম আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো হতে হবে। যে ব্যক্তি এভাবে নামাযের শিক্ষাকে নামাযের বাইরের জীবনে চালু করে সেই প্রকৃতপক্ষে নামায কায়েম করে। এভাবে নামাযকে কায়েম করার চেষ্টা না করলে এবং শুধু নামাযের সময় নামায আদায় করা হলে নামাযের উদ্দেশ্য কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। নামায কায়েমের এ ধারণা যাদের নেই তারা নামায শুধু 'পড়ে' 'কায়েম' করে না।

নামায সম্পর্কে উক্ত ধারণা না থাকার ফলেই নামাযীদের জীবনে আল্লাহর ঐ দাবী পূরণ হয় না।

প্রশ্ন ঃ পরাধীন দেশের নাগরিক ও অনৈসলামিক আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভিতর পার্থক্য কী ? যদি ব্যবস্থা থাকে, তবে কারাগারে জুমআ'র নামায পড়া যাবে কিনা ?

উত্তর ঃ জুমআ'র নামায ফরয হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন হওয়াও একটি শর্ত। জুমআ'র নামায ফরয হওয়ার জন্য দেশ স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়। জুমআ'র নামাযের সুব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলার কোনো সমস্যা না থাকলে জুমআ'র নামায পড়া কর্তব্য। এ বিষয়ে বৃটিশ আমলে কিছুসংখ্যক আলেম দ্বিমত পোষণ করলেও গোটা উপমহাদেশের নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কিরাম ইংরেজ শাসনের অধীনেও জুমআ'র নামাযের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

কিন্তু জেলখানার ব্যাপার ভিন্ন। জেলখানায় কোনো প্রকার ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। এ ব্যবস্থায় কারাগারে বন্দীদের উপরে জুমআ'র নামায ফরয নয়। কিন্তু যদি জেল কর্তৃপক্ষ জুমআ'র নামাযের ব্যবস্থা করেন এবং কোনো স্বাধীন ব্যক্তি জুমআ'র ইমামতি করেন তাহলে জুমআ পড়া উচিত। কারণ ইসলাম জামায়াতে নামাযের উপরে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, জামায়াতের ব্যবস্থা থাকলে জামায়াত থেকে আলাদা নামায পড়া কিছুতেই উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ জামায়াতে নামায পড়ার জন্য তো হাদীসে কঠোর নির্দেশ এসেছে। কিন্তু যদি কেউ শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া ইচ্ছা করেই সমস্ত নামায বাড়ীতে পড়ে, তবে তার নামায গৃহীত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী ?

উত্তর ঃ নামায এমন একটি ইবাদাত যা একদিকে আল্লাহর সঙ্গে বান্দাহর সম্পর্ক বৃদ্ধি করে, অপর দিকে আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ট করে।

www.amarboi.org

তাই কুরআন ও হাদীসে জামায়াতে নামাযের উপর এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে জামায়াতকে অবহেলা করে বাড়ীতে নামায আদায় করে সে নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই অজ্ঞ। সে শুধু দায়সারা গোছের কাজ করে আল্লাহর হুকুম পালন করছে বলে মনে করতে হবে। এ জাতীয় নামায আল্লাহ্ কবুল করবেন কিনা বা নামায না পড়ার দোষ থেকে তাকে রেহাই দেবেন কিনা সে ফয়সালা আল্লাহ্ নিজেই করবেন। এ সম্পর্কে কিছু বলার সাধ্য কারো নেই।

জামায়াতে না যাওয়ার শরয়ী ওজর সম্বন্ধে এটুকুই বলা যেতে পারে যে, একজন সত্যিকার নামাযী আল্লাহর নিকট জামায়াতে নামায আদায় না করার কৈফিয়ত দেবার যোগ্য যদি নিজেকে মনে করে তবেই তার পক্ষে বাড়ীতে নামায পড়া সম্ভব। নামায আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আদায় করা হয়। সুতরাং সে সন্তুষ্টি পাওয়ার আগ্রহ ছাড়া যারা নামায পড়ে তাদের সময় ও শ্রম অর্থহীন কিনা তার বিবেককেই তা জিজ্ঞেস করা দরকার।

প্রশ্ন ঃ জুমআ'র দিন ইমাম সাহেব নামাযের আগে খুৎবা দেন। খুৎবার পরে সুন্নাত নামাযের সময় দেন। তখন আমি যদি তসবিহ জপ করি তবে কোনটায় বেশী সওয়াবের ভাগী হবো। আমার এক দীল, কোন্ দিকে মনযোগ দিবো ? খুৎবা শুনা ও তসবিহ্ জপ করার মধ্যে কোন্ কাজটা এ সময় উত্তম ?

উত্তর ঃ জুমআ'র নামাযের খুৎবা শুনা মুসল্লীর জন্য ওয়াজিব। এ খুৎবার গুরুত্বের বিবেচনায় খুৎবা চলাকালে আর কোনো সুন্নাত বা নফল আদায় করলে ওয়াজিবকে অবহেলা করার গুনাহ হবে।

শুক্রবার যোহর নামাযের বদলেই জুমআ'র নামায আদায় করার বিধান দেয়া হয়েছে। যোহরের নামাযে চার রাকাত ফরয, অথচ জুমআ'র নামাযের ফরয দুই রাকাত মাত্র। এ ধারণা অযৌক্তিক না-ও হতে পারে যে, দু'রাকাত ফরয নামাযের বদলেই খুৎবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় ঈদ এবং জুমআ'র নামায হয় কিনা ? এখানে প্রধান গেইট খোলা রেখে ঈদের দুই রাকাত নামাযের জামায়াত করার সুযোগটুকু দেয়া হলেও জুমআ'র নামায পড়ার ব্যবস্থা নেই। এ ব্যাপারে শরয়ী দিক থেকে কতটুকু সুযোগ বা আপত্তি আছে, জানতে চাই।

উত্তর ঃ জুমআ'র নামাযের জন্য স্বাধীন হওয়া একটি শর্ত। কারাগারে আবদ্ধ লোকদের সামান্য স্বাধীনতাও নেই। জাহেলী যুগের কৃতদাসদের চেয়েও তাদের অবস্থা নিকৃষ্ট। এ অবস্থায় তাদের উপর জুমআ'র নামায ফরয নয়। তবে যদি কোনো কারাগারে জুমআ'র নামাযের ব্যবস্থা থাকে তাহলে পড়াই উচিত। কেননা এই উপলক্ষে খুৎবার মাধ্যমে দ্বীনের কিছু শিক্ষা লাভের এবং অনেক লোকের একসাথে আল্লাহর নিকট দোয়া করার সুযোগ হয়।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ মে ১৯৮৯ সংখ্যা মাসিক পৃথিবীর ৩নং প্রশ্নের জবাবে জুমআ'র দিন ইমাম সাহেবরা নামাযের আগে যে খুৎবা দেন ঐ সময় নামায বা তসবিহ না পড়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে আপনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ৫২০ নং হাদীসে জাবির (রাঃ) উল্লেখ করেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার খুৎবা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়েন। নবী করীম (সাঃ) উক্ত ব্যক্তিকে ২ রাকাত নামায পড়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন।'

আপনার কথাই যদি মেনে নেই, তবে তা বুখারী শরীফের এ হাদীসকে অস্বীকার করার শামিল নয় কি ? আপনার মতামত জানাবেন।

উত্তর ঃ জুমআ'র নামায যোহরের নামাযের পরিবর্তে পড়া হয়। যোহরের নামাযের ফরয ৪ রাকায়াত। কিন্তু জুমআ'র ফরয ২ রাকাত মাত্র। এর থেকেই এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, খুৎবা জুমআ'র ২ রাকাত নামাযের স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়াও ফকীহগণের মতে জুমআ'র খুৎবা শুনা ওয়াজিব। খুৎবায় কুরআন ও হাদীস থেকে বক্তব্য রাখা হয় বলে নফল নামাযের চেয়ে খুৎবার গুরুত্ব বেশী। বহু সংখ্যক হাদীস থেকেও খুৎবার এ গুরুত্ব স্পষ্টভাবে জানা যায়

আপনি যে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন সে হাদীসের সাথে উপরোক্ত বক্তব্যের অমিল দেখা যায়। এর ব্যাখ্যা মুহাদ্দিসগণ দিয়েছেন। তবে আমরা এটুকুই বলতে পারি যে, মাসয়ালা গ্রহণের সময় একটি হাদীসকেই ভিত্তি করে বানানো ঠিক নয়। কোনো বিষয়ে যত হাদীস পাওয়া যায় সেসবকে সমন্বয় করেই ফকীহগণ মাসয়ালা দিয়ে থাকেন। তাই মাসয়ালা গ্রহণ করার ব্যাপারে সব হাদীসকে সামনে না রেখে কোনো কোনো হাদীসকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নিরাপদ নয়।

আপনার উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে একথা মনে করাই সবচেয়ে নিরাপদ যে ঐ লোকটিকে রাসূল (সাঃ) নামায পড়ার কেন আদেশ দিয়েছিলেন তা আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। আরো একটি হাদীস আছে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন—'তোমাদের কেউ মসজিদে ঢুকলে বসার আগেই যেন দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়। কোনো কোনো মাজহাবে এ দু'রাকাত নামাযকে 'তাহিয়াতুল মসজিদ' হিসেবে ওয়াজিব মনে করা হয়। হতে পারে যে, এ দু'রাকাত নামায পড়ার জন্যই রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ দ্বারা খুৎবার গুরুত্ব কম মনে করা যায় না। এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান আল্লাহ-ই রাখেন।

প্রশ্ন ঃ নামাযের জামায়াতে দণ্ডায়মান অবস্থায় ইমাম কিংবা অন্য কোনো মোক্তাদির অযু চলে গেল, অথচ তার পেছনে আরো মোক্তাদি নামায পড়ছে। এমতাবস্থায় তাকে জামায়াত হতে বের হতে হলে পেছনের মোক্তাদির সামনে দিয়ে তাদেরকে ঠেলে বের হতে হবে। কিন্তু তাদেরকে ঠেলে বের হতে হলে তো তাদের নামাযের অসুবিধা হবে। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির কী করণীয় ?

উত্তর ঃ এ অবস্থায় মোক্তাদির উচিত নামাযের কাতার থেকে বের হয়ে অজু করে আবার জামায়াতে শরীক হওয়া। এখানে প্রশ্ন হলো, মোক্তাদি কিভাবে বের হবে ? এর জন্য শরীয়তে যে সুশৃঙ্খল নিয়ম রয়েছে তা মুসল্লীদের জানা থাকলে কোনো

www.amarboi.org

সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায় না বলে এ মাসয়ালা মুসল্লীদের না জানাই স্বাভাবিক এবং না জানার কারণেই কাতার ভেঙ্গে কেউ বের হয়ে গেলে লোকেরা অসুবিধা বোধ করতে পারে। এ অবস্থায় কাতার থেকে বের হওয়ার নিয়ম নিম্নরূপ ঃ

মুসল্লী দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কাতার থেকে বের হবেন, বসা অবস্থায় নয়। মুসল্লীর বরাবর ঠিক পেছনে যিনি আছে তাকে ইশারা করে সামনের কাতারে তার জায়গায় দাঁড় করাবেন। এভাবে যে কয়টি কাতার পেছনে রয়েছে সব ক'টি কাতার একই নিয়মে পার হয়ে যেতে হবে। সামনের যে জায়গাটা খালি হলো পেছন থেকে সে স্থান পুরণ করিয়ে করিয়ে তাকে বের হতে হবে।

যদি ইমামের অজু চলে যায়, তাহলে ইমামের পেছনে যিনি আছেন তাঁকে ইমামতি করার উদ্দেশ্যে ইমামের স্থানে দাঁড়াবার জন্য ইশারা করবেন এবং তিনিও একই নিয়মে কাতারগুলি পার হবেন।

এ কারণে ইমামের পেছনে এমন লোক থাকা উচিত যিনি ইমামতি করার যোগ্য।

প্রশ্ন ঃ (ক) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জানাযার জামায়াত ও ইমামতি হয়েছিল কী ?

(খ) মাসুম হলেই যদি জানাযার দরকার না হয়, তবে নাবালেগ শিশুরা যেহেতু মাসুম, সুতরাং মৃত মাসুম বাচ্চাদের জানাযা পড়ার বর্তমানে যে প্রচলন আছে তা না পড়লে চলবে কিনা ? বিভ্রান্তির অপনোদনের জন্য সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চাই।

উত্তর ঃ (ক) রাসূল (সাঃ)-এর নামাযের জানাযা সম্পর্কে 'বেদায়া ওয়ান নেহায়া' নামক নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র দেহ যে ঘরে রাখা হয়েছে সেখানে প্রথমে পুরুষগণ দলে দলে প্রবেশ করেছেন, তাদের পরে মহিলারা, তারপর কিশোর এবং শেষে দাসগণ একইভাবে প্রবেশ করেছেন। সেখানে প্রবেশ করে তারা কী করেছেন সে সম্পর্কে উক্ত কিতাবে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো—'সাল্লু আলাইহে বিগায়রে ইমামিন।'

'সাল্লু আলাইহে'-এর অর্থ দরূদ, মাগফিরাত কামনা, নামাযে জানাযা ইত্যাদি হয়ে থাকে। তবে মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শব্দটি সাধারণতঃ নামাযে জানাযার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, লোকেরা দলে দেল এসে ইমাম ছাড়াই পৃথক পৃথকভাবে রাসূলের নামাযের জানাযা পড়ে চলে যান। এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (সাঃ)-এর নামাযে জানাযা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইমামের নেতৃত্বে জামায়াতের সাথে যেভাবে জানাযা পড়ার নিয়ম চালু আছে সে নিয়মে রাসূল (সাঃ)-এর নামাযে জানাযা হয়নি। জানাযায় তারা শুধু দরুদ পড়েছেন, না আরো কিছু পড়েছেন তা জানা যায় না।

এ ছাড়াও আল্লামা শিবলী নোমানী রচিত সীরাতুন্নবী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যে ঘরে রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন সেখানে লোকেরা অল্প অল্প করে একের পর এক যাচ্ছিল এবং জানাযার নামায আদায় করছিল। কিন্তু তাতে কোনো ইমাম ছিল না। রাসূল (সাঃ)-এর নামাযে জানাযা সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী কিছু পাওয়া যায় না।

www.amarboi.org

(খ) শিশুদের জানাযার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাই তাদের জানাযার দোয়াও আলাদা । ঐ দোয়ায় গুনাহ মাফের কোনো কথা নেই। সেখানে যে দোয়া পড়া হয় তাতে শিশুদেরকে 'শাফায়াতকারী' এবং 'নেক বদলা পাওয়ার মাধ্যম' বানাবার জন্য আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করা হয়। শিশুদের উসিলায় যেন আখিরাতে কল্যাণ লাভ করা যায় সে দোয়াই এ জানাযার উদ্দেশ্য।

সিয়াম

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের লোকেরা দিন আনে দিন খায়। যেমন, অনেকে ঠেলাগাড়ি চালায়, আবার অনেকে রিক্সা চালায়। কারো কারো আবার ২৪ ঘন্টা কাজ করতে হয়, নচেৎ তার ভাগ্যে দু'বেলা ভাত জোটে না। এ সমস্ত লোকেরা দেখা যায় বেশী পরিশ্রমের কারণে রমযানের ফরয রোযা রাখতে পারে না। কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তাদের ফায়সালা কী হবে, জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর ঃ আমার ধারণা, যারা সচ্ছল তাদের মধ্যেই রোযাদার কম আর যারা গরীব তাদের মধ্যেই রোযাদারের সংখ্যা বেশী। প্রকৃতপক্ষে যারা রোযা রাখে তারা ঈমানের তাগিদেই রাখে। যাদের ঈমান কমজোর তারাই রোযা না রাখার জন্য নানা রকম বাহানা খুঁজে বেড়ায়। ঠেলাগাড়ী ও রিক্সাচালক, ক্ষেতমজুর, কারখানার শ্রমিক ও কুলি-মজুরদের মধ্যে যারা যারা রোযা রাখেন তারা এটাকে একটা দ্বীনি কর্তব্য মনে করেন বলেই রাখতে সক্ষম হন। তারা যদি রোযা রাখার হিম্মত করতে পারেন তাহলে তাদের সমপেশার অন্য লোকদের পক্ষে রোযা রাখা অসম্ভব হতে পারে না।

একথা ঠিক যে, দিন যখন বড় থাকে এবং কঠিন গরম পড়ে তখন এ জাতীয় পেশার লোকদের পক্ষে রোযা রাখা খুবই কষ্টকর। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) মালিকদেরকে শ্রমিকদের জন্য রমযানে পরিশ্রম কমিয়ে দেবার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু যারা নিজেরা স্বাধীনভাবে শ্রমজীবি হিসেবে রুজি-রোজগার করেন তারা যতটুকু সাধ্য রমযানে ততটুকু পরিশ্রম করে চলার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু যদি কারো বেঁচে থাকার প্রয়োজনে কোনোদিন সারাক্ষণ পরিশ্রম করতে হয় এবং তার পক্ষে রোযা রাখা কিছুতেই সম্ভব না হয় তাহলে তার নিজের দায়িত্বে ঐ দিনের রোযা ক্বাজা করতে পারে এবং এ অবস্থায় অন্য সময় তাকে এ ক্বাজা আদায় করতে হবে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেরই নিজ দায়িত্বেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। শ্রমজীবিদের জন্য শরীয়তের এমন কোনো বিধান নেই যে, তাদের রোযা না রাখলেও চলতে পারে।

www.amarboi.org

যাকাত

প্রশ্ন ঃ আমাদের আর্থিক দুরাবস্থার প্রেক্ষিতে শুধু যাকাত দেয়ার পর অবশিষ্ট ধন সঞ্চয় করা কি বৈধ ? হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময় আবু জার গিফারী (রাঃ) বলেছেন—'ধন সঞ্চয়ের জন্য নয়, বরং তা জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে।' এটা কি সহীহ হাদীস, নাকি মুআবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে যে বর্ণনা হয়েছে—'যাকাত দেয়ার পর অবশিষ্ট মাল সঞ্চয় করা যায়'—এটা সহীহ হাদীস ?

উত্তর ঃ যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক মু'মিনদের মধ্যে মূলতঃ দুটো মনোভাব সৃষ্টি করতে চান ঃ (ক) যাকাতদাতার অর্জিত ধন-সম্পদের আসল মালিকানা যে আল্লাহর সে বিষয়ে তাকে সচেতন হয়ে এ মাল থেকে আল্লাহর নির্দেশে কমপক্ষে ৪০ ভাগের ১ ভাগ এমনসব কাজে খরচ করতে হবে যা দাতার পক্ষে দুনিয়ার কোনো উপকারে আসবে না। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে শতকরা আড়াই ভাগ মাল খরচ করবে। এর দ্বারা সে স্বীকার করে নিলো যে, মাল আল্লাহর এবং তাঁরই নির্দেশে সে তা খরচ করছে।

(খ) একথার স্বীকৃতি তো যাকাতের মাধ্যমে হয়ে গেল যে, যাকাতদাতা আল্লাহর দাস বলেই তার অর্জিত মালের যাকাত মনিবের হুকুমে সে নির্দিষ্ট খাতে খরচ করলো। সুতরাং সে আল্লাহর দাস হিসেবে তার সমস্ত মালই মনিবের নির্দেশ মোতাবেক খরচ করবে। কারণ যাকাতই মনিবের একমাত্র হুকুম নয়। আল্লাহর সব হুকুমই পালন করতে হবে যদি তাঁর দাস হিসেবে আখেরাতে মনিবের সামনে হাজির হওয়ার কথা খেয়াল থাকে।

এ অবস্থায় যাকাতটুকু আদায় করে বাকী মাল যেভাবে খুশী ব্যবহার করা বৈধ হতে পারে না। ধন সঞ্চয় করার অর্থ কী ? যাকাত ব্যবস্থাটাই এমন যে, টাকা-পয়সা বেগার জমা করে রাখলে যাকাত দিতে দিতেই তা শেষ হয়ে যাবে। তাই ধন-সম্পদ অকেজো জমা করে রাখার পথই বন্ধ। মাল ব্যবসায় বা শিল্পে লাগালে অনেক মানুষের উপকার হয়। মাল যদি সবই খরচ করে ফেলা হয় তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ধন-সম্পদ ব্যবসায়ে নিয়োজিত করতে বলেছেন। এবং এমনভাবে ফেলে রাখতে নিষেধ করেছেন যে, যাকাত দিতে দিতে তা শেষ হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

তাই মাল সঞ্চয় করে বেগার রাখা বা ব্যাংকে সুদের জন্য জমা রাখা দূষণীয় হলেও ব্যবসায় ও শিল্পে মাল নিয়োগ করা নিন্দনীয় নয়।

একথার আলোকেই ঐ দু'জন সাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দুটোকে বুঝতে হবে। এ দুটোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। একজন বলছেন, ধন অকেজো ফেলে না রেখে জনহিতকর কাজে খরচ করতে হবে। আরেকজন বলেছেন, মালের যাকাত দিলে বাকী মালে যাকাতদাতার মালিকানা থাকা দূষণীয় নয়।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ টাকা পাওনা আছে এমন ব্যক্তির যাকাত-ফেৎরা কেটে নেয়া যায় কিনা ?

উত্তর ঃ না। প্রশ্নের অর্থ যদি এই হয় যে, আপনি একজনের কাছে পাওনা আছেন। সে গরীব লোক তাকে যাকাতের নিয়তে টাকা দেননি, আপনি তাকে ধার দিয়েছেন। সে ফেরত দিচ্ছে না বা দিতে পারছে না। সেজন্য এটাকে যাকাত ধরে পরে নিজের দেয় যাকাত থেকে টাকাটা নিজেই নিয়ে নিলেন। এটা যাকাত আদায় হলো না। আপনি যদি প্রথমে যাকাত হিসেবে দিতেন তাহলে হতো। এটা জায়েজ আছে যে, আপনি এখনও হয়তো যাকাতের হিসেব করেননি, অগ্রিম দিয়েছিলেন যাকাতের নিয়ত করে। তাই আগে যাকাতের নিয়তে দান করে পরে যাকাতের হিসেবের সময় সে টাকা কেটে রেখে দেয়া যায়। কিন্তু দিলেন 'ধার' হিসেবে পরে আদায় হচ্ছে না দেখে একে 'যাকাত' বানিয়ে দিলেন—এটা ঠিক হবে না। এতে যাকাত আদায় হবে না।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে যে 'যাকাত' তহবিল' গঠন করা হয়েছে তাতে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে কি ?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আমি নীতিগত দিক থেকেই কথা বলতে চাই। কুরআনে কারীমে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক সম্পর্কে বলা হয়েছে—'তাদেরকে যখন জমিনে ক্ষমতা দেয়া হয় তখন তারা ঃ ১। সালাত কায়েম করে, ২। যাকাত ব্যবস্থা চালু করে, ৩। আল্লাহর পসন্দনীয় কাজের হুকুম দেয় ও অপসন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে।'

যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তারা আল্লাহর কথামতো কাজ করতে চাইলে প্রথমত ঃ নামায কায়েমের চেষ্টা করতে হবে। যারা নামায কায়েমের চেষ্টা করবে না তাদের হাতে যাকাত তুলে দিতে লোকেরা দ্বিধা করবে। কারণ তাদের হাতে যাকাত আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক ব্যবহৃত হবে কিনা এ বিষয়ে যাকাত দাতাদের একীন না হওয়াই স্বাভাবিক। তবু সরকার প্রবর্তিত 'যাকাত তহবিল' এ যাকাতের অর্থ জমা দিলে ফরয আদায় হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী বিধানে কি 'বেকার ভাতা' বা অন্য কোনো ফাণ্ড আছে ? থাকলে তা কিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব ?

উত্তর ঃ ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তারই অপর নাম। কুরআন মজীদে যাকাতের জন্য যেসব খাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা যে যাবতীয় বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সে কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। দরিদ্র বেকারদের দুঃখ লাঘবের জন্য যাকাত বা অন্যান্য সরকারী আয় থেকে এ ধরনের ফাণ্ড গঠন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ সোনা-চান্দির যাকাত দেয়ার কথা কিভাবে আছে ? কিন্তু প্রচলিত টাকার কথা যেহেতু নেই, তাই নগদ কত টাকা জমা থাকলে যাকাত দিতে হবে ?

উত্তর ঃ হাদীসে যাকাতের ব্যাপারে যে সোনা-রূপার উল্লেখ রয়েছে সেটা যাকাতের নিসাব ঠিক করার মানদণ্ড হিসেবে গণ্য। টাকা-পয়সার মূল্যমান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। কিন্তু সারা দুনিয়ায় মুদ্রার মূল্যমান ঠিক করার জন্য সোনাকেই মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সে হিসেবে যাকাত দিতে হলে কি পরিমাণ নগদ

www.amarboi.org

টাকা-পয়সা বা ব্যবসা-সামগ্রী থাকলে যাকাত দিতে হবে তার মান ঠিক করার জন্য সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা মানদণ্ড হিসেবে দেয়া হয়েছে। এটাকে বলা হয় 'যাকাতের নিসাব'। অর্থাৎ কোনো দেশে এ পরিমাণ সোনা বা এ পরিমাণ রূপার দাম ঐ দেশের মুদ্রায় যা হয় সে পরিমাণ টাকা এক বৎসর হাতে থাকলেই যাকাত দিতে হবে।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যে পার্থক্য হলে যেটার মূল্য কম সেটাকেই 'মানদণ্ড' ধরে 'নিসাব' ঠিক করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সাধারণতঃ ব্যবসায়ী আয়-ব্যয়ের হিসেব সৌরবর্ষে করে থাকে, কিন্তু যাকাত দিতে হয় চান্দ্রবর্ষ হিসেবে। সৌরবর্ষ হিসেবে যাকাত দেয়া কি বৈধ হবে?

উত্তর ঃ ইসলামের যাবতীয় ইবাদত চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী হয়। তাই যাকাতের হিসেব চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ীই রাখতে হবে।

হজ্ব

প্রশ্ন ঃ দেশের অভাবী মানুষকে দান করে ও প্রতিবেশী দরিদ্রকে সাহায্য না করে হাজার হাজার টাকা খরচ করে হজ্বে যাওয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারকে যতগুলো মৌলিক দায়িত্ব দিয়েছেন তন্মধ্যে 'ফরয হজ্ব' একটি। অভাবী মানুষকে দান করাও আল্লাহর হুকুম। 'হজ্ব' আল্লাহর হুকুম। হাজার হাজার নয়, আজকাল বরং অর্ধলক্ষাধিক টাকা খরচ হয়। আর্থিক ও শারীরিক দিক থেকে সক্ষম ব্যক্তির জন্য যেহেতু হজ্ব ফরয, সেহেতু গরীবদের জন্য হজ্বের টাকা খরচ করলেও হজ্ব না করার জবাবদিহি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তবে নিজের টাকায় বারবার নফল হজ্ব করার চেয়ে গরীবদের সাহায্য করা বেশী জরুরী ও বেশী সওয়াবের কাজ। কিন্তু যারা কারো পক্ষ থেকে ফরয হজ্ব করার জন্য বারবার বদলী হজ্বে যায় তাদের বেলায় একথা খাটে না। এটা আর একজনের পক্ষ থেকে শরীয়তের দেয়া সুযোগ অনুযায়ী ফরয আদায়ের ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকে '৪০/৫০ হাজার টাকা দিয়ে হজ্ব না করে যদি সেই টাকা দিয়ে একজন বা কয়েকজন গরীবকে সাহায্য করা হয়, তাহলে তাদের আর ভিক্ষা করার দরকার হয় না এবং তারাও আমাদের মতো সচ্ছল অবস্থায় এসে যাবে।' বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে বুঝিয়ে বলবেন কি?

উত্তর ঃ যারা এই ধরনের যুক্তি দেন তারা প্রকৃতপক্ষে হয় ইসলামের স্পিরিট বোঝেন না অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই হজ্ব-এর মতো ইসলামের অন্যতম একটি ভিত্তিকে গুরুত্বহীন মনে করেন। আল্লাহ তায়ালা যার উপরে হজ্ব ফরয করেছে সে যদি ঐ ফরয আদায় না করে তাতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার শাস্তি থেকে রেহাই

www.amarboi.org

পাওয়ার কোনো উপায় নেই। একজনের হজ্বের টাকা দিয়ে ৫ জনের বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে, কিন্তু এটা তার উপর আল্লাহ ফরয করেননি। সমাজের বেকার লোকদের অন্ন সংস্থানের জন্য ইসলাম সরকার ও সম্পদশালী লোকদের দায়িত্বশীল করেছে, কোনো এক ব্যক্তির উপর নয়। তাই কেউ এই দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে হজ্বের টাকা দিয়ে কয়েকজন বেকারের অন্ন সংস্থান করাকে যুক্তিপূর্ণ মনে করলে আল্লাহর অন্যান্য হুকুমের ব্যাপারেও এই ধরনের বাজে যুক্তি দাঁড় করাতে থাকবে। যেমন কেউ বলতে পারে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে যে সময় লাগে সে সময়টা মানুষের কোনো কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত। অথবা রোযা রেখে ক্লান্ত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে জাতীয় উন্নতির দোহাই দিয়ে রোযা রাখা বন্ধ করা উচিত সুতরাং এ জাতীয় যুক্তি অচল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন—'যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে পৌছার পথ খরচের মালিক হয়েছে অথচ হজ্ব করেনি সে ইয়াহুদী হয়ে অথবা খৃস্টান হয়ে মরুক—তাতে কিছু যায় আসে না।'

প্রশ্ন ঃ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের একটি হলো 'হজ্ব' যা পালন করা ফরয। আমাদের দেশ অত্যন্ত গরীব। এদেশের অগণিত মানুষ না খেয়ে, না পরে মানবেতর জীবন যাপন করে। হজ্ব পালন করতে প্রায় ৫০ হাজার টাকা করে ব্যয় হয়। এতে বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। যদি এ টাকা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা কিংবা তাদের স্থায়ী সংস্থান করা হয়, তাহলে তো মানবতার যেমন কল্যাণ হয় তেমনি সমাজ জীবন মধুর হয়। এর বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী কী—বিস্তারিত জানাবেন । আর মানবতার খিদমত থেকে হজ্ব কোন্ দিক দিয়ে উত্তম জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনাদের প্রশ্নের সরাসরি জবাবের পূর্বে এ বিষয়টির সিদ্ধান্ত প্রয়োজন যে, ইসলামের প্রকৃত সংজ্ঞা কী। আমার জানামতে 'ইসলাম' মানে 'আত্মসমর্পণ'। আর 'মুসলিম' অর্থ ঐ ব্যক্তি যে সকল বিষয়ে আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণের পর মুসলিমের কর্তব্য হলো আল্লাহর নির্দেশ বিনা দ্বিধায় এবং সন্তুষ্টচিত্তে পালন করা। যদি আল্লাহর কোনো বিধানের উদ্দেশ্য কারো বুঝে না-ও আসে, তবু ঈমানের দাবী হলো সে বিধান পালন করা। কারণ সব বিধানের হিকমত ও উদ্দেশ্য সকলের পক্ষে সমানভাবে বুঝা সম্ভব নয়।

মানুষ চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী জীব। সে হিসেবে আল্লাহর প্রতিটি বিধানের উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করা কর্তব্য এবং না বুঝে পালন করার চেয়ে বুঝার চেষ্টা করে পালন করা অনেক বেশী সওয়াব। কিন্তু উদ্দেশ্য বুঝে না আসলে পালন করব না—এমন মনোভাব ঈমানের বিপরীত।

আপনার প্রশ্নটিকে আমি এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই গ্রহণ করেছি যে, আপনি হজ্বের উদ্দেশ্য বুঝতে চান। কিন্তু 'মানবতার খিদমত থেকে হজ্ব কোন দিক দিয়ে উত্তম'—এ ভাষায় জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। কারণ এ প্রশ্নের দ্বারা হজ্বের গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয়।

www.amarboi.org

মানবতার সেবা নিঃসন্দেহে ইসলামের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর জন্য হজ্বের উদ্দেশ্যে যে টাকা খরচ হয় সে টাকা ছাড়া কি মানবতার কল্যাণ করা সম্ভব নয়? মানবতার কল্যাণের জন্য আল্লাহর এ হুকুমটিকে অমান্য করার প্রয়োজন মনে করার কারণ কী? ইসলাম জনকল্যাণের প্রয়োজনেই যাকাত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা হিসেব করে দেখেছি যে, আমাদের দেশে যাকাত সংগ্রহ হলে এত বিরাট তহবিল সৃষ্টি হতে পারে যার দ্বারা কয়েক বছরের মধ্যে ভিক্ষার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব। তা ছাড়া যদি জনদরদী সরকার মানুষের জন্য বাস্তব কল্যাণকর কাজ নিঃস্বার্থভাবে করেন তাহলে যাকাতের চেয়েও অনেক বেশী দান খয়রাত করার জন্য ধনী লোকেরা সহজেই উদ্বুদ্ধ হবে। তাই মানবতার কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি বিনষ্ট করার চিন্তা একেবারেই ভ্রান্ত। কিছুসংখ্যক লোক এ একই যুক্তিতে পশু কুরবানী না দিয়ে সে টাকা জনকল্যাণে খরচ করার ভ্রান্ত চিন্তা করে থাকেন।

হজ্জের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী কী তা জানতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে মাওলানা সাইয়েদ আবদুল আ'লা মওদূদী (রাহঃ)-এর 'হজ্বের হাকীকত' নামক পুস্তিকা থেকে জানতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে হজ্ব এমন একটি বিরাট ইবাদাত যা শারীরিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত।

পোশাক

প্রশ্ন ঃ টুপির প্রচলন কখন থেকে? টুপি কি নামাযেই সুন্নাত, না সবসময়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর জামানায় মুসলিম-অমুসলিম সবারই মাথা ঢেকে চলার রেওয়াজ ছিল। কারণ সেখানে আবহাওয়া অত্যাধিক উষ্ণ। জোরে গরম হাওয়া বইতে থাকে। সে কারণেই মাথা ঢাকার জন্য সবসময় মাথায় কাপড় থাকে। যখন ঘূর্ণিঝড় বয় তখন লোকেরা মাথায় কাপড় দিয়েই নাক-মুখ ঢেকে নেয়, কেবল চোখ খোলা রাখে। মরুভূমিতে উষ্ণ আবহাওয়া থেকে বাঁচার প্রয়োজনেই তাদের মাথা ঢাকার প্রয়োজন দেখা দেয়, মাথায় তাই পাগড়ী বাঁধে। আপনি পাঞ্জাবে যান, দিল্লীতে যান— দেখবেন, হিন্দু-মুসলিম সবাই মাথায় পাগড়ী বাঁধে।

রাসূল (সাঃ)-এর জামানায় আরব দেশে সকলেই পাগড়ী বাঁধতো। নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজনেই পাগড়ীর নীচে টুপি পরার উপদেশ দেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসূল (সাঃ) নিজেই টুপির কথা বলেছেন। আর পাগড়ীর যে রেওয়াজ ছিল সে বিষয়ে তিনি আপত্তি করেননি। সুতরাং পাগড়ী জায়েজ। কেননা রাসূল (সাঃ) হুকুম করে মাথা ঢাকাননি, তবে মাথা ঢাকার রেওয়াজকে

www.amarboi.org

তিনি নিষিদ্ধও করেননি। যেটা তিনি নিষেধ করেননি সেটাই জায়েজ। আর যেটা করতে বলেছেন, সেটা তো অবশ্যই করতে হবে। রাসূল (সাঃ) টুপি পরার কথা বলেছেন।

মুসলমানের পরিচিতি তার পোশাকের মাঝে থাকা দরকার। পোশাকের একটা শর্ত হচ্ছে, এতে মুসলিম হিসেবে পরিচিতিমূলক স্বাতন্ত্র থাকা দরকার যাতে দেখে চেনা ও সালাম দেয়া যায়। তবে টুপি পরাকে কেউ ফরয বা ওয়াজিব বলেনি, সুন্নাতই বলেছেন। এখন সুন্নাত কি নামাযের ভিতরে, না নামাযের বাইরেও এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। যদি কেউ যুক্তির উপর দাবী করে যে, টুপি ছাড়া নামায হবে কিনা। তবে একথা স্বীকার করতে হবে, টুপি ছাড়াও নামায হবে। নামায হবে না একথা কেউ বলতে পারবে না। নামায হওয়া এক জিনিস, আর নামাযের সৌন্দর্য ও পূর্ণাঙ্গতা অন্য জিনিস। যেখানে কোনো মাহফিলে যেতে হলে একটু ভালো পেশাক পরে যেতে হয়, সেখানে আল্লাহর কাছে হাজিরা দানকালে যথাসম্ভব সুন্দর ও উত্তম সাজে যাওয়াই তো রুচির দাবী। কুরআনেও আছে 'যখন নামাযে আসবে জীনতের সাথে এসো' –অর্থাৎ সুন্দর হয়ে এসো। এ সাজের মাঝে হামেশাই লোকেরা টুপিকে সুন্দর পোশাকের সঙ্গে মনে করে। কেউ যদি কেবল সতর ঢেকে অর্থাৎ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে নামায পড়ে তাহলে ফেকাহর বিচারে নামায হয়ে যায়। কিন্তু মনে করুন ঘরে আপনি খালি গায়ে থাকেন, কিন্তু বাইরে কোনো মেহমান আসলে তো জামা গায়ে দিয়ে তার সামনে যান। তেমনি আল্লাহর সামনে হাজিরা দিতে পোশাক-পরিচ্ছদে পূর্ণতা ও শালীনতা থাকা দরকার। তন্মধ্যে টুপি অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক।

মুসলিমদের পোশাকে টুপিটা একটা পরিচয়। সুতরাং এটা সুন্নাত তো বটেই। তবে নামাযের সুন্নাত ছাড়া এটা 'শেয়ারে ইসলাম' বা ইসলামের পরিচয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাকের বৈশিষ্ট কি কি ? ইসলামী পোশাক বলতে কী বুঝায় ? এ সম্পর্কে যে বিশেষ ধারণা আছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ?

উত্তর ঃ দ্বীন ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্য। কোনো নির্দিষ্ট কাটিং বা ধরনের পোশাক সারা দুনিয়ার জন্য উপযোগী হতে পারে না। পোশাক এমন এক জিনিস যা বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে। গরমের দেশ ও শীতের দেশের লোকদের পোশাক একই রকম হতে পারে না। তবে ইসলাম পোশাকের উদ্দেশ্য ঠিক করে দিয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেছেন—'হে আদম সন্তান, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার জন্য এবং দেহের সজ্জা ও হেফাজতের জন্য আমি তোমাদের উপর পোশাক নাযিল করেছি। আর তাকওয়ার পোশাকই ভালো।' (সূরা আ'রাফ ঃ ২৬)

উক্ত আয়াতে পোশাকের যে মূলনীতি দেয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে কয়েকটি সীমা ও শর্ত পালন করে পোশাক পরাই ইসলামের দাবী ঃ

এক ঃ সতর ঢাকা। পুরুষের 'সতর' নাভীর উপর থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। মেয়েদের 'সতর' দুই হাতের কব্জি, মুখমণ্ডল ও দুই পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর।

www.amarboi.org

'সতর' শব্দের অর্থই ঢেকে রাখা। সতর ঢাকা ফরয। সতরের কোনো অংশ খোলা রেখে নামায পড়লে নামাযই হবে না। তাই মেয়েদের উচিত চাদর গায়ে জড়িয়ে নামায পড়া।

দুই ঃ পুরুষের জন্য কতক জিনিস পরা হারাম। যেমন–সোনার জিনিস, রেশমের কাপড়, গোড়ালীর নীচে কাপড় পরা, কমলা রং-এর কাপড় পড়া ইত্যাদি। এছাড়া গর্ব ও অহংকারের উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের পোশাক পরাও হারাম। যেমন রাজা ও নওয়াবদের শান-শওকত দেখাবার উদ্দেশ্যে তৈরি পোশাক।

তিন ঃ পুরুষের পোশাক নারী পরবে না নারীর পোশাকও পুরুষ পরবে না কারণ দাড়িবিহীন কোনো পুরুষ নারীর পোশাক পরে অন্দর মহলে ঢুকে পড়লে তাকে সহজে চেনা যাবে না। তেমনি পুরুষের পোশাক পরা কোনো নারী পুরুষদের মাঝে এসে গেলে তাকেও হঠাৎ চেনা সম্ভব না-ও হতে পারে।

চার ঃ ইসলামী আইন যে দেশে জারি থাকে অর্থাৎ কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান ও অমুসলমানদের পোশাক আলাদা হবে। নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করার জন্যই এটা প্রয়োজন। যেমন ইসলামী রাষ্ট্রে রমযান মাসে একজন সুস্থ লোক পানাহাররত অবস্থায় পুলিশের সামনে পড়লে পুলিশের পক্ষে মুসলিম বা অমুসলিম দেখে বুঝা সম্ভব না হলে আইন প্রয়োগ করতে মুশকিলে পড়ে যাবে। মুসলিম হলে এ অবস্থায় তাকে গ্রেফতার করা দরকার। আর অমুসলিম হলে গ্রেফতার করা যাবে না। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের পোশাক অমুসলিমদের চেয়ে আলাদা হওয়া দরকার। হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় একবার কিছু অমুসলিম মুসলমানদের মতো পোশাক পরার অনুমতি চাইলে তিনি তার অনুমতি দেননি।

যেখানে ইসলামী আইন জারি নেই, সে ধরনের মুসলিম সমাজেও এটা দরকার যাতে এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে দেখে চিনতে পারে এবং সালাম দিতে পারে। সালাম দেয়া-নেয়াটাই পরস্পর কল্যাণ কামনা ও দোয়া করার বিশেষ মাধ্যম।

পাঁচ ঃ একজন মুসলিম মানেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। সুতরাং তাঁর নামাযের পোশাক ও বাইরের পোশাক ভিন্ন রকম হতে পারে না। এছাড়া আসর মাগরিব ও এশার নামাযের ওয়াক্ত এত কাছাকাছি যে, এ সময় পোশাক পরিবর্তন করা মুশকিল। এ জন্য পোশাক এমন হওয়া দরকার যা দিয়ে নামায আদায় করা যায়। এমন পোশাক হওয়া দরকার যা সজ্জার সাথে সাথে তাকওয়ার পরিচয় বহন করে এবং যে পোশাকে পবিত্রতা ঠিকমতই রক্ষা করা যায়। পোশাকের কাটিং ও সাইজ সবকিছুই নামাযের জন্য অনুকূল হওয়া উচিত।

ছয় ঃ অমুসলিমদের পরিচয়মূলক পোশাক পরা হারাম। মুসলিমের পক্ষে এমন পোশাক পরা জায়েয নয়, যে পোশাক দিয়ে তাকে স্পষ্টরূপে ভিন্ন ধর্মের লোক বলে মনে হয়। যেমন 'হরেকৃষ্ণ লেখা' নামাবলী, খৃস্টানদের 'ক্রস' চিহ্নযুক্ত কিছু বা ব্রাহ্মণদের 'পৈতা'।

www.amarboi.org

উপরোক্ত সীমা ও শর্ত পালন করা হলে যে কোনো ধরনের পোশাককেই 'ইসলামী' বলে গণ্য করা যায়। আমাদের দেশের আলেম সমাজ যে পোশাক পরেন তাকেই একমাত্র ইসলামী পোশাক মনে করা অযৌক্তিক। পেশায় বিভিন্নতার দরুনও পোশাকের ধরন ভিন্ন হতে বাধ্য। যেমন কারখানার শ্রমিক, মসজিদের ইমাম, মাঠের চাষী, মাদ্রাসার শিক্ষক, রিকসাচালক ও মোটর ড্রাইভারের পোশাক একই ধরনের হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাই ইসলামী সীমার মধ্যে যত রকম পোশাক হতে পারে সবই ইসলাম সম্মত পোশাক হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ টাখনুর নীচে কাপড় পরা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ?

উত্তর ঃ এটা একটা গর্হিত ষ্টাইল। টাখনুর নীচে কাপড় পরা সম্পর্কে বহু হাদীসে শক্ত কথা আছে। 'যারা টাখনুর নীচে কাপড় পরে, কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না' এরকম কথাও আছে। কোনো কোনো হাদীসে অহংকারের সাথে টাখনুর নীচে কাপড় না পরার কথা বলা হয়েছে কিন্তু যারা ষ্টাইল, ফ্যাশন বা রেওয়াজ হিসেবে টাখনুর নীচে কাপড় পরেন তারা এটা কী উদ্দেশ্যে করেন ? এটা না করলে যদি ফ্যাশনের বিরোধী মনে করা হয় তাহলে তা-ও তো অহংকারেরই একটা ধরন। যে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এত শক্ত কথা বলেছেন, সে জিনিসকে ষ্টাইল বা রেওয়াজের কারণেই গ্রহণ করা কি অহংকার নয় ? মু'মিনের কাজ হলো তার রুচিকেও শরীয়তের অধীন করা। তাই রাসূল (সাঃ) বলেছেন—'তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না যে পর্যন্ত তার খাহেশ (প্রবৃত্তি) আমার আনীত দ্বীনের অনুসারী না হবে।'

প্রশ্ন ঃ সোনার গয়না মেয়েলোকদের পরিধান করা জায়েজ আছে কিনা ? যদি থাকে তাহলে কোথায় এবং কোন হাদীসে আছে ? কারণ বাংলা হাদীস শরীফ (সংকলন) বইয়ে অলংকার অধ্যায় 'সোনার গয়না মেয়েদের জন্য হারাম' লেখা আছে। হাদীসটি আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফ থেকে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান দিলে আমরা উপকৃত হবো।

উত্তর ঃ কোনো হাদীসের সংকলন থেকে কিছু হাদীস পড়েই তার থেকে, মাসয়ালা হিসেবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিপদজনক। কোনো একটি বিষয়ে বহু হাদীস থাকতে পারে এবং এক বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন মতও পাওয়া যেতে পারে। এ কারণেই সকলের পক্ষে হাদীস থেকে মাসয়ালা বের করা সম্ভব নয়। মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ কোনো একটি বিষয়ে প্রাপ্ত হাদীসসমূহকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআনের আলোকে ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবী করীম (সাঃ) প্রথম দিকে মহিলাদেরকেও স্বর্ণ পরা নিষেধ করেছিলেন। স্বর্ণ চিরকালই দুষ্প্রাপ্য ও মুদ্রার মানদণ্ড হওয়ার কারণে মূল্যবান বলে গণ্য। সম্ভবত মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) প্রথম দিকে স্বর্ণ পরা মহিলাদের জন্য নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বর্ণ ও রেশম শুধু পুরুষদের জন্য নিষেধ করায় বুঝা গেল যে, তা মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ মাসিক পৃথিবীর জানুয়ারী '৮৬ সংখ্যা প্রশ্নোত্তরের আসরে দেখলাম প্যান্ট, শার্ট কমন (Common) পোশাক হওয়া সেসব পরা জায়েজ। কালক্রমে যদি ধুতি পরা হ্যাট (Hat) পরা কমন পোশাকে পরিণত হয় তাহলে সেগুলো পরা জায়েজ হবে কি? আর পাজামা, পাঞ্জাবী, টুপি শুধু মুসলমানই পরে। সুতরাং আমরা অন্য পোশাককে 'কমন' না বানিয়ে সবসময় এই পোশাক পরে এটাকে 'কমন' বানালে কেমন হয়? তাহলে তো আর আমাদের বিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না। আর এভাবে যদি আমরা আস্তে আস্তে দুনিয়ার কমন জিনিসের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নেই তাহলে কি মঞ্জিলে মকসুদ থেকে দূরে সরে পড়বো না?

উত্তর ঃ আপনি প্যান্ট-শার্টকে ধূতি ও হ্যাট (Hat) পরার সাথে একই মান বিশিষ্ট বলে ধারণা করেছেন। দুনিয়ায় ধূতি কখনও (Common) কমন পোশাকে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। ধূতি শুধু এ উপমহাদেশের হিন্দুদেরই একাংশের পোশাক। তাদের মধ্যেও অধিকাংশ শিক্ষিত লোক শার্ট-প্যান্ট পরেন।

হ্যাট পোশাকের অংশ নয়। রোদ ও শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য হ্যাট পরা হয়। এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের 'মস্তক আবরণ' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটাও দুনিয়ার কমন পোশাক হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আপনি পাজামা, পাঞ্জাবী ও টুপিকে মুসলমানদের 'কমন পোশাক' বানাবার প্রস্তাব করেছেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো ক্ষমতা আপনারও নেই, আমারও নেই। বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের নিকট এ প্রস্তাব পেশ করার সুযোগ আসবে।

অবশ্য সকলের জন্য একই ধরনের পোশাক নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে কিনা তাও বলা যায় না। কারণ বিভিন্ন পেশার লোকদের পোশাকে তারতম্য থাকাটা স্বাভাবিক। সেনাবাহিনী ও পুলিশের পোশাক তো আলাদা থাকবেই। মসজিদের ইমাম, কারখানার শ্রমিক, কাদা মাটিতে কর্মরত কৃষকের পোশাক একই ধরনের হওয়া সম্ভব নয়। তাই কোনো নির্দিষ্ট আকারের পোশাক সকলের জন্য কমন করার চেষ্টা করা ইসলামের দাবী নয়। ইসলামের দাবী হলো পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের দেয়া সীমাগুলো মেনে চলা। ঐসব সীমা সম্পর্কে পূর্বে এ বিভাগেই আলোচনা হয়েছে বলে এখানে উল্লেখ করা হলো না।

পর্দা

প্রশ্ন ঃ বোরখা পরেও যারা মুখ খোলা রাখে তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ বোরখা একেবারে না পরার চেয়ে এটা কম মন্দ। চেহারা খোলা রাখলে পর্দা হয় না, সতর ঢাকা হয়। যে ১৪ জনকে দেখা দেয়া জায়েয তাদের মধ্যে স্বামী

www.amarboi.org

ছাড়া সবার সামনে সতর ঢাকা অবস্থায়ই আসতে হয়। বাকী লোকদের সামনে পর্দা করতে হবে। চেহারাতেই আসল সৌন্দর্য। বরং সৌন্দর্যের রাজধানী হচ্ছে চেহারা। অথচ ১৪ জন ছাড়া বাকীদের কাছে সৌন্দর্য প্রদর্শিত না করতে বলা হয়েছে কুরআনে। (সূরা নূর ৩১ আয়াত দ্রঃ)

তবু বোরখা একেবারে না পরার চেয়ে বোরখা পরে মুখ খোলা রাখা উত্তম।

প্রশ্ন ঃ মহিলা কলেজে পুরুষ অধ্যাপক, পুরুষ কর্মচারী, বেয়ারার ইত্যাদির সংখ্যা অনেক, এমনকি অফিসে কোনো মহিলাই নেই। তাহলে সেখানে পর্দা কিভাবে রক্ষা করা যাবে ?

উত্তর ঃ এ জন্যই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন । সমাজকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী না করতে পারলে শুধু পর্দার ব্যাপারে নয়, সমাজে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা সম্ভব নয়। তাই যারা ইসলামকে ভালোবাসে তাদেরকে ইসলামী বিপ্লবের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য মহিলা মহলেও নেতৃত্বের উপযোগী একদল শিক্ষিতা মহিলা প্রয়োজন। সমাজে অনৈসলামি শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিতা মহিলারা স্বাভাবিকভাবে অনৈসলামিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ মহলে দ্বীনের দাওয়াতী কাজ মহিলাদের পক্ষেই করা সম্ভব। তাই ইসলামী আন্দোলনের জন্য মহিলাদেরকে শিক্ষিতা হতে হবে। কিন্তু বর্তমানে মহিলাদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ তো নেই-ই, যেসব মহিলা কলেজ আছে সেখানেও পুরুষ অধ্যাপক ও কর্মচারী যথেষ্ট রয়েছে। এ অবস্থায় মহিলা কলেজেও পুরোপুরি পর্দা পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে ইসলামপন্থী মহিলাদের কলেজ শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া ইসলামের স্বার্থেই উচিত নয়। পুরুষদের সামনে বোরখা পরিহিতা অবস্থায় মুখ না খুলে যতোটা পারা যায় প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করা ছাড়া উপায় নেই।

প্রশ্ন ঃ বোরখার নীচে পাতলা শাড়ি পড়া কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ পাতলা শাড়ি কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নয়। কারণ পোশাক পড়ার পরও যদি শরীর দেখা যায়, সে পোশাক পরা না পরা সমান।

বোরখা পরা হচ্ছে পর্দার জন্য, আর শাড়ী পরা হচ্ছে সতর ঢাকার জন্য। যে কাপড়ে সতর ঢাকার প্রয়োজন পূরণ হয় না, সে কাপড় পরা উলঙ্গ থাকারই শামিল।

হুজুর (সাঃ) এই ধরনের কাপড় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন-'অনেক মহিলারা কাপড় পরেও উলঙ্গই থাকে'।

অবশ্য সব পাতলা কাপড়ের অবস্থা এক নয়। ঘন পাতলা কাপড়েরও সতর ঢাকার উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। এটা নির্ভর করবে তার উপরই যে, শাড়ীর দ্বারা সতর সঠিকভাবে ঢাকে কিনা।

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের পর্দা কোথাও পালন হচ্ছে না, এমনকি কোনো দ্বীনদার মাওলানা সুফি সাহেবদের ঘরেও। এমনও দেখা যায় আব্বা বেশ সুফী-মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি,

www.amarboi.org

গায়ে পাঞ্জাবী, আম্মাও চলেছেন বোরখা পরে, কিন্তু সাথে যার পর্দার বেশী প্রয়োজন তাকে স্যান্ডো টাইপ কামিজ, নামমাত্র ওড়না পরিয়ে চলেছেন। এই ব্যাপার কি ঐ গায়ের মুহরম মহিলাকে কিছু বলা যাবে ? বা হাতে পর্দা সম্পর্কিত ছোট বই তুলে দেয়া যাবে ? নাকি নীরব থাকবো ? এখানে আমার কর্তব্য কী হবে ?

উত্তর ঃ একথা সত্যি যে, অনেক দ্বীনদার পিতা-মাতাও তাদের ছেলে মেয়েদেরকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারছেন না। যার ফলে সেই দ্বীনদার বাপ-মায়ের সঙ্গে অশালীন পোশাক পরে তাদের মেয়েরা চলাফেরা করে। এর জন্য অনেক কারণ দায়ী। প্রথমতঃ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহিলাদের জন্য যে পোশাক নির্ধারণ করেছে, অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে সেই পোশাক তৈরি করে দেয়। একালে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে পর্দার আর কোনো বালাই নেই। তাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক মহিলা যে পর্দা মেনে চলেন তা শিক্ষাব্যবস্থার ফলে নয়, বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা সত্ত্বেও নিজেদের উদ্যোগে বা অভিভাবকদের প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ বহু দ্বীনদার পিতা-মাতাও সন্তানদের মন মগজকে ইসলাম অনুযায়ী গড়ে তুলতে অক্ষম। সন্তানদেরকে ইসলামী জ্ঞানের আলো না দিয়ে এবং ইসলামী মজবুত ঈমান সৃষ্টির ব্যবস্থা না করে বাইর থেকে তাদের ওপরে ইসলামী পোশাক ও পর্দা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা কিছুতেই সফল হতে পারে না।

এ জাতীয় অশালীন পোশাক পরিহীতা অবস্থায় মহিলাদেরকে যানবাহনে পর্দার বই হাতে তুলে দিলেও কোনো লাভ হবে না। ঈমানের ও ইসলামের জ্ঞান ব্যতীত তাকওয়া সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবে যদি এ ধরনের অশালীন পোশাক পরিহিতা মহিলাদের সাথে দ্বীনদার অভিভাবকও উপস্থিত থাকে—এ বিষয়ে তাদেরকে হিকমতের সাথে তাগিদ দেয়া উচিত। কারণ ঐ অভিভাবকের দুর্বলতার কারণে মহিলার এই অবস্থা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ পর্দা পালন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। আর রোগের চিকিৎসা করার জন্য হাদীসে নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে পৃথক মেডিকেল কলেজ না থাকায় মহিলা ডাক্তারের সংখ্যা খুবই কম। এমতাবস্থায় কোনো মহিলা রোগী যদি পুরুষ ডাক্তারের নিকট আসে, তাহলে কি রোগীর ও ডাক্তারের সওয়াব হবে, না উভয়ের গুনাহ হবে বা উভয়ের সওয়াব ও গুনাহ দুটোই হবে ?

উত্তর ঃ আল্লাহর কোনো বিধান এমন নয় যা মানুষকে অচল অবস্থায় নিক্ষেপ করে। তাই মহিলা ডাক্তার না পেলে কোনো রোগিনীকে বিনা চিকিৎসায় মরবার জন্য ইসলাম বাধ্য করে না।

কুরআন পাকে আল্লাহ বলেছেন—'কোনো মানুষের ওপর তিনি সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেন না'।

তাই যদি চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনো রোগিনীর জন্য মহিলা ডাক্তার যোগাড় করা না যায় তাহলে পুরুষ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো জায়েজ। কিন্তু চিকিৎসার

www.amarboi.org

উসিলায় অপ্রয়োজনীয় বেপর্দা হওয়া চলবে না। চিকিৎসার প্রয়োজনে শরীরের যেটুকু অংশ ডাক্তারকে না দেখালে চলে না শুধু সেটুকু অংশই দেখানো যাবে।

মহিলা ডাক্তার পাওয়া গেল না বলে চিকিৎসা না করে থাকা কোনো সওয়াবের কাজ নয়। এ অবস্থায়ও ইসলাম চিকিৎসা করানোর অনুমতি দিয়েছে। তাই এভাবে রোগিনী বা ডাক্তারের কোনো গুনাহ হওয়ার কথা নয়। চিকিৎসার অনুমতি অবশ্যই রয়েছে। চিকিৎসা করালে সওয়াব হবে এ রকম মনে করারও কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন ঃ ইসলামে 'নারী শিক্ষা' নিষেধ নয়, অথচ দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষিত নারী বেপর্দায় চলে। তাহলে কি বুঝতে হবে বর্তমানে শিক্ষাই নারীকে বেপর্দা বানিয়ে দিচ্ছে?

উত্তর ঃ নারী-পুরুষ সকলের জন্য শিক্ষা ফরয বলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন। যে ইলম ফরয করা হয়েছে তা হলো দ্বীনি ইলম। দুনিয়ায় মানুষকে যত রকম দায়িত্ব পালন করতে হয় সে সব আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো পালন করাই মুসলিমদের কর্তব্য। আর এ কর্তব্য পালন করার জন্যই দ্বীনের ইলম প্রয়োজন। এ ইলম ব্যতীত মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করা অসম্ভব। তাই নিজ নিজ দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে কুরআন-হাদীসের ইলম অর্জন করা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই ফরয।

দ্বীনি ইলম ছাড়াও দুনিয়ায় বেঁচে থাকার প্রয়োজনে পেশাগত জ্ঞান অর্জন করা পরোক্ষভাবে ফরয। কারণ হালাল রিযক তালাশ করা আল্লাহ ফরয করেছেন। এ ফরয আদায় করার জন্য পেশাগত ইলমও প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ডাক্তারী পেশা গ্রহণ করেছে তার রুজি হালাল করার প্রয়োজনেই ডাক্তারী বিদ্যা ভালোভাবে শিক্ষা করা ফরয।

এ উভয়বিধ জ্ঞান অর্জন করা নারী-পুরুষ সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরুষদের দ্বীনি শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে যেটুকু চেষ্টা আছে তা মহিলাদের জন্য না করায় মহিলারা শুধু দুনিয়াবী বিদ্যাই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। পুরুষদের মধ্যে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের হাতে দেশের ক্ষমতা থাকায় তারা ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ গড়ার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেননি। এ সত্ত্বেও পুরুষদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা বেসরকারীভাবে চালু থাকায় জনগণকে ইসলামের পথে পরিচালনার চেষ্টা করা কিছুটা সম্ভব হচ্ছে।

কিন্তু মহিলা মহলে দ্বীনের পতাকা তুলে ধরার জন্য দ্বীনি শিক্ষিতা না থাকায় আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারা একতরফাভাবে মহিলা অঙ্গনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ মহিলারা যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে সেখানে তাদেরকে বেপর্দা করারই বন্দোবস্ত রয়েছে। তাই শিক্ষিতা মহিলা সমাজের মধ্যে ইসলামের বিপরীত যে আচরণ দেখা যায় তার জন্য প্রধানতঃ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাই দায়ী। তাদের মধ্যে যারা আধুনিক শিক্ষিতা হয়েও ইসলামের পথে চলার চেষ্টা করেন এটা তাদের নিজেদের চেষ্টারই ফল।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ বেনামাযী ও পর্দা লংঘনকারী স্ত্রীর সাথে দৈনন্দিন দাম্পত্য জীবন কিভাবে নির্বাহ করা উচিত—যা শরীয়তসম্মত এবং প্রচলিত আইনানুগ।

উত্তর ঃ স্ত্রীকে শরীয়তমতো চলার জন্য স্বামী যদি মহব্বত ও নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করতে থাকেন তাহলে সংশোধন হওয়ার আশা করা যায়। দ্বীনের ব্যাপারটি এমন যেখানে শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। প্রথমতঃ তাকে ঈমান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেয়া দরকার। মনে যদি ঈমানই কায়েম না হয় তাহলে জোর করে নামায পড়ালে কোনো লাভ নেই। আল্লাহর জন্য নামায না পড়ে স্বামীর জন্য নামায পড়া অর্থহীন।

সাধারণতঃ দেখা যায়, পিতা সন্তানদেরকে ভালোভাবে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান দান না করে এবং তার ঈমানকে সঠিক মানে আনার চেষ্টা না করেই তাদের ওপর শরীয়তের হুকুম চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। এমনিভাবে স্বামীও শুধু হুকুমের মাধ্যমে স্ত্রীকে শরীয়ত মানতে বাধ্য করার চেষ্টা করেন। এটা রাসূলের তরীকা নয়। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) রচিত 'ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি' বইটি পড়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।

একথা ঠিক যে, সর্বপ্রকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কাউকে হেদায়াত করে ফেলার ক্ষমতা কোনো মানুষেরই নেই। যদি স্ত্রীকে কোনো অবস্থায়ই সংশোধন করা সম্ভব না হয় তাহলে সন্তানাদির দ্বীনি ভবিষ্যতের স্বার্থে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করারও প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এ কাজটি জায়েয কাজের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করেছেন। বিশেষ করে সন্তানাদি হওয়ার পর স্ত্রীকে তালাক দিলেও সে সন্তানদের 'মা'-ই থেকে যায় এবং এর প্রতিক্রিয়া সন্তানদের মধ্যে এমনও হতে পারে যার ফলে তালাক দেয়াটাই দ্বীনের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর হতে পারে।

বিবাহ্ ও তালাক

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী দেখা যায়, বিয়ের পূর্বে বর পক্ষ কনে দেখার জন্য কনের বাড়ীতে আসে এবং বর পক্ষের (অপরিচিত পুরুষের) সামনে কনেকে সাজিয়ে দেখানো হয়। এই ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম এবং সীমানা কতটুকু জানাবেন।

উত্তর ঃ কনে পসন্দ করার মূল দায়িত্ব বরের। বর পক্ষের অন্যান্য দায়িত্বশীলরা কনে পক্ষের দ্বীনদারী, বংশ আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করতে পারে। কিন্তু পাত্রী দেখে পসন্দ করার কাজটা বর পক্ষের অন্য কারো নয়। বর পক্ষের অন্য কোনো পুরুষের সামনে কনেকে সাজিয়ে দেখানো শরীয়তসম্মত নয়। এমনকি বরের পিতাকেও নয়।

প্রশ্ন ঃ জ্বীন ও ইনসানের মধ্যে আন্তঃবিবাহ জায়েজ কিনা ?

উত্তর ঃ গরু আর ছাগলের সাথে যৌন সম্পর্ক সম্ভব কি ? বাঘে আর উটে যৌন সম্পর্ক সম্ভব কি ? যদি যৌন উদ্দেশ্যেই বিয়ে হয় তাহলে জ্বীন ও ইনসানের মাঝে

www.amarboi.org

কিভাবে বিয়ে হতে পারে—এটা আমার বুঝে আসে না। তবে আমরা শুনি যে, কাউকে জ্বীনে ধরে এবং বিয়ে করতে চায়। এটা কোনো দুষ্ট অসভ্য এমনিক কাফের জ্বীনই হবে, কোনো ভদ্র জ্বীনের কাজ হতে পারে না। মানুষের রুচির অভাবে যেমন যৌন বিকৃতি ঘটে তেমনি এটাও যৌন বিকৃতির জ্বীন হবে।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতিতে মোহরানা ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ কিংবা ততোধিক দাবী করে কিংবা আদায় করে থাকে। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি ?

উত্তর ঃ মোহরানা পাত্রীর পারিবারিক ও সামাজিক মান অনুযায়ী হয়ে থাকে। মোহর আদায় করা শরীয়তে অবশ্য কর্তব্য। মোহর আদায় করতে হবে না মনে করে বড় অংকের টাকা মোহর ধরলে জায়েজ হবে কিনা সন্দেহ। বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য মোহর একটি জরুরী শর্ত। মোহর এমন পরিমাণ ধরা উত্তম যা স্বামী বিয়ের সময়ই যেন আদায় করতে সক্ষম হয়। সে সময় যদি সক্ষম না হয় তাহলেও পরে অবশ্যই আদায় করতে হবে—এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই বিয়ে করতে হবে। যে পরিমাণ মোহর আদায় করতে পারে বলে ধারণা আছে তার চেয়ে বেশী মোহর স্বীকার করা পাত্রের পক্ষে কিছুতেই উচিত নয়। মোহর স্ত্রীর অধিকার সে যে পরিমাণ দাবী করবে তা যে ব্যক্তি আদায় করতে রাজী সেই তাকে বিয়ে করবে।

বিয়ে শুধু পুরুষেরই দরকার নয়, মেয়ের জন্য আরো বেশী দরকার। বিয়ের বয়স হলে বাপ-মা মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেন। অন্যায় ও অসম্ভব পরিমাণ মোহর দাবী করলে মেয়ের বিয়েই হবে না। তাই উভয় পক্ষের সম্মতিতে যে পরিমাণ মোহর ধার্য হয় তাতে শরীয়তের আপত্তি নেই। শুধু খান্দানী গর্ব প্রকাশের জন্য বেশী মোহর দাবী করা শরীয়ত বিরোধী। আবার আদায় না করার নিয়তে বেশী মোহর দেয়ার কথা স্বীকার করা আরও বড় অন্যায়। মোহর এক প্রকারের ঋণ, তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন—'যে ব্যক্তি মোহর নির্ধারণপূর্বক কোনো মহিলাকে বিয়ে করলো অথচ তা পরিশোধের ইচ্ছা নাই সে ব্যভিচারী।' (তাবরানী)

প্রশ্ন ঃ বর্তমান সমাজে বিবাহে মোহর ধার্য করা হয় একলক্ষ বা দেড় লক্ষ টাকা। শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহে এ ধরনের মোহর ধার্য করা ঠিক কিনা ? কুরআন হাদীসের আলোকে এ সম্পর্কে জানালে ভালো হয়।

উত্তর ঃ ইসলামের মোহরের উদ্দেশ্য হলো এ ধারণা স্বামীর নিকট স্পষ্ট করা যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর এবং পরিবারের খরচপত্র যোগাড়ের দায়িত্ব স্ত্রীর নয় ; বরং ব্যক্তিগতভাবে স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য স্বামীকে একটা নির্ধারিত অংক বিবাহের সময়ই স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে হবে। নবী (সাঃ)-এর সময় মোহরের টাকা বা জিনিস বিবাহের সময় নগদ আদায় করারই রীতি ছিল।

আজকাল মোহর সম্বন্ধে শরীয়তের সঠিক ধারণা অনেকেরই নেই। বাকীর খাতায় জমা হিসেবে কাবিননামায় একটা অংক লিখে রাখা হয়। মোহরের যে অংক ধার্য করা হলো তা দেয়া যে ওয়াজিব—একথা খুব কম লোকেই মনে করে। মরার আগে স্ত্রীর

www.amarboi.org

নিকট থেকে মাফ চেয়ে নিলে ঐ সময় আবেগের বশে স্ত্রী তো মাফ করেই দেবে— এমন ধারণাও প্রচলিত আছে।

বিবাহের সময় স্ত্রীকে অলংকারাদি বাবদ নগদ যা আদায় করা হয় তা মোহরের অংশ হিসেবে উশুল বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মোহরের বাকী অংশ আদায় করা বাধ্যতামূলক বলে বিশ্বাস করতে হবে। শরীয়তে স্ত্রীকে এ অধিকারও দিয়েছে যে, স্ত্রী যদি মোহরের একাংশ আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীর নিকট যেতে অস্বীকার করে তাহলে তা অন্যায় হবে না। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী'র সম্পর্কটা এমন যে, কোনো স্ত্রী-ই এ ধরনের দাবী করে না।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, আজকাল স্বামীরাই স্ত্রীর নিকট নগদ 'মোহর' দাবী করে। আমাদের সমাজে এটা 'যৌতুক' নামে পরিচিত। আর এ যৌতুক বাকীর খাতায় জমা করার কোনো উপায় নেই। যৌতুকের ও কুপ্রথা এদেশে মুসলিম সমাজে ছিলো না। এটা হিন্দু সমাজ থেকে আমদানী করা হয়েছে। হিন্দুদের পারিবারিক আইনে যেহেতু কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না সেহেতু কন্যার পিতা বিবাহের সময়ই যথাসাধ্য দেয়ার চেষ্টা করে।

মেয়ের নিকট থেকে দাবী করে যৌতুক আদায় করা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই নিন্দনীয়। বিয়ে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই প্রয়োজন। যারা সম্পদ পাওয়ার জন্য বিয়ে করে এবং চাপ দিয়ে যৌতুক আদায় করে তারা স্ত্রী'র নিকট থেকে সত্যিকার ভালোবাসা পাওয়া থেকে বিঞ্চত হতে বাধ্য।

এখন প্রশ্ন হলো, এ মোহরের পরিমাণ কী হওয়া উচিত ? শরীয়ত এ ব্যাপারে কোনো অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়নি। স্বামী এবং স্ত্রীর অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী এবং উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে যে কোনো অংশ নির্ধারিত হতে পারে। কোনো বিয়েতে কম হওয়াতেও কোনো দোষ নেই।

অনেকে তো মোহরের অংশ বড় হওয়াকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। যে স্বামী মোহর আদায় করার নিয়ত রাখে না সে তা সাধ্যের বাইরে কোনো অংক লিখে দিতে পারে। কিন্তু মোহর আদায় না করলে অবশ্যই ওয়াজিব তরক করার অন্যায় হবে।

প্রশ্ন ঃ বিয়েতে মোহর কি ফরয ? এর পরিমাণ সর্বনিম্ন কত ? মোহরে ফাতেমী বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর ঃ শরীয়ত মতে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে কয়টি শর্ত রয়েছে তার মধ্যে 'মোহর' হলো একটি। এজন্য মোহর নিঃসন্দেহে ওয়াজিব। কিন্তু শরীয়ত তার কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়নি। এ মোহর আদায়ের দায়িত্ব স্বামীর আর এটা স্ত্রীর হক। মোহর নির্ধারণ করার সময় স্বামীর এ নিয়ত থাকতে হবে যে, 'মোহরের টাকা আমি অবশ্যই পরিশোধ করবো।' সে হিসেবে তার আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ীই সে মোহরের অঙ্গীকার করবে।

www.amarboi.org

পাত্রী পক্ষ থেকে বেশী মোহর দাবী করার যে রেওয়াজ চালু আছে তার মধ্যে বাড়াবাড়িও করা হয়। আবার সকল মহিলার মোহর এক সমান হওয়াও স্বাভাবিক নয়। পাত্রীর বোন ও মায়ের মোহরের সমতুল্য মোহর দাবী করার হক পাত্রী পক্ষের অবশ্যই আছে। যদি পাত্র সে বোঝা বহন করতে অক্ষম হয় তাহলে এ বিয়ের আশাই ত্যাগ করতে হতে পারে। কিন্তু পাত্রী পক্ষের নিকট যদি অন্য সবদিক দিয়ে পসন্দনীয় হয় তাহলে শুধু মোহরের বড় অংক দিতে অক্ষম হওয়ার কারণে বিয়ে ভেঙে দেয়াও সঠিক নয়।

'মোহরে ফাতেমী' বলে বাধ্যতামূলক কোনো জিনিস শরীয়তে নেই। রাসূলুল্লাহ'র সময়েও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব বিয়ে হয়েছে সেখানে আর্থিক সঙ্গতির কারণে মোহরানা বিভিন্ন অংকের হয়েছে। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিয়ের মোহরকেই তাঁরা সকলে আদর্শ মোহর হিসেবে অনুকরণ করেছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ঃ কুরআন-হাদীস থেকে জানা যায় যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার স্ত্রী এবং তার সন্তান-সন্ততির জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং বর্তমান জামানায় স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ইসলামের ওপর চালানো যাবে না অথবা তার অবর্তমানে স্ত্রী ও সন্তানেরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের বদ আমলের জন্য তার আখিরাতে মুক্তির অন্তরায় হবে—এ আশংকায় যদি কেউ বিবাহ থেকে দূরে থাকে, তবে সেটা কি ঠিক হবে? তার ওপর বিবাহ ফরয হলে এরূপ করার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে কি?

উত্তর ঃ এ সমস্যার সহজ সমাধান তখনই সম্ভব যদি বিবাহের পূর্বেই এ চেতনার সৃষ্টি হয় এবং ঈমানদার ও সৎ কর্মশীলা মহিলাকে বিবাহ করা সম্ভব হয়। সন্তানদেরকে ইসলামের পথে চালাবার ব্যাপারে মায়ের অবদানই বেশী। যে 'মা' ইসলাম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান রাখে এবং নিজেও তা মেনে চলে সে মায়ের সন্তান শৈশবকাল থেকেই মুসলিম হিসেবে গড়ে ওঠে।

অবশ্য সমাজের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনৈসলামী পরিবেশের প্রভাব সন্তানদেরকে খারাপ পথে টেনে নিতে পারে। সন্তানদেরকে ইসলামী সংগঠনের সংগে জড়িত করলে এ সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার আশা করা যায়। এরপরও পিতামাতার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো সন্তান যদি পথভ্রষ্ট হয় তার জন্য তারা আল্লাহর নিকট দোষী হবে না বলেই আশা করা যায়।

সন্তান পথভ্রষ্ট হবার আশংকা করে বিবাহ থেকে দূরে থাকা আরেক ধরনের পথভ্রষ্টতা। বিবাহ করা ইসলামেরই বিধান। বিবাহ না করলে ফিতরাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আরো বড় ধরনের পাপে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করা ফরয বলে অনুভব করে সে বিবাহ না করলে ফরয তরকের জন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে।

প্রশ্ন ঃ জোর করে মেয়েকে বিয়ে দেয়া কিংবা ছেলেকে বিয়ে করানো সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? অনেক সময় দেখা যায়, ছেলে-মেয়ের মত পরিবর্তনের জন্য বাবা-মা

www.amarboi.org

বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। যার ফলে সন্তানরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত পরিবর্তন করে —এটা কতটুকু বৈধ ?

উত্তর ঃ বিবাহের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান হলো পাত্র ও পাত্রীর ইচ্ছাকৃত সম্মতিতেই বিবাহ হতে হবে। বিবাহ একটি বন্ধন যা উভয়ের সম্মতি ব্যতীত সফল ও সার্থক হতে পারে না। তাই জোর করে মেয়েকে বিয়ে দেয়া বা ছেলেকে বিয়ে করানো ইসলাম সম্মত নয়।

তবে পিতা-মাতার চেয়ে ছেলে-মেয়ের বেশী শুভাকাঙ্খী আর কেউ হতে পারে না। পিতা-মাতা শুধু শুভাকাঙ্খীই নয়, তারাই একমাত্র নিঃস্বার্থ কল্যাণকামী। অপরিপক্ক বয়সে আবেগের তাড়নায় কোনো ছেলে বা মেয়ে বিয়ের ব্যাপারে পিতা-মাতার ওপর নির্ভর না করে নিজেরা পাত্র বা পাত্রী বাছাই করলে তা প্রায়ই যে শুভ পরিণাম বয়ে আনে না—এর ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে।

বুদ্ধিমান পিতা-মাতা বিয়ের ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ের ওপরে জবরদস্তি করেন না। সন্তান যদি পিতা-মাতার অপসন্দনীয় কোনো বিবাহের জন্য জিদ ধরে তাহলে তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে ফেরাবার চেষ্টা করাই উচিত। যদি কিছুতেই ফেরানোর সম্ভব না হয় তাহলে পিতা-মাতাকে ঐ বিয়েতে সম্মত হওয়াই নিরাপদ। কিন্তু পিতা-মাতার নিকট যদি ঐ বিয়ে কিছুতেই পসন্দনীয় না হয় তাহলে জবরদস্তি না করে সন্তানকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া ছাড়া কোনো পথ থাকে না। পিতা-মাতাকে অগ্রাহ্য করেই যদি সন্তান বিয়ে করতে চায় তাহলে এর পরিণাম ভোগ করার জন্য তাকে ছেড়ে দেয়া উচিত। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান সন্তান পিতা-মাতার অভিভাবকত্ব থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হওয়ার সাহস সহজে করবে না।

প্রশ্ন ঃ এক যুবক যদি এক যুবতীকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চায়, শরীয়ত অনুযায়ী তাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত।

উত্তর ঃ শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ের পূর্বে 'ভালোবাসা'র কোনো সুযোগই নেই। যুবক-যুবতী একে অপরের সান্নিধ্যে না আসলে উভয় পক্ষের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক নয়। বিবাহ ব্যতীত তাদের একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে মেলামেশার ফলে বা কোনো রকম যোগাযোগের কারণে একে অপরকে 'ভালোবাসে' বলে মনে করে তাহলে অবিলম্বে তাদের মধ্যে বিবাহ হওয়াই উচিত। তারা যদি শরীয়তের ধারধারে তাহলে বিবাহ ব্যতীত দেখা-সাক্ষাত থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন ঃ বহু বিবাহের ব্যাপারে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী ? বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে মেহেরবানী করে এর জবাব দিন।

উত্তর ঃ বহু বিবাহ ইসলাম বাধ্যতামূলক করেনি। বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এটার প্রয়োজন হতে পারে। আবার ব্যক্তি হিসেবেও কারো কারো প্রয়োজন হতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে অনেক সাহাবা (রাঃ) শহীদ হলেন। ফলে বহু মহিলা বিধবা হলেন। বাচ্চারা এতিম হলো। তাদের সামাজিক পুনর্বাসনের প্রয়োজন হলো। তাই

www.amarboi.org

একাধিক বিয়ের অনুমতি এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজন। আবার আরবে আইয়ামে জাহেলিয়াত-এর যুগে সীমাহীনসংখ্যক বিয়ের প্রচলন ছিল। বহু বিবাহকে সর্বাধিক চার পর্যন্ত সীমিত করে সেই প্রবণতাও রোধ করা হয়েছে। অন্যদিকে হয়ত এক ব্যক্তির স্ত্রী রোগা, সে কারণে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রয়োজন। কারণ ইসলাম মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী এবং মানবিক বিবেচনাকে উপেক্ষা করে না, তবে তাকে লাগামহীন-ভাবে ছেড়ে না দিয়ে সীমার মাঝে বেঁধে দেয়।

ইসলাম বহু বিবাহের হুকুম দেয়নি। প্রয়োজনে অনুমতি দিয়েছে মাত্র। আইয়ুব আমলে এ আইনকে সংশোধন করে চেয়ারম্যানের অনুমতি নেয়ার শর্ত যোগ করা হয়। অতপর প্রথম স্ত্রীর অনুমতির শর্ত দেয়া হয়। ইসলাম এ ধরনের কোনো শর্ত রাখেনি। একাধিক স্ত্রী'র ক্ষেত্রে ইসলামের শর্ত হচ্ছে, তাদের সাথে ইনসাফ করতে হবে। তাদের সাথে সমান ভালোবাসা প্রদর্শন সম্ভব না হলেও ভরণ-পোষণ ও ব্যবহারে সমান মর্যাদা দিতে হবে। ইসলাম একাধিক বিয়েকে যেমন 'উৎসাহ' দেয়নি, তেমনি এটাকে 'ঘৃণ্য বলেও ঘোষণা করেনি।

আইয়ুবের আইনে একাধিক বিবাহ বেআইনী হলো, কিন্তু বিয়ে ছাড়া বহু মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখলেও তার প্রতিবিধান করার জন্য কোনো আইন করা হলো না। বহু বিবাহের অনুমতিকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার কারণে অনেকে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ পায়। ইসলামী আইনে এর অপব্যবহারও রোধ করার বিধান আছে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হলেই তা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ একজন লোকের বয়স ৩০। তার আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। এছাড়া সে যে পরিবেশে বাস করে এতে বিবাহ করলে পর্দা পালন করা মোটেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিবাহের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী ?

উত্তর ঃ আর্থিক দুরবস্থার কারণে বিয়ে করা সম্ভব না হলে বিলম্বেই বিয়ে করবে। (সূরা নূর ঃ ৩৩ আয়াত দ্রঃ)

তবে নিজের নৈতিকমানের দিক থেকে বাধ্য মনে করলে বিয়ে করা উচিত। বিয়ে করে পর্দার ব্যবস্থা করা উচিত। বিয়ে করার পরই পর্দার চেষ্টা সম্ভব। এর আগেই পর্দার ব্যবস্থা চালু করা অসম্ভব।

প্রশ্ন ঃ ধরুন, বিনা দাবীতেই স্বেচ্ছায় শ্বশুর-শাশুড়ী পাত্র-পাত্রীকে কিছু দিলো, পরে দেখা গেল বিভিন্ন সময়ে এগুলো নিয়ে তারা খোটা দিয়ে থাকে। যেমন এত হাজার টাকার জিনিসপত্র দিয়েছি ইত্যাদি। এখন যদি পাত্র এগুলো ফেরত দেয় তাহলে অন্যায়/অনুচিত/অসৌজন্য হবে কি ? (আসলে আমাদের সমাজের অনেকে সামাজিকতা রক্ষার্থেই তা দিয়ে থাকে বলে মনে হয়, মহব্বতের টানে দেয় না। যদি তাই হতো তাহলে এমনটি পরে হয় না/হতো না)।

উত্তর ঃ স্বেচ্ছায় শ্বশুর-শাশুড়ী পাত্র-পাত্রীকে উপহার স্বরূপ যা দেয় তা নিয়ে 'খোটা দেয়া' বা গঞ্জনা দেয়া স্বাভাবিক নয়। স্নেহের দান নিয়ে এরূপ করা অস্বাভাবিক। অন্য কোনো কারণে সম্পর্ক বিনষ্ট হলে অবশ্য এ সবকিছুই হতে পারে।

www.amarboi.org

মহব্বতের সম্পর্ক একমাত্র নিঃস্বার্থতার মাধ্যমেই সঠিক মানে বহাল থাকে। পাত্রীর পিতা-মাতা জামাতাকে ছেলের চেয়েও বেশী স্নেহ করে এবং ছেলের পিতা-মাতা 'বৌকে' মেয়ের চেয়েও বেশী আদর করে থাকে। এটাই মনস্তাত্বিক অবস্থা। কিন্তু চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, মন-মেজাজ ইত্যাদিতে গরমিল দেখা দিলে এ মধুর সম্পর্ক বহাল থাকে না। তখন একে অপরের দোষটাকেই বড় করে দেখে। এ অবস্থায় যদি উপহার নিয়ে খোটা দেয় তাহলে সেই উপহার ফেরত দেয়ার মনোভাব জাগাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম বানানো অসম্ভব। সম্পর্ক বহাল রাখার ইচ্ছে থাকলে উভয় পক্ষকেই সংযত হতে হবে। আর যদি ছাড়াছাড়িই করতে হয় তাহলে তাতে তিক্ততা যতটা কম হয় সে চেষ্টাই করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ বিয়ের সময় পাত্রীর বাড়ীতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ নানা উপহার নিয়ে এসে থাকে। এগুলো কার প্রাপ্য-পাত্রীর, না শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর ?

উত্তর ঃ বিয়ের সময় পাত্রীর বাড়ীতে এবং ওলিমা (বিবাহভোজ)-এর সময় পাত্রের বাড়ীতে মেহমানরা যেসব উপহার দিয়ে থাকে তা বর-কনেকেই দেয়। উপহারে যারা কিছু লিখে দেয় তারা তাদের পরিচয় লিখতে গিয়ে পাত্র-পাত্রীর সাথে সম্পর্কের কথাই উল্লেখ করে। তাদের পিতা-মাতার সাথে কী সম্পর্ক তা সেখানে উল্লেখ করে না। পাত্র-পাত্রীর মামা, খালা, দুলাভাই, বোন ইত্যাদি সব আত্মীয় যা দেয় বর-কনেকেই দেয়, তাদের বাপ-মাকে দেয় না। অবশ্য বিয়েতে পাত্রীর পিতা এবং ওলিমায় পাত্রের পিতাই যাবতীয় খরচ বহন করে থাকে। কিন্তু উপহার তারা দাবী করে বলে কখনো শুনিনি। কোথাও এমন কিছু হয়ে থাকলে পাত্রীর পিতার আর্থিক সংকটের কারণেই হয়ে থাকবে। এটা স্বাভাবিক নয়।

প্রশ্ন ঃ যৌতুক চেয়ে নেয়া জায়েজ কিনা, দিলে নেয়া জায়েজ কিনা ?

উত্তর ঃ ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়া নিতান্ত ছোটলোকি কাজ বলে আমি মনে করি। ভদ্র ভাষায় 'ছোটলোকের' চেয়ে আর কোনো উপযোগী শব্দ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। যৌতুকপ্রথা আমাদের মাঝে হিন্দু সমাজ থেকে এসেছে। হিন্দু সমাজে মেয়েরা অভিভাবকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। তাই মেয়ে বিয়ে দেয়ার সময়ই যতটুকু সম্ভব আদায় করে নেয়া হয়।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী মেয়ে পিতার উত্তরাধিকার পায়। তদুপরি স্ত্রীর ওপর সংসারের ভরণ-পোষণের কোনো দায়িত্ব থাকে না। যৌতুকের বিপরীত ইসলাম মেয়ের জন্য মোহরানার ব্যবস্থা রেখেছে। বর্তমানে যৌতুক প্রথা ছেলের পক্ষ থেকে মোহরানা দাবী করার শামিল যা সম্পূর্ণ হারাম। যারা যৌতুক চায় তাদেরকে সামাজিকভাবে অপমানিত করা দরকার। ইসলামপন্থী ছেলেদের যৌতুক না নেয়া এবং যৌতুক বিরোধী আন্দোলন করা দরকার।

এক শ্রেণীর লোক এটা চালু রেখেছে, যারা হঠাৎ পয়সাওয়ালা হয়েছে। তারা পয়সা দিয়ে ছেলে কিনে। যৌতুক দেয়ার চেয়ে ছেলের পক্ষ থেকে চাওয়া আরও জঘণ্য অন্যায়।

www.amarboi.org

নির্যাতিতা স্ত্রী

প্রশ্ন ঃ একজন নির্যাতিতা স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপায় কী ?

উত্তর ঃ এজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা হতে পারে ঃ

দুপক্ষের মুরুব্বী বা আত্মীয়দের মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে খোলা তালাক হতে পারে। এটাই উত্তম ব্যবস্থা।

কোর্টে স্ত্রী নালিশ করবে। এজন্য প্রয়োজনে স্পেশাল কোর্ট হওয়া দরকার। সেই কোর্টের আওতা ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ মহিলারা বর্তমানে সমাজে সত্যিই বড় নির্যাতিতা। আবার উল্টা আইয়ুবের আইন দ্বারা পুরুষকে নির্যাতিত করা হয়েছে। আল্লাহর আইনকে না বদলিয়ে সমাজের অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগের উপযুক্ত ব্যবস্থাই হওয়া দরকার।

বিয়ের সময় স্বামী স্ত্রীকে জানিয়ে দিতে পারে—'আমার যেমন অধিকার আছে তোমাকে তালাক দেয়ার তেমনি তোমাকে আমি অধিকার দিয়ে দিলাম আমাকে তালাক দেয়ার।' এটাকে তাফবীজ বলে। অবশ্যই এ তালাকের ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। তাই বিয়ের সময় স্বামী স্ত্রীকে এ অধিকার দিলেও বিবাহ বিচ্ছেদের সময় খোলা তালাকের ব্যবস্থা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তালাকের অপব্যবহার রোধ

প্রশ্ন ঃ তালাকের সঠিক পন্থা কি ? এর অপব্যবহার রোধের উপায় কী ?

উত্তর ঃ হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন—'আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য হালাল কাজ হচ্ছে তালাক।'

যদি কোনোভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল না হয় সব রকম চেষ্টার পরও যদি তারা মহব্বতের সম্পর্ক গড়তে অক্ষম হয় তাহলে শুধু শুধু বিয়ের বন্ধনে তাদেরকে আটকে রাখার কোনো যুক্তি নেই। এই অবস্থায় তালাকের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হানাফী মাযহাব মতে তালাক তিন প্রকার ঃ (১) আহসান (২) হাসান ও (৩) বিদঈ। অর্থাৎ সর্বোত্তম, উত্তম ও গর্হিত।

সর্বোত্তম পন্থায় তালাক হচ্ছে, স্বামী তার স্ত্রীকে এমন তুহরে এক তালাক দেবে যাতে সহবাস হয়নি। অতপর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে।

উত্তম পন্থার তালাক, প্রতি তুহরে এক তালাক দেবে। তিন তুহরে তিন তালাক দেয়াও সুন্নাতের পরিপন্থী নয়। কিন্তু মাত্র এক তালাক দিয়ে ইদ্দত পূর্ণ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম।

www.amarboi.org

বিদঈ বা বিদআতী তালাক হচ্ছে, একই সময় তিন তালাক দেয়া অথবা একই তুহরে আলাদা আলাদা সময়ে তিন তালাক দেয়া অথবা হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া। যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হয়েছে এবং যার মাসিক ঋতু হয় তার সম্পর্কে এই বিধান।

এ তিন প্রকারের তালাক আবার ভিন্ন তিন নামে পরিচিতঃ রিজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক, বায়েন তালাক ও মুগাল্লাজা তালাক।

যে পন্থায় তালাক দেয়ার পর স্ত্রী'র অন্য স্বামী গ্রহণ ছাড়া প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারে না তাকে 'মুগাল্লাজা' তালাক বলে। 'বিদঈ' এবং 'মুগাল্লাজা' প্রায় একই ধরনের তালাক। তিন তালাকের মাধ্যমেই এরূপ তালাক হয়ে থাকে তা একসাথে দেয়া হোক অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে।

যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তাকে তুহর অথবা হায়েয যে কোনো অবস্থায় তালাক দেয়া সুন্নাত বিরোধী নয়।

যে স্ত্রীর এখনও মাসিক ঋতু শুরু হয়নি তাকেও সহবাসের পর তালাক দেয়া যেতে পারে। কারণ তারও গর্ভবতী হওয়ার আশংকা নেই।

যে স্ত্রী গর্ভবস্থায় আছে তাকেও সঙ্গমের পর তালাক দেয়া যেতে পারে কারণ সে যে গর্ভবর্তী তা সুনিশ্চিত।

কিন্তু এই চার প্রকারের স্ত্রীলোকদের তালাক দেয়ার সুন্নতি নিয়ম হচ্ছে এক মাস পর পর এক তালাক দেয়া। আরও সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কেবলমাত্র এক তালাক দিয়ে রেখে দেয়া এবং ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার অপেক্ষা করা।

(হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, উমদাতুল কারী, আবু বাকর আল-জাসাসাসের আহকামুল কুরআন)

উক্ত তিন প্রকার তালাকের মধ্যে পরিণতি ও ফলাফলের দিক থেকেও পার্থক্য আছে।

সর্বোত্তম বা উত্তম পন্থায় তালাক দিলে ইদ্দত চলাকালীন সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। এর নিয়মও খুব সহজ। ফিরিয়ে নেয়ার নিয়তে ইদ্দত চলাকালীন সময়ের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে যা সমাধান হয়ে যায়, পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফেরত নিতে চাইলে পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এক অথবা দুই তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মতির ভিত্তিতে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এর জন্য মাঝখানে স্ত্রীলোকটির দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের (তাহলীল)-ও প্রয়োজন নেই এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য মৌলভী ডাকার দরকার নেই। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে ইজাব-কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ)-এর মাধ্যমে সহজেই পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে।

তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় তাহলে তাকে ইদ্দত চলাকালীন সময়ের মধ্যেও ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে না এবং তাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারটিও অত্যন্ত

www.amarboi.org

জটিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে হয়। এই দ্বিতীয় স্বামী যদি কোনো কারণে তাকে তালাক দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে (দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সম্পর্কিত) ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক না দেয় বা মৃত্যুবরণ না করে, তবে এই স্ত্রী প্রথম স্বামীর কাছে আর ফিরে যেতে পারবে না।

বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন বাংলা অনুবাদ সপ্তদশ খণ্ড, সূরা তালাক, ভূমিকা, পৃঃ ১৯৪-১৯৬, টীকা ১-১৮, পৃঃ ১৯৭-২২৬; মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, বাংলা অনুঃ ৩২৭-৩৩১)।

হযরত ওমর (রা)-এর সময় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলো, সে তার স্ত্রীকে একবারে তিন তালাক দিয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে বেত লাগানোর নির্দেশ দিলেন। এই উদাহরণ বর্তমানে প্রযোজ্য। গ্রামাঞ্চলেই এর সাংঘাতিক অপব্যবহার হয়।

তবে সে জন্য কেউ তিন তালাক দিলে তাকে এক তালাক ধরা যাবে না। অনেক সময় কেউ রাগের মাথায় তিন তালাক (বায়েন) দেয়। এরপর সে কিছু সময় পরে স্ত্রী ও সন্তানদের কথা স্মরণ করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তথাকথিত আলেম হিলার নামে সেই স্ত্রীকে অন্য লোকের কাছে বিয়ে দিয়ে দু'দিন পরে তার কাছ থেকে তালাক নিয়ে পুরানা স্বামীর সাথে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে। নিঃসন্দেহে এ ধরনের বিয়ে সুস্পষ্ট জেনা বা ব্যভিচার। বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার পদ্ধতি উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন ঃ সূরা আল-মা'আরিজের ২৯-৩০ আয়াতে দাসীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে —'আর যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে তাদের বিবি বা দাসীদের ব্যাপারে ছাড়া'। এখানে দাসীদের সাথে যৌন সম্পর্কের জন্য নিন্দার পাত্র হবে না বলে বলা হয়েছে। বস্তুতঃ দাসীদের ব্যাপারে কুরআনের এ দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতা কোথায় ?

উত্তর ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা নারী তাদের ব্যাপারে ইসলাম এ বিধান দিয়েছে যে, তাদেরকে যে পরিবারভুক্ত করা হবে সেই পরিবারের যিনি সরকারের নিকট থেকে কোনো বন্দিনীকে গ্রহণ করবেন তার সাথে স্ত্রীর মতই যৌন সম্পর্কে স্থাপন করার অধিকার রয়েছে। সরকারের নিকট থেকে কোনো যুদ্ধবন্দিনীকে যে দাসী হিসেবে গ্রহণ করবে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের বাইতুলমালে পণ্যমূল্যে দিতে হবে। এজন্য যে ব্যক্তির মালিকানায় দাসী থাকবে তিনি ইচ্ছা করলে অন্যের নিকট তাকে বিক্রিও করতে পারবেন। কিন্তু কোনো দাসীর ঘরে যদি কোনো সন্তান পয়দা হয়, তবে তাকে বিক্রি করা নিষেধ।

www.amarboi.org

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—দাসী তো স্ত্রী নয়, তার সাথে কিভাবে যৌন সম্পর্ক হবে ? কোনো মহিলাকে যখন স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন শরীয়তের নির্দিষ্ট নিয়ম মতই বিবাহ করা হয়। এ নিয়মটা আল্লাহই দিয়েছেন। এ কারণেই স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করে না। কিন্তু সেই আল্লাহ-ই যদি দাসীর সাথে স্ত্রীর মতো যৌন সম্পর্ক গড়ার অনুমতি দেয় তাতে আপত্তি করার কী থাকতে পারে ?

প্রশ্ন ঃ যে সকল জীব আমাদের খাওয়া হালাল করা হয়েছে সেগুলো মারা গেলে হারাম হয়ে যায়। কিন্তু মরা মাছ খাওয়া হালাল কেন ?

উত্তর ঃ হালাল এবং হারাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তাদের নিকট ঐসব জিনিসই হারাম যা আল্লাহ হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। আর তিনি যেসব জিনিস হারাম বলে ঘোষণা করেননি তাই হালাল।

আল্লাহ তায়ালা হালাল জিনিসের তালিকা না দিয়ে হারাম জিনিসের তালিকাই দিয়েছেন। কিন্তু কেন একটা জিনিসকে তিনি হারাম করেছেন তার সঠিক কারণ আমাদের জানা না-ও থাকতে পারে। মু'মিনের নিকট কোনো জিনিস কেন হারাম করা হলো সেটা প্রধান বিষয় নয়। মু'মিনের বিবেচনায় আল্লাহর নিষিদ্ধ হওয়াটাই হারাম হওয়ার আসল কারণ।

এ যুক্তি অনুযায়ী 'মরা পশু' আল্লাহ হারাম করেছেন বলেই হারাম। আর 'মরা মাছ' হারাম করেননি বলেই তা হালাল।

মু'মিন হিসেবে উপরোক্ত যুক্তি মেনে নেয়ার পরও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক এতমিনানের জন্য কোনো জিনিস হারাম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা দূষণীয় নয়। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য যদি মু'মিনের এতমিনানের জন্য হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু হারাম হওয়ার যুক্তি বুঝে না আসলে হারাম বলে মেনে না নেয়া ঈমানের খেলাফ। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিয়ে পশু-পক্ষী এবং মাছের মধ্যে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, পশু পক্ষীকে আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করার হুকুম করা হয়েছে এবং একমাত্র জ বেহ করার মাধ্যমেই জীবিত পশুকে মারার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মাছের বেলায় অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়নি বলেই মৃতু মাছকে হালাল করা হয়েছে।

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা পশুর প্রবাহিত রক্তকে হারাম করেছেন। পশু জবেহ করলে ফিনকি দিয়ে যে রক্ত বেরিয়ে যায় সে রক্ত হারাম, কিন্তু গোস্তের সাথে যে রক্ত লেগে থাকে সে রক্ত হারাম করা হয়নি। সম্ভবতঃ এ কারণেই মাছকে জবেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, মাছের মধ্যে ফিনকি দিয়ে বের হওয়ার মতো কোনো রক্ত নেই। পশু ও মাছের মধ্যে আমাদের এ তুলনামূলক আলোচনা অনুমান মাত্র। হালাল-হারামের ব্যাপারে এটা আসল যুক্তি নয়। আসল যুক্তি হলো আল্লাহর নির্দেশ।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ গ্রামাঞ্চলে দাদনী ব্যবসা প্রচলিত আছে। যেমন—কোনো কৃষক ক্ষেতে আখ/পাট থাকতে সে ফসল বিক্রি করে। ফসল ওঠার তিন-চার মাস আগে কৃষক ঠেকাবশতঃ কমদামে ক্ষেতের ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এই দাদনী ব্যবসা জায়েজ কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ ইসলামে এমন কোনো ব্যবসা বা লেনদেন জায়েজ করা হয়নি যেখানে একপক্ষের ঠকার সম্ভাবনা তাকে অথবা কোনো একপক্ষের জেতবার সম্ভাবনা নিশ্চিত থাকে। এ কারণেই জুয়া-লটারী ইত্যাদি ইসলামে হারাম। বিশেষ করে ঐ ধরনের বেচাকেনা হারাম যা একপক্ষকে শোষণ করার নামান্তর। 'দাদনী ব্যবসা' নামে যে ব্যবসার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ফিকাহর পরিভাষায় এ ব্যবসাকে 'বাইয়ে মাজহুল' বলা হয়। মাজহুল অর্থ, অজ্ঞাত। জমিতে ফসল হবে কিনা, গাছে ফুল হয়েছে বলে ফল হবে কিনা এটা অজানা। এই ধরনের বেচাকেনায় ক্রেতা বা বিক্রেতার যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জায়েজ বেচাকেনার জন্য শর্ত হলো, যে বিক্রি করছে তার জানা থাকবে সে কোন জিনিস কী পরিমাণ বিক্রি করছে। আর যে কিনবে তারও জানা দরকার যে, সে কোন জিনিস কী পরিমাণ কিনছে। এই শর্তের অভাবের কারণেই উপরোক্ত ব্যবসা ইসলামে জায়েজ নয়।

প্রশ্ন ঃ উকিলরা আদালাতে বাদী এবং বিবাদীর মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে সত্য ঘটনাকে প্রমাণ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেন। একজন লোককে বিরাট ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য কিংবা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য কিংবা এটা যেহেতু তাদের পেশা সেহেতু অর্থ উপার্জনের জন্য মক্কেলের পক্ষে মিথ্যার সাফাই গাইতে থাকেন। এতে অনেক সময় প্রকৃত দোষী মুক্তি পায়, নির্যাতিত ব্যক্তি ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত হয়। এসব শুধুমাত্র উকিলের বাকচাতুরীর জন্য। এসবের বিনিময়ে উকিল যে অর্থ উপার্জন করে তা কি বৈধ ? ওকালতি পেশা-ইবা ইসলামে বৈধ কিনা ?

উত্তর ঃ আইন ও ন্যায়-নীতি অনুযায়ী আদালতে বিচারককে সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছতে সাহায্য করাই উকিলদের আসল দায়িত্ব। উকিলরা যেসব অপকর্ম করে বলে আপনি উল্লেখ করেছেন তার কোনোটিই নীতিগতভাবে তাদের দায়িত্ব নয়। যে উকিলরা এসব কাজ করেন তারা একদিকে আইনকে ফাঁকি দেন, অপর দিকে বিচারককে বিভ্রান্ত করেন।

ওকালতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে যারা মামলার সত্যতার ভিত্তিতে ওকালতির দায়িত্ব পালনের যোগ্য নন তারাই মামলাটি মিথ্যা জেনেও টাকার লোভে সে মামলা লড়তে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। যারা মামলা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করেন তারা উকিলের কাছে অকপটে সত্য কথাই প্রকাশ করেন। তখন সত্যনিষ্ঠ উকিল মামলাটি মিথ্যা বলে বুঝতে পারলে সেই মামলা গ্রহণ করেন না। কিন্তু আইনকে সাহায্য করা ও বিচারককে ইনসাফ করতে সহায়তা করার পরিবর্তে যারা শুধু পয়সার জন্য মামলা পরিচালনা করেন তারা মক্কেলকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। এ কারণেই

www.amarboi.org

আদালতে সুবিচার পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর যেখানে উকিলরা বিচারকদেরকে ঘুষ দিতে সক্ষম হয় সেখানে সুবিচারের প্রশ্নই ওঠে না। এসব অবৈধ কাজ করে যারা অর্থ উপার্জন করে তা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

ইসলাম অনুযায়ী 'ওকালতি ব্যবসা' অবৈধ নয় বটে, কিন্তু আমাদের দেশের মতো দুর্নীতিপূর্ণ পরিবেশে সৎভাবে ওকালতি করা খুবই কঠিন। গোটা সমাজ ব্যবস্থা যদি দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে খুব কমসংখ্যক লোকই তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আধুনিক যুগে ওকালতি পেশাকে কিভাবে চালু রাখা যাবে তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ লোকদের নিয়ে কমিশন গঠন করে তাদের সুপারিশের ভিত্তিতেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে করীম (সাঃ) বলেন—'তোমাদের মধ্যে যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লেখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয়, তারা সবাই সমান পাপী।'

তিনি আরো বলেছেন—'সুদের গুনাহ সত্তর প্রকার। এর মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হচ্ছে মায়ের সাথে জেনা করার সমান।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যারা মুসলমান বলে দাবী করি এবং নেহায়েত জীবন ধারণের জন্য চাকরী করি তারা সরকারী কর্মচারীদের বেতন বিল হতে সাধারণ ভবিষ্যত তহবিলের জমাকৃত টাকায় পেয়ে বৎসরান্তে নির্ধারিত হারে সুদের হিসাব লিখতে তথা সুদ দিতে বাধ্য হচ্ছি, আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরাও কি সমানভাবে পাপী ? দয়া করে ব্যাখ্যা দিবেন।

উত্তর ঃ আপনি যে বিভাগে কাজ করেন সেটা ব্যাংকের মতো সুদভিত্তিক কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। তাই আপনার এ চাকরী ব্যাংকের চাকরীর সমপর্যায়ে গণ্য নয়। তবে হিসাবরক্ষকের এ বিভাগেও সুদের অংশ লিখতে হয় না এমন পদ যেখানে আছে সেখানে বদলি হবার চেষ্টা করতে পারেন। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সুদের অংক লেখার কাজটি মানসিক অসন্তুষ্টির সাথে এবং দায়ে ঠেকে করছেন বলে মনে করবেন।

যতদিন দেশে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম না হয় ততদিন এ সুদের ব্যাপার ছাড়াও জীবনের সর্বক্ষেত্রে পদে পদে এমনসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যা ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর। যদি কেউ সবক্ষেত্রেই পরিপূর্ণভাবে ইসলামী নীতি মেনে চলতে চায় তাহলে দেশত্যাগ করতে হবে। আর যদি এমন কোনো দেশ না থাকে বা থাকলেও সেখানে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে নিজ দেশে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের জন্য তাকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। তাহলে আশা করা যায় যে, অনৈসলামী সমাজে বাধ্য হয়ে যে সমস্ত ইসলাম বিরোধী বিষয়ে জড়িত হতে হয় তা আল্লাহর নিকট ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হবে।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ আমার এক নিকট আত্মীয় একটি প্রেসের মালিক। তাঁর কাছে অনেকেই এমন কিছু বই-পুস্তক ছাপাতে আসেন, যা ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা। এখন সমস্যা হচ্ছে, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে এসব পুস্তক ছাপানো জায়েজ হবে কি ?

উত্তর ঃ যে কাজ হারাম সে কাজে বিনা স্বার্থে সহায়তা করাও হারাম, আর যদি ব্যবসা লাভের প্রয়োজনে এমন কোনো হারাম কাজের সহযোগিতা করা হয় তাহলে দিগুণ অন্যায় হবে।

ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা বই কোনো ঈমানদার ছাপার জন্য কিছুতেই রাজী হতে পারে না। মুসলমান হওয়ার দাবীদার হয়েও অনেকেই হারাম উপায়ে আয় করে থাকে। কিন্তু ইসলাম বিরোধী বই ছেপে আয় করা শুধু হারামই নয়, ঈমানের জন্যও মারাত্মক। ইসলামের ওপর ঈমান যার নেই সে-ই এমন কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আমরা জানি সুদ হারাম। কিন্তু কোনো শিক্ষা ট্রাষ্ট যদি এরূপ হয় যে, এর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমা আছে এবং ঐ টাকার সুদ থেকে প্রতি বৎসর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজে, মাদ্রাসা) ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। তবে ছাত্র-ছাত্রী কি ঐ টাকা (বৃত্তি) গ্রহণ করতে পারে ?

উত্তর ঃ এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির টাকা সুদ থেকে পেয়েছে বলে যদি জানা না থাকে তাহলে তা গ্রহণ করা দূষণীয় নয়। কিন্ত জানা থাকলে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম মদকে হারাম করেছে, কিন্তু দাসপ্রথাকে রহিত করে দেয়নি। যদিও দাসমুক্তি ও দাসদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, দাসপ্রথাকে মদের মতো স্পষ্টভাবে রহিত করা হলো না কেন ?

উত্তর ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কারণ ছাড়া আর কোনো কারণেই কোনো মানুষকে দাস হিসেবে গণ্য করা যায় না। সে কারণটি হলো ইসলাম বিরোধী যুদ্ধবন্দী। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে কোনো অনৈসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধ হলে সে যুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে যেসব অমুসলিম বন্দী হয় তাদের মধ্য থেকেই কিছু লোক দাস বলে গণ্য হতে পারে। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ইসলামের নিয়ম নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ শত্রুরাজ্যের হাতে যেসব মুসলিম সৈন্য বন্দী রয়েছে তাদের মুক্তির জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে অমুসলিম বন্দীদেরকে বিনিময় হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয় ঃ এরপরও যদি অমুসলিম বন্দী আরো থেকে যায় তাহলে কোনো একটি নির্দিষ্ট অংকের পণমূল্য দিয়ে তাদেরকে দেশের সরকার ছাড়িয়ে নিতে পারে।

শত্রুরাজ্য যদি উপরোক্ত দুই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তাদের সব লোককে ছাড়িয়ে না নেয় তাহলে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে আটক রয়ে গেল তাদেরকে জেলখানায় আজীবন অমানবিক জীবনের জন্য বন্দী রাখা ইসলাম মোটেই ঠিক মনে করে না। তাদেরকে মুসলিম সমাজে মিশে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের পরিবারে বন্টন করে দেয়া হয়। তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করতে হবে সে

www.amarboi.org

বিষয়েও ইসলাম পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়েছেন। যুদ্ধবন্দীদের সাথে এরচেয়ে উন্নত মানবিক আচরণের কোনো নজীর এ পর্যন্ত মানবজাতি রচনা করতে পারেনি।

ঘুষ ও জুয়া

প্রশ্ন ঃ জুয়া হারাম। এর নানান পোশাকী নামে পরিচয় দিন। লটারী ও প্রাইজবণ্ড জুয়ার পর্যায়ে পড়ে কেন ?

উত্তর ঃ লটারী ও প্রাইজবণ্ড প্রভৃতি জুয়া। জুয়া হচ্ছে অর্থোপার্জনের এমন একটা পদ্ধতি যেখানে অনেক লোকে টাকা খাটায়, কিন্তু ফল ভোগ করে একজন বা কয়েকজন। যারা লাভবান হয় তারা কোনো যোগ্যতা বা শ্রমের কারণে তা পায় না, কপাল গুণে পায়। এ জাতীয় কিসমতের খেলাই ইসলামে 'জুয়া' নামে পরিচিত এবং সব রকম জুয়াই হারাম।

হঠাৎ করে যে লাখ টাকা পায় এতে তো তার নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই। হাজার লোকের কিসমত মেরে অল্প কয়েকজন বিনা চেষ্টায় যে লাভ পেলো তা মানুষকে কর্মপ্রেরণা না দিয়ে ভাগ্যনির্ভর করে তোলে। পরিশ্রম না করে এবং যোগ্যতা বৃদ্ধি না করে কী করে পয়সাওয়ালা হওয়া যায়—এ মানোবৃত্তিই এতে প্রসার লাভ করে। তাই এ জাতীয় সবই জুয়ার সংজ্ঞায় পড়ে।

প্রশ্ন ঃ প্রচলিত প্রাইজবণ্ড ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক কিনা ? একে কেউ নাজায়েজ বলছেন। এটা নাজায়েজ হওয়ার কারণ কী।

উত্তর ঃ প্রচলিত প্রাইজবণ্ডের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম লক্ষ্য করলেই এর সম্পর্কে শরীয়তের মতামত বুঝা সহজ হবে। স্বল্প আয় সম্পন্ন লোকদের নিকট হতে জাতীয় উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করাই হচ্ছে প্রাইজবণ্ডের উদ্দেশ্য। যারা হাজার বা লাখ লাখ টাকার অধিকারী তারা টাকা নিয়ে বসে থাকে না। হয় তারা টাকা ব্যবসায়ে খাটায়, না হয় নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকে আমানত রেখে সুদ গ্রহণ করে। কিন্তু অল্প আয়ের লোক টাকা দিয়ে কোনো ব্যবসা করাও সম্ভব মনে করে না। অথচ এই শ্রেণীর লোকেরাও ইচ্ছা করলে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে। ১০ লাখ লোক মাত্র ১০ টাকা করে জাতীয় উন্নয়নে নিয়োগ করলেই ১ কোটি টাকার এক বিরাট মূলধন সৃষ্টি হয়। এভাবে জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাবও সৃষ্টি করা যায়। ব্যক্তি সাধারণের এ পরিমাণ টাকা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগ্রহ করলে বড় বড় উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর মাধ্যমে এ বিরাট কাজ হওয়া সম্ভব বটে। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে জনগণের নিকটে প্রথমে বিশ্বস্ত বলে পরিচিত হতে হয়।

সরকারের ন্যায় নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যদি দেশে শিল্প স্থাপন করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট অল্প টাকার শেয়ার বিক্রি করে তাহলে লক্ষ লক্ষ নাগরিক জাতীয়

www.amarboi.org

উন্নয়নে সহযোগিতা করে দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারের লাভ দ্বারা ব্যক্তিগত-ভাবেও লাভবান হতে পারে। দুঃখের বিষয় যে, সরকার জনগণকে সে সুযোগ না দিয়ে তারা জনগণের বিশ্বস্ততাকে জুয়া জাতীয় কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রাইজবণ্ডের ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেকেই ১০ টাকা করে সরকারের নিকট জমা দেয়ার পর মাত্র কয়েক জনকে লটারীর মারফত ২০ হাজার থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত কতক প্রাইজ দেয়ার যৌক্তিকতা কি ? যারা প্রাইজ পেলো তারা কোন গুণে পেলো ? আর যারা পেলো না, তারা-ইবা কোন দোষে বঞ্চিত হলো ? এটা স্পষ্টই ভাগ্যের খেলা Game of chance. ইসলাম ভাগ্যের এই জাতীয় যাবতীয় খেলাকেই জুয়া এবং শয়তানী কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে।

এখানে এই প্রশ্নটিও বিবেচনা যোগ্য যে, প্রত্যেকেই তার জমাকৃত টাকা ফেরত পাবে অথচ যারা পুরস্কার স্বরূপ অতিরিক্ত টাকাটা পেলো, তাদের সে টাকা কোথা হতে আসলো? আসলে সমস্ত জমাকৃত টাকা ব্যাংকে জমা রাখলে যে পরিমাণ সুদ সকলের নিকট পৌঁছতো সেই পরিমাণ টাকাই পুরস্কার বাবাদ গুটিকয়েক লোককে দিয়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জুয়াড়ী মনোবৃত্তি গড়ে তোলা হলো।

সামান্য সুদের উদ্দেশ্যে ১০/২০ টাকার ন্যায় সামান্য মূলধন কেউই ব্যাংকে রাখে না। তাই সুদের লোভ দেখিয়ে এই টাকা সংগ্রহ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই জুয়ার মাধ্যমে (ভাগ্যের খেলা) বেশী টাকা পাওয়ার লোভ দেখাতে হলো। কিন্তু যে টাকাটা পুরস্কার দেয়া হয় তা মূলত সুদের হিসাব হতেই সংগ্রহ করা হয় যা সকল জমাকারীর প্রাপ্য। সুতরাং প্রাইজবণ্ডে সুদ ও জুয়ার অশুভ মিলন ঘটে।

অথচ এককালে কিছু বেশী টাকা পাওয়ার অনিশ্চিত সম্ভাবনার চেয়ে প্রতি বৎসর শেয়ারের লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ট) পাওয়ার নিশ্চিত লোভ দেখিয়ে এই টাকা সংগ্রহ করা চলতো। কিন্তু শরীয়তের সীমা মেনে চলার যেখানে সিদ্ধান্ত নেই, সেখানে ঐসব জায়েজ পথ সন্ধান বা বিবেচনা করার সম্ভাবনা কোথায়।

মোটাকথা, প্রচলিত প্রাইজবণ্ড ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ আপত্তিজনক। একে জায়েজ বলার চেষ্টা যারা করেন তারা শরীয়তের বিধানের ফাঁক খুঁজে হয়তো শরীয়তকে ফাঁকি দিতে পারেন। কিন্তু জুয়ার স্পিরিট বা মেজাজ যে এতে নিশ্চিতভাবেই বিদ্যমান তা অস্বীকার করার কোনো উপায় তাদের নিকট নেই।

প্রশ্ন ঃ ঘুষ দেয়া জায়েজ নয় জানি। তবে ঘুষ না দিয়ে সৎভাবে ৪/৫ বছর চেষ্টা করেও কোনো চাকরি না পাওয়ায় অন্ন সংস্থানের জন্য চুরি করা ছাড়া উপায় নেই। এমতাবস্থায় ঘুষ দেয়া জায়েজ, না চুরি করা জায়েজ ?

উত্তর ঃ আল্লাহ এমন কোনো বিধান দেননি যা মানুষকে উপায়হীন করে ফেলে। নিরূপায় হয়ে জীবন রক্ষার তাগিদে হারাম খাওয়ার জন্য শরীয়ত তিনটা শর্ত দিয়েছে ঃ

১। একমাত্র জান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হতে হবে।

২। প্রয়োজনীয় পরিমাণের বেশী গ্রহণ না করা।

www.amarboi.org

৩। ঘৃণাসহকারে গ্রহণ, তৃপ্তি নিয়ে ভোগ না করা। হারাম গ্রহণ না করার কারণে কেউ মারা গেলে সে শহীদ হবে।

তবে এ তিন শর্তের আলোকে কেউ করতে চাইলে অনুমতি আছে। নিয়ত ও অবস্থা আল্লাহই দেখবেন। হারাম কখনো হালাল হয় না। তবে ঐ তিন শর্ত হারামের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলে আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে এর গুনাহ ধরবেন না বা তাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না বলে কুরআনে ঘোষণা করেছেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩ আয়াত)

প্রশ্ন ঃ আমি একজন সরকারী চাকরীজীবী। একটা ব্যাপারে উর্ধতন কর্মকর্তা সরাসরি কয়েক হাজার টাকা ঘুষ চেয়েছেন। টাকা না দিলে তিনি কাজটি করবেন না। আর কাজটি না করা হলে আমার চাকরী অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবে। এ মুহূর্তে আমি আমার মন-বিবেকের দ্বিমুখী টানা-পোড়েনে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না। আমার করণীয় কী হবে তার সুরাহা করে দিলে খুশি হবো।

উত্তর ঃ যে ধরনের অনৈসলামী সমাজে আমরা বসবাস করছি তাতে পদে পদে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে এ জাতীয় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে এ দেশে দুর্নীতি এতো ব্যাপক হয়েছে যে, ঘুষ ছাড়া কোনো ন্যায্য অধিকার পাওয়া যায় না। অথচ ঘুষ দিলে অন্যের যেকোনো অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করা যায়। এ অবস্থায় ঈমানদারদের করণীয় কী এটাই প্রশ্ন।

যে ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব অনুভব করে তার পক্ষে এ জাতীয় প্রতিটি সমস্যাকে আল্লাহর পথে অনিবার্য পরীক্ষা হিসেবে মনে করা উচিত এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আশায় আল্লাহর ওপর ভরসা করে সে ঈমানের পথে মজবুত থাকবে। চাকরী ও বিভিন্ন রকমের সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে সে বাধ্য হয়। রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীগণের জীবনে এর জলন্ত প্রমাণ রয়েছে। যদি সেই পথেরই পথিক আপনি হতে চান তাহলে কোনো অবস্থায়ই দুর্নীতির নিকট নতি স্বীকার করবেন না।

কিন্তু যাদের ঈমান দুর্বল তারা আল্লাহর একটা 'কনসেশন' থেকে 'সুযোগ' গ্রহণ করতে চান। সে কনসেশনটি হচ্ছে, আল্লাহ বলেছেন—'যদি কেউ জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে হালাল খাবার পাওয়ার অভাবে অপরাধী মন নিয়ে জান বাঁচানোর পরিমাণ হারাম খাদ্য খায় তাহলে আল্লাহ তার এই গুনাহ মাফ করে দিবেন।

কিন্তু এটা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। এই নীতির ভিত্তিতে আপনার চাকরী রক্ষা যদি জীবন রক্ষার পর্যায়ে পড়ে এবং ঘুষ দিয়ে চাকরী রক্ষা না করলে রুজি রোজগারের আর কোনো উপায় হবে না বলে আশংকা করেন তাহলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ইখতিয়ার আপনার। আপনার জন্য ঘুষ দেয়ার অনুমতি দেয়ার ক্ষমতা আর কারো নেই।

প্রশ্ন ঃ আমি যদি কোনো বিত্তশালী লোকের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করি এবং তা যদি সম্পূর্ণ গরীব-দুস্থদের মধ্যে বিলিয়ে দিই, তবে কি তা ঘুষ বলে গণ্য হবে ? এটা কি করা হারাম ? এতে কি আমি ঘুষখোর হিসেবে বিবেচিত হবো ?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ ডাকাতি করে দান করা এবং ঘুষ নিয়ে তা দান করার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কারণ কোনো ঘুষ দাতা খুশি মনে ঘুষ দেয় না। যেহেতু ঘুষ না দিলে তার কাজটা হবে না সেহেতু বাধ্য হয়েই সে ঘুষ দিয়ে থাকে। কাজ সমাধা করার পরেও যদি ঘুষ দেয় তাহলেও এ কারণেই দেয় যে, এবার ঘুষ না দিলে আরেকবার কাজ আদায় করা যাবে না।

ঘুষ বিত্তশালী থেকেই নেয়া হোক বা গরীব থেকে নেয়া হোক, উভয় অবস্থাতেই তা হারাম। তবে গরীবের থেকে নেয়ার কারণে তার ওপরে যে যুলুম হলো সে কারণে এ ঘুষের শাস্তি আল্লাহ অন্য ঘুষের চেয়ে বেশীও দিতে পারেন।

গরীব-দুঃস্থদেরকে দান করা নিঃসন্দেহে সওয়াবের কাজ। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো সে দান হালাল রোজগার থেকে হতে হবে। হারাম রোজগার থেকে যা দান করা হয় তা আল্লাহর নিকট দান বলে গণ্যই নয়।

অর্থনীতি

প্রশ্ন ঃ আপনি জানেন, সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় টাকা রাখলে নির্ধারিত সময়ের পর নির্দিষ্ট হারে লাভ আসে। এই লভ্যাংশের টাকা আমাদের জানামতে সুস্পষ্ট সুদ। এতদিন যে টাকা রেখেছি তার লাভ অনেক এসেছে। এই সুদের টাকা এখন কী করবো ? এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল সহকারে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর ঃ সুদী ব্যাংকে টাকা রাখলে জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত যে অংক জমাকারীর হিসাবে যোগ হয় তা সুস্পষ্ট সুদ হওয়া সত্ত্বেও এটাকে লাভ বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে—যাতে মানুষ এই হারামটাকে হালাল মনে করে গ্রহণ করে। এটা খুশির বিষয় যে, আপনি এটাকে সুদই মনে করছেন। এখন আপনি জানতে চাচ্ছেন, আপনার হিসাবে ব্যাংকে যে সুদের টাকা জমা হয়েছে তা কী করবেন।

আপনি ইচ্ছা করলে ব্যাংককে বলে দিতে পারেন যে, এই সুদের টাকা আপনি নেবেন না। তাহলে ব্যাংক এ টাকা ব্যাংকের নিজের লাভ হিসেবে জমা করে নিবে। অথবা আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে এ সুদের টাকাটা নিজেই উঠিয়ে এনে সওয়াবের নিয়ত না করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে পারেন। সওয়াবের নিয়ত এই জন্যই করবেন না যে, এ টাকা আপনার হালাল কামাই নয়। আর হারাম উপায়ে উপার্জিত মাল দান করায় কোনো সওয়াব হয় না।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, সুদের টাকা হারাম হওয়ার কারণে যদি আপনি ব্যবহার করতে না পারেন তাহলে গরীবদের জন্য হালাল কী করে হয় ? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, টাকাটা হারাম নয়। যে পদ্ধতিতে টাকাটা গ্রহণ করা হয়েছে সে পদ্ধতিটা হারাম। আপনার কাছে টাকাটা সুদ হিসেবে এসেছে, এটা আপানার জন্য হারাম।

www.amarboi.org

কিন্তু যে গরীবদেরকে আপনি এ টাকা দান করলেন তারা এটা সুদের পদ্ধতিতে আয় করেনি, আপনিও তাদেরকে কোনো টাকার বিনিময়ে সুদ দিচ্ছেন না। তারা এটা দান হিসেবেই পেয়েছে। আর দানের পদ্ধতি হারাম নয়।

এসব ঝামেলায় যারা পড়তে চায়না তারা কারেন্ট একাউন্টেই টাকা রাখে, অন্য একাউন্টে রাখে না। আর যদি অন্য একাউন্টে রাখেও তাহলে ব্যাংককে জানিয়ে দেয়, তার হিসেবে যেন সুদ না হয়। কিন্তু কতক লোক এমনও আছে—যারা মনে করে যে, এ সুদের টাকা দিয়ে ব্যাংককে লাভবান করার চেয়ে গরবীদেরকে দিয়ে দেয়াই বেশী ভালো। এ কারণেই কোন্‌টা করা আপনার পসন্দ সেটা আপনার ওপরেই নির্ভর করবে। কিন্তু এ সুদের টাকা আপনার জন্য অবশ্যই হারাম।

প্রশ্ন ঃ সরকার প্রতি ঈদে উৎসব ভাতা প্রদান করে থাকে। উৎসব ভাতা গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েজ কি ?

উত্তর ঃ এটা নাজায়েজ হওয়ার কোনো কারণ নেই। ঈদ উপলক্ষে বেতনের অতিরিক্ত যে টাকা ঈদ পালনের উদ্দেশ্যে দেয়া হয় সেটাও বেতনের মতো জায়েজ। ভাতা জাতীয় যত রকম টাকা দেয়া হয় কোনোটাই নাজায়েজ হওয়ার কারণ নেই। যেমন চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, দ্রব্যমূল্য ভাতা ইত্যাদি সবই জায়েজ। যেসব কারণে ইসলাম কোনো অর্থ গ্রহণ করাকে নাজায়েজ করেছে তার কোনোটাই এসব ভাতার মধ্যে পাওয়া যায় না।

ইসলাম সুদ, জুয়া, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে অন্যের হক নষ্ট করে সম্পদ দখল করাকে হারাম করেছে। সরকারী ভাতাসমূহ এ জাতীয় আয় নয় এবং এটা হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন ঃ লাভ-লোকসান পরোয়া না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ধার্য করা সুদের নামান্তর। আমাদের জমিতে যে নির্দিষ্ট 'কর' ফসল না হলেও সরকারকে দিতে হয় এটা কি সুদ নয় ?

উত্তর ঃ জমির যে খাজনা সরকার ধার্য করে তা সুদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। অবশ্য বকেয়া খাজনা আদায় করার সময় সরকার বিলম্বে দেয়ার জরিমানা হিসেবে সুদ ধার্য করে। নিয়মিত খাজনা দিলে সুদ ধার্য হয় না।

সরকার জনগণের খেদমত করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তা বিভিন্ন রকমের 'কর' ধার্য করে জনগণ থেকেই আদায় করে নেয়। সেই হিসেবে কর ধার্য করার অধিকার সরকারের আছে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের জমির খাজনা নেয়ার নিয়ম নেই। শরীয়ত অনুযায়ী জমির ফসলের যাকাত (পরিভাষায় উশর) দিতে হয়। ফসল জমিতে উৎপাদিত হলে তার উশর দিতে হয়। যদি ফসল উৎপাদিত না হয় তাহলে তার উশর দিতে হয় না। এতে বুঝা যায় যে, ইসলাম জমির ওপর কোনো 'কর' ধার্য না করে জমির ফসলের ওপর ধার্য করে। এটাই ইসনাফের দাবী।

www.amarboi.org

আমাদের দেশে যে জমির খাজনা ধার্য করা হয়, এটা শরীয়তসম্মত নয়। অবশ্য জমির মালিকানা স্বত্ব প্রমাণের প্রয়োজনে জমির হিসাব রাখার দায়িত্ব সরকারকে পালন করতে হয় বলে মালিকানা হস্তান্তরের সময়ে নতুন মালিক থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে সামান্য কিছু কর নিতে পারে।

অমুসলিম নাগরিকদের যেহেতু উশর দিতে হয় না সেহেতু তাদের কাছ থেকে জমি বাবদ কর নেয়ার অধিকার সরকারের আছে। ইসলামী পরিভাষায় এ করকে 'খারাজ' বলা হয়। জমির উৎপাদন শক্তির ভিত্তিতেই এ কর ধার্য করা হয়।

প্রশ্ন ঃ জাতীয় বাজেটের ৮৫% পরনির্ভরশীল, যা চড়া সুদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকসহ দাতা দেশ ও সংস্থার নিকট হতে আনতে হয়। ইসলামী রাষ্ট্র হলে একথা নিশ্চিত যে, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমবে, কিন্তু জনকল্যাণকর খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। তবু ধরে নিলাম পরনির্ভরশীলতা কিছুটা কমবে, পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হওয়া এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। বিদেশী সাহায্য আনতে হলে সুদ ছাড়া উপায় নেই। এক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে সমস্যার সমাধান করবে ?

উত্তর ঃ ইসলাম মানুষকে যে বিধান দিয়েছে, যদি কোনো ক্ষেত্রে সে বিধান পালন করা বাস্তবে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে মানুষকে অচল অবস্থায় ফেলে দেয়া হয় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যে সমস্ত খাদ্য হারাম ঘোষণা করেছেন সে সমস্ত খাদ্য ছাড়া কোনো হালাল খাদ্য না জোটে তাহলে জীবন বাঁচাবার প্রয়োজনে আল্লাহর আইন অমান্য করার নিয়ত না করে যেটুকু পরিমাণ হারাম খেলে জীবন রক্ষা হয় সেটুকু খাওয়ার অনুমতি কুরআনেই দিয়েছে। হারাম কোনো অবস্থায় হালাল বলে গণ্য হয় না। কিন্তু নিরূপায় অবস্থায় উপরোক্ত শর্তে হারাম খেলে আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ ক্ষমা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

এ নীতি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যদি সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয় তাহলে সেটার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশা রয়েছে।

অবশ্য আন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারে সহজেই সুদকে এড়ানো সম্ভব। শুধু ঋণের ব্যাপারে সুদকে এড়ানো কঠিন হতে পারে। কিন্তু যদি কোনো ইসলামী রাষ্ট্র তার আভ্যন্তরীণ শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের বদলে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়, তাহলে বৈদেশিক ঋণও সুদ ছাড়া পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া যেসব দেশ বৈদেশিক ঋণ দিয়ে থাকে তারা একমাত্র সুদের লোভেই ঋণ দেয় না। সুদ ছাড়াও তাদের আরও অনেক ধরনের স্বার্থ রয়েছে। সেজন্য সুদ না দিলে ঋণ পাওয়াই যাবে না এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা প্রশ্রয় দেয়, আর যাবতীয় অন্যায় ও যুলুম ব্যক্তি মালিকানা হতেই উদ্ভব হয়। সুতরাং সকল অন্যায়-যুলুম, ধনবৈষম্য এবং অসম প্রতিযোগিতা ইসলামেরই সৃষ্ট ফসল। এটা কিভাবে অস্বীকার করা যায় ?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ ব্যক্তি মালিকানাই যুলুম ও শোষণের একমাত্র কারণ বলে কমিউনিষ্ট রাশিয়া সারা বিশ্বে অর্ধশতক বছর থেকে যে প্রচারাভিযান চালিয়েছে সেখানেই ব্যক্তি মালিকানা বহুদিন থেকেই স্বীকৃত এবং বর্তমানে তা আরো ব্যাপক হচ্ছে বলে তারাই প্রচার করছে। মানুষের ফিতরাতের মধ্যেই স্রষ্টা ব্যক্তি মালিকানার আকাঙ্খা সৃষ্টি করেছেন। তাই শৈশব থেকে মানুষের মধ্যে সহজাতভাবেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

শোষণের আসল কারণ শাসকদের রচিত পক্ষপাতমূলক বিধান এবং নিঃস্বার্থ চরিত্রবান ও জনদরদী শাসকের অভাব। এ সমস্যা সমাধানের জন্যই আল্লাহ তায়ালা নবীর-মাধ্যমে মানব জাতিকে একথাই শিক্ষা দিয়েছেন যে, ইনসাফপূর্ণ অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে আল্লাহর রচিত বিধান ও সৎলোকের শাসনই একমাত্র পথ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এরই বাস্তব উদাহরণ দুনিয়ায় রেখে গেছেন।

মানুষ গবেষণা করে যত সুন্দর অর্থ ব্যবস্থাই রচনা করুক, বাস্তবে চালু করতে গিয়ে তাতে অগণিত ত্রুটি ধরা পড়বেই। মানব জাতির ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে যে, স্থায়ী নির্ভুল বিধান রচনার সাধ্য মানুষের নেই। তাই আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নির্ভুল বিধান নাযিল করে মানব জাতির এ সমস্যার সমাধান দিয়েছেন।

যেহেতু আল্লাহর দেয়া সমাধানও নিজে নিজে সমাজে চালু হতে পারে না সেহেতু আল্লাহর বিধান সঠিকভাবে চালু করার উদ্দেশ্যে রাসূলকে একদল সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি করতে হয়েছে। আর সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি করার জন্য 'মৃত্যুর পরপারে দুনিয়ার জীবনের কর্মফল অনন্তকাল ভোগ করতে হবে' বলে চেতনা সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, রাসূলের আনুগত্যের গুরুত্ব এবং আখিরাতের জওয়াবদিহির মজবুত চেতনা ছাড়া সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে না। আর স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই ইনসাফপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, ইনসাফ ও শোষণহীন ব্যবস্থা কায়েমের জন্যই আল্লাহ তায়ালা কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ অর্থনৈতিক সমস্যাই কি মূল সমস্যা নয় ? যদি তা না হয় তাহলে কোন্‌টি মানুষের প্রধান সমস্যা ?

উত্তর ঃ মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব জীব নয়। মানুষের আসল পরিচয় হলো সে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন এক নৈতিক জীব। সে হিসেবে অর্থনৈতিক সমস্যাই মানুষের প্রধান সমস্যা মনে করা উচিত নয়। মানুষকে যারা অন্যান্য জীবের মতো দেহসর্বস্বই মনে করে তারা অর্থনৈতিক সমস্যাকেই প্রধান বিবেচনা করে থাকে।

মানুষের জৈবিক জীবনের অস্তিত্ব বস্তুগত প্রয়োজন পূরণের ওপর নির্ভর করে বলে অর্থনৈতিক সমস্যা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ সমস্যার সমাধানও নির্ভর করে সঠিক জ্ঞানের ওপর। অথচ জ্ঞান 'বস্তু' নয়। বস্তুর দ্বারাই অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান শুধু বস্তু দিয়েই হয় না। কোনো দেশে মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট বস্তুগত উপাদান থাকা সত্ত্বেও

www.amarboi.org

শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি ও সমাজ কাঠামোর অসাম্য অর্থনৈতিক সমাধানে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। শাসন ক্ষমতা যদি সৎ চরিত্রবান ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের হাতে থাকে এবং সমাজ কাঠামোতে মানুষে মানুষে যদি শ্রেণীবিভেদ না থাকে তাহলে অর্থনৈতিক সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিতে পারে না। এর থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জীবনে 'অর্থনীতি' প্রধান সমস্যা নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে সঠিক জ্ঞানের অভাবই প্রধান সমস্যা। সঠিক জ্ঞানের অভাবেই মানুষ তার নিজের সঠিক পরিচয় পর্যন্ত জানতে পারে না। এ সমস্যার সমাধানের জন্যই আল্লাহ পাক নবীর মাধ্যমে মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল জীবন বিধান দান করেছেন। এ জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাই হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের ওপর অর্থনৈতিক সমস্যাসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক যাঁরা বিভিন্ন ধর্মের এমনকি অনেকে কোনো ধর্মকেই বিশ্বাস করে না তাঁরা নিজেদের গবেষণার মাধ্যমে এমন অনেক বস্তু উপকরণ সৃষ্টি করেন—যা পৃথিবীতে মানব জাতির কল্যাণ সাধন করছে। যেমন—ঔষধ, যানবাহন, পোশাক, কৃষি যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি। মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে মানুষের তৈরি করা এসব বস্তু যদি ব্যবহার করা দোষের কারণ না হয়ে থাকে, তবে কোনো মানুষ যদি কোনো জাতি বা দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, কোন আদর্শ বা মতবাদ তৈরি করে বা কায়েম করার জন্য চেষ্টা করে তবে দোষের কারণ কোথায় ? দেখা যায় বিশ্বের যে সমস্ত উন্নত রাষ্ট্র রয়েছে সেখানে মানুষের তৈরি করা আদর্শই প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের জীবন যাত্রার মান অনেক উন্নত। এ ছাড়া মানুষ যে জ্ঞান দিয়ে গবেষণা করে তা আল্লাহরই দেয়া। এ জ্ঞান দ্বারা যা সৃষ্টি হবে তা আল্লাহরই দেয়া জ্ঞানের সৃষ্টি নয় কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চিন্তা ও গবেষণার যে ক্ষমতা দান করেছেন তার ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মানুষ বহু পথ ও মত আবিষ্কার করে। কোনো মত ও পথকে সঠিক মনে করে কিছুকাল সে অনুযায়ী চলার পর যখন বাস্তব ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে তখন আবার চিন্তা-গবেষণা করে নতুন পথের সন্ধান করতে বাধ্য হয়। এভাবেই মানব জাতির ইতিহাসের বিরাট অংশ ভুলের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

এ মহা মুসিবত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবেই আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। যখনই ওহীর শিক্ষাকে মানুষ ভুলে গেছে বা বিকৃত করে ফেলেছে তখনই আবার রাসূল পাঠিয়ে সঠিক পথ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের পর আর কোনো রাসূল পাঠাবেন না বলেই শেষ নবীর নিকট প্রেরিত ওহীকে অবিকৃত অবস্থায় রেখেছেন।

যেসব লোক সঠিক পথের সন্ধান করে তাদের প্রথম কর্তব্য হলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জীবনের সব ব্যাপারে হেদায়াত সন্ধান করা। আর মানব রচিত সকল পথ ও মতকে কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে বিচার করে যতটুকু গ্রহণযোগ্য তা

www.amarboi.org

গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই। বরং যাচাই-বাছাই ছাড়াই মানব রচিত চিন্তা গবেষণার ফসলকে অন্ধভাবে বর্জন করা দূষণীয়। ঠিক তেমনি তা অন্ধভাবে গ্রহণ করা আরও বড় অন্যায়।

প্রশ্নের শেষ দিকে দুটো কথা এমন আছে—যা ওহীর বিচারে সঠিক নয়। তার একটি হলো জীবনযাত্রার মান। আরেকটি হলো সকল জ্ঞানই আল্লাহর দেয়া। জীবন যাত্রার উন্নতমানই যদি আদর্শ হলো তাহলে দুর্নীতির মাধ্যমে উন্নত জীবন কি সমর্থনযোগ্য? ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব, ইনসাফ ইত্যাদির ভিত্তিতে জীবন যাপন করাই আসল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে ঠিক রেখে জীবন যাত্রার মানকে উন্নত করায় কোনো দোষ নেই। আর জ্ঞানের বেলায় সব জ্ঞানই সঠিক নয়। ওহীর কষ্টিপাথরে বিচার করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন জ্ঞান কতটুকু সঠিক। ভ্রান্ত জ্ঞানও অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টি, তাই বলে তা গ্রহণ করা আল্লাহর বিধান নয়। আল্লাহ পাক ভালো-মন্দ সবই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যা মন্দ তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশও তিনিই দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ সরকার যে ভবিষ্যত তহবিলের ব্যবস্থা করেছে সেটা কি সুদসহ নেয়া জায়েজ?

উত্তর ঃ সব ধরনের সুদই নাজায়েজ। টাকা তোলার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বললেন Provident fund-এর সুদটা হিসাব করে দিবে। সুদের টাকার হিসাব পেলে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মধ্যে কোনো দোষ নেই। সুদের টাকা নিজের জন্য খরচ না করলেই হলো। এই অর্থ অভাবী লোকদেরকে দিয়ে দিতে হবে বা শরীয়ত যে পন্থায় তা খরচ করার নির্দেশ দেয় তদনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তা ব্যাংককে ছেড়ে দিলে বরং সুদখোরকে আরও অধিক সুদ খাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হবে। এ ফাণ্ডে চাকরীরত ব্যক্তির বেতনের অংশ জমা করা হলে চাকরীদাতার পক্ষ থেকেও সমপরিমাণ জমা করা হয়। এটা সুদ নয়, এটা বেতনেরই অংশ।

মীরাস (উত্তরাধিকার)

প্রশ্ন ঃ পিতা তার ২/১ জন পুত্রের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে সম্পত্তির অংশ না দিতে চাইলে তা জায়েজ হবে কি না?

উত্তর ঃ পুত্রের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে পিতা পুত্রকে বাড়ী থেকে বের করে দিলেও পিতার মৃত্যুর পর সে এ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। কোনো কোনো পুত্রকে বঞ্চিত করার জন্য পিতা অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে দিলে শরীয়তে তা জায়েজ বলে গণ্য হবে না। পিতা যদি অসিয়ত করে সম্পত্তি দান করতে চায় তাহলে সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগের বেশী দান করতে পারবে না। আর পিতা মারা গেলে শরীয়তমতে যারা ওয়ারিশ হয় তাদের নামে অসিয়ত করা শরীয়তে নিষেধ। যদি কোনো কারণে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করা প্রয়োজন মনে করে তাহলে

www.amarboi.org

অবাধ্য সন্তানকেও প্রাপ্য অংশ দিতে হবে। তবে পুত্র কাফের হয়ে গেলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন ঃ দাদার বর্তমানে পিতার মৃত্যু হলে নাতি-নাতনীদের সম্পত্তি না পাওয়ার নীতি কতটা যুক্তিপূর্ণ ?

উত্তর ঃ আইয়ুব খানের আমলে তালাক ও ফারায়েজের আইন সংশোধন করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী আইনের ওপর জনগণের আস্থা নষ্ট করা এবং মহিলা সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলা। সাধারণত দাদা ইয়াতীম নাতিকে সম্পত্তি দিতে চায়। কারণ পিতৃ হারা নাতির প্রতি তার স্নেহ-মমতা বেশী থাকে। ইয়াতীমের চাচারাই বরং নাতিকে সম্পত্তি দিতে বাধা দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে বলেই শরীয়তে ৩ ভাগের ১ ভাগ সম্পত্তি থেকে ঐসব হকদারদের জন্য অসিয়ত করার ব্যবস্থা রেখেছে যারা সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না। দাদা নাতির জন্য এ ব্যবস্থা অনুযায়ী যাতে অসিয়ত করে যায় সেজন্য জনগণকে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় অবহিত করতে হবে। এমনকি সরকার আইন করে দিতে পারে, যারা অসিয়ত না করে মারা যায় তাদের সম্পত্তি থেকে ইয়াতীমদের জন্য ব্যবস্থা করা যাবে। এ জাতীয় আইন থাকলে অসিয়ত করা সবাই প্রয়োজনীয় মনে করবে।

প্রশ্ন ঃ কারো পিতা মারা যাবার পর পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশ মেয়েরা তখনই পাবে, না মায়ের মৃত্যুর পর পাবে ?

উত্তর ঃ পিতার নামের সম্পত্তি পিতা মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে উত্তরাধিকারী হিসেবে যার যার অংশ পাবে। মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত পিতার সম্পত্তি ভাগ করা মূলতবী থাকার কোনো যুক্তি নেই, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর অংশ থেকে স্ত্রী যে সম্পত্তি পাবেন তিনি মারা গেলে সে সম্পত্তি থেকেও তার ছেলে ও মেয়েরা অংশ পাবে।

প্রশ্ন ঃ জনৈক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে বড় ছেলেকে কিছু সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করে দেন। সেই সম্পত্তির হকদার কি বাকী তিন ভাই-বোন হবেন ? আইনত যদি হকদার না হন এবং বড় ছেলে ভাই-বোনদেরকে সে সম্পত্তি ভাগ করে না দেন তাহলে কি তিনি আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবেন ?

উক্ত সম্পত্তি ছোট ভাই-বোনের না পাওয়ার জন্য পিতা কি দায়ী থাকবেন ? আইনত উক্ত সম্পত্তির হকদার যদি ছোট ভাই-বোনেরা হন এবং বড় ছেলে কুরআনের বিধান অনুযায়ী ছোট ভাই-বোনদের মাঝে ভাগ করে দেন তাহলে পিতা আখিরাতে দায়ী হওয়া থেকে মুক্তি পাবেন কি ?

উত্তর ঃ নবী করীম (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, সন্তানদেরকে কোনো কিছু দান করতে হলে সমানভাবে দান করতে হবে। তাই কয়েক ছেলে-মেয়ে থাকা সত্ত্বেও কোনো এক ছেলের নামে কোনো সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করে দিলে তার জন্য আল্লাহর নিকট দায়ী হতে হবে। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে যারা সম্পত্তিতে অংশীদার হয় তাদের পক্ষে অসিয়ত করতেও রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন।

www.amarboi.org

সম্পত্তির কোনো অংশ দান করা বা অসিয়ত করা ঐসব লোকদের পক্ষেই জায়েজ যারা উত্তরাধিকার সূত্রে অংশীদার হবে না। উত্তরাধিকার সূত্রে অংশ পাওয়ার অধিকারীদের মধ্যে কাউকে সম্পত্তি দান করার কী মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? মৃত্যুর পরে তো সে পাবেই। অন্য অংশীদারদেরকে বঞ্চিত করে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা ছাড়া এ ধরনের দানের আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

পিতার মৃত্যুর পর যার নামে পূর্বে সম্পত্তি লিখে দেয়া হলো তার নামে দেয়া সম্পত্তি পিতার সম্পত্তি হিসেবে ভাগ-বাটোয়ারার জন্য ফেরত দেয়া উচিত। যদি তা না দেয় তাহলে আল্লাহর কাছে দু'জনই দায়ী থাকবে। কিন্তু যদি এ ব্যক্তি সম্পত্তি ফেরত দেয় তাহলে সে দায়মুক্ত হলেও পিতা দায়মুক্ত না-ও হতে পারে। অবশ্য সন্তানেরা যদি পিতার এ ভুলকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে তাহলে আল্লাহ পিতাকেও ক্ষমা করতে পারেন। যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন তাহলে পিতা যে কাজ করে গেছেন তার জন্য তাকে দায়ী হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ দাদার মৃত্যুর পূর্বে পিতা মৃত্যুবরণ করলে মৃত পিতার সন্তানরা কি দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে ? কুরআনের বিধান অনুযায়ী এর ফায়সালা কী ? বর্তমান সরকারের আইন অনুযায়ী যদি পাওয়া যায় তাহলে সম্পত্তি দাবী করা কি জায়েজ হবে ?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদে মৃতের সম্পত্তি তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কে কত অংশ পাবে তা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। যে নীতির ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালা এ অংশ নির্ধারিত করেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বিবেকসম্মত ও হিকমতপূর্ণ। যারা এ যুক্তি ও হিকমত বুঝতে অক্ষম তারাই ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের রদবদলের দাবী করে থাকে। আইয়ুব খানের শাসন আমলে পারিবারিক আইনের নামে কুরআনের উত্তরাধিকার আইনের রদবদল করা হয় এবং দাদা জীবিত থাকাকালে পিতা মারা গেলে নাতিকে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা হয়। এটা কুরআন-হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধী।

আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ওয়ারিশ সূত্রে সম্পত্তির অধিকারী করেননি তাদের জন্যই 'অসিয়ত' সূত্রে সম্পত্তির অধিকারী করার ব্যবস্থা দিয়েছেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওয়ারিসদের পক্ষে 'অসিয়ত' করা নিষেধ করেছেন। অসিয়তের বিধান ঐসব গরীব আত্মীয়ের জন্য প্রযোজ্য—যারা ওয়ারিস নয়। যেমন বিধবা বোন, পঙ্গু বা অক্ষম ভাই, পিতৃহীন নাতি-নাতনী।

এ হিসেবে ইয়াতীম নাতি-নাতনীর জন্য দাদার পক্ষ থেকে অসিয়তের মাধ্যমে সম্পত্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে দাদার যে ছেলে মারা যাওয়ার কারণে তার সন্তানেরা ইয়াতীম হয়ে গেল তাদের প্রতি দাদার মনে জীবিত ছেলেদের চেয়েও বেশী স্নেহ-ভালোবাসা বোধ হওয়ার কথা। সুতরাং ইয়াতীম নাতি-নাতনীদের জন্য অসিয়ত করার পক্ষে দাদার আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। দাদাকে এ বিষয়ে তার জীবিত ছেলেরাই বাধা দিতে পারে এবং এভাবে ইয়াতীম নাতি-নাতনীরা বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এ রকম বাধার সৃষ্টি যারা করে তারা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর

www.amarboi.org

ও শরীয়ত সম্পর্কে বেখবর। এ জাতীয় লোকদের যুলুম থেকে ইয়াতীম নাতী-নাতনীদেরকে রক্ষা করার জন্য আইনের দ্বারা অসিয়তকে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। তা না করে তাদেরকে ওয়ারিশ করার আইন যারা করেছে তারা শরীয়তের বিরোধী কাজই করেছে।

দাদা যদি ইয়াতীম নাতিদের জন্য অসিয়ত না করেই যায় তাহলে বর্তমান আইন অনুযায়ী মামলা করে সম্পত্তি আদায় করার সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ শরীয়ত সম্মত নয় বলে সত্যিকার দ্বীনদারদের এ পথে যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া ইয়াতীমদের পক্ষে আদালতে ফায়সালা পাওয়া গেলেও তাদের জালিম চাচাদের বিরোধিতার কারণে সম্পত্তিতে দখল পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। দখল পাওয়ার জন্য শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং যারা সম্পত্তি দখল করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে সক্ষম তাদের পক্ষে দাদা জীবিত থাকাকালে চাচাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও অসিয়ত করিয়ে নেয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ কোনো আত্মীয় যদি উত্তরাধিকার থেকে পাওয়া সম্পত্তি না দেন, তবে হকদার যদি মামলা করে সে সম্পত্তি নিতে চান, এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্টও হতে পারে। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার জন্য কি হকদার দায়ী থাকবেন ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা নিজে কারো জন্য যে অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা যদি কোনো আত্মীয় দিতে রাজী না হয় তাহলে মামলা করে সে সম্পত্তি আদায় করা দূষণীয় নয়। এর জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার জন্য হকদার ব্যক্তি দায়ী হবে না। তবে হকদার ব্যক্তির তার হক আদায় করার ব্যাপারে সীমালংঘন করা উচিত নয় এবং হক উশুল করার পরও আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ পিতার অবাধ্য সন্তানকে পিতা যদি তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে, তাহলে কি পিতাকে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে ? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর ঃ মুসলিম পিতার সন্তান যে পর্যন্ত কাফির হয়ে না যায় সে পর্যন্ত পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। সন্তান যদি সাবালক হয় এবং কর্মক্ষম থাকে তাহলে অবাধ্যতার কারণে বাড়ী থেকে বের করে দিলেও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ত্যাজ্যপুত্র করার অধিকার পিতার নেই।

পিতা জীবিত থাকাকালে সন্তানের উত্তরাধিকারী হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির যেটুকুই থাকবে সেটুকুতে শরীয়ত অনুযায়ী পিতার অনুগত ও অবাধ্য সকল সন্তান অংশীদার হবে। যদি পিতা অবাধ্য সন্তানকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে অনুগত সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তি রেজিষ্ট্রিকৃতভাবে বন্টন করে দেয় তাহলে অবশ্যই আল্লাহর নিকট দায়ী হবে। কারণ ওয়ারিস সূত্রে যারা সম্পত্তি পায় তাদের জন্য 'উইল' বা 'অসিয়ত' করা জায়েজ নয়।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ সমাজে এমনও লোক আছে যার নিজের ঔরশজাত কোনো ছেলে-মেয়ে নেই, কিন্তু পালক ছেলে-মেয়ে আছে। তার সম্পত্তিতে পালক ছেলে-মেয়েরা কি নিজের ঔরশজাত ছেলে-মেয়ের মতো অংশ পাবে ? না পালকদের জন্য কোনো অসিয়ত করতে হবে ? অথবা সম্পত্তিতে তার ভাই-বোন বা অন্য আত্মীয় স্বজন কে কি ভাবে অংশ পাবে ?

উত্তর ঃ পালিত পুত্র পালক পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। যদি পালক পিতা তাকে সম্পত্তি দিতে চান তাহলে তাকে অসিয়তের মাধ্যমে দিতে হবে। আর অসিয়তের মাধ্যমে তিন ভাগের এক ভাগের বেশী সম্পত্তি দান করা নিষেধ। সুতরাং নিঃসন্তান ব্যক্তির ভাই-বোন বা অন্য আত্মীয় থাকলে তারা হিসাব মতো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

তকদীর

প্রশ্ন ঃ মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বেই তার তকদীর লিখে রেখেছেন। অতএব মানুষ সেই তকদীর অনুযায়ীই কাজ করবে। তাহলে মানুষ অপরাধ করলে আল্লাহ শাস্তি দিবেন কেন ?

উত্তর ঃ তকদীর সম্বন্ধে কুরআন-হাদীস থেকে যে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তা সহজভাবে বুঝতে হলে দুটো কথা জানতে হবে।

প্রথমতঃ গোটা সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে এবং সবকিছু সম্পর্কেই তিনি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন তৈরি করে তা নিজেই চালু করেছেন। এই ব্যাপারে সৃষ্টিজগতে কাউকে তাঁর ইচ্ছা ও নিয়মের বিপরীত কিছু করার ইখতিয়ার দেননি। যেমন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, পশু-পক্ষী ইত্যাদি আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন। ঐ নিয়মই তাদের তকদীর। সূরা ইয়াসিনের ৩৮ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন—সূর্য তার জন্য নির্ধারিত পথে চলছে। এটাই মহাশক্তিশালী মহাজ্ঞানী দ্বারা নির্ধারিত (তকদীর)'

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষের বস্তুগত অস্তিত্ব অর্থাৎ তার শরীরের সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই অন্যান্য সৃষ্টির মতো নির্দিষ্ট নিয়মে বেঁধে দিলেও তার নৈতিক জীবনে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলার জন্য তাকে বাধ্য করে দেননি। মানুষের কথা বলার ক্ষমতা, দেখার ক্ষমতা, খাদ্য গ্রহণ ও হজমের ক্ষমতা, দেহের রক্ত চলাচল ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম-কানুন ইত্যাদি সবই আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের নৈতিক জীবনে ভালো ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যা সঠিক ও বেঠিক, ন্যায় ও অন্যায় ইত্যাদি ব্যাপারে তাকে আল্লাহর দেয়া বিধান মানতে বাধ্য করে দেননি। এ দুটো বিপরীত পথের যে কোনো পথে চলার ইখতিয়ার মানুষকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে মুখে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন, এটা তকদীর। তাই মুখ ছাড়া আর কোনো জায়গা দিয়ে কথা বলার ক্ষমতা মানুষের নেই। কিন্তু একথা বলার শক্তিকে সে সত্য

www.amarboi.org

কথা বলার জন্য ব্যবহার করবে, না মিথ্যা কথা বলার জন্য ব্যবহার করবে, সেই বিষয়ে তাকে আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ কারণেই সে স্বাধীনভাবে সত্য বলার সিদ্ধান্ত নিলে পুরস্কার পাবে আর মিথ্যা বলার ফায়সালা করলে শাস্তি পাবে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালো বা মন্দ যেকোনো কাজ করার ব্যাপারে প্রথমতঃ সেই কাজ করার নিয়ত বা ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী চেষ্টা করার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। কিন্তু ঐ কাজটি সম্পাদন করার ইখতিয়ার তাকে দেননি। মানুষের স্বাধীনতা শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ঐ কাজটি সম্পন্ন হওয়া না হওয়া তকদীরের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে এ কাজটি সম্পন্ন করার সুযোগ দিতেও পারেন, না-ও দিতে পারেন। এটুকু তকদীরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ কাজ করার ইচ্ছা এবং চেষ্টাটুকু তকদীরের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই কোনো ভালো কাজ করার ইচ্ছা করলে এবং সেজন্য চেষ্টা করলে এ কাজটি সম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও পুরস্কার দেয়া হবে। কারণ যেটুকু তার ইখতিয়ার ছিল সেটুকু সে করেছে। তেমনিভাবে যদি কেউ কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা ও চেষ্টা করে তাহলে সে কাজটি সম্পন্ন করতে না পারলেও তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

কোনো কাজ করার ইচ্ছা ও চেষ্টা করার স্বাধীনতা দেয়ার পরও মেহেরবান আল্লাহ এ ব্যবস্থা রেখেছেন যে, মানুষ কোনো ভালো কাজের শুধু ইচ্ছা করলেও কিছু পুরস্কার দেবেন। আর চেষ্টা করলে পূর্ণ পুরস্কারই দেবেন। কিন্তু মন্দ কাজের ইচ্ছা করার জন্য কোনো শাস্তি দেবেন না।

প্রশ্ন ঃ (ক) সূরা হাদীদের ২২ আয়াতে বলা হয়েছে—'দুনিয়াতে তোমাদের ওপর যে কোনো বিপদ পৌঁছে থাকুক না কেন, তোমাদের সৃষ্টির পূর্বেই লাওহে মাহফুজে নির্ধারিত করা আছে'। এ আয়াতের দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, যে সমস্ত মানুষ খারাপ কাজ করে এবং যারা অন্যায় পথে ধাবিত হয় তা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হয়। তাহলে তারা ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হতে চাইলেও তো তারা খারাপ কাজই করবে। কারণ আল্লাহ তাদের সৃষ্টির পূর্বে তা নির্ধারিত করে রেখেছেন।

(খ) মিশকাত শরীফের প্রথম খণ্ডে 'ঈমান পর্বে' একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ রূহ তৈরির পরই বেহেশতীদের ও দোযখীদের তালিকা তৈরি করে রেখেছেন।' সুতরাং যার নাম যে তালিকায় আছে তার স্থান সেখানে। তাহলে আমলের সার্থকতা কোথায় ?

উত্তর ঃ (ক) সূরায়ে হাদীদের উক্ত আয়াতটির অনুবাদ সঠিক হয়নি। আয়াতটির অনুবাদ হলো—'এমন কোনো বিপদ নেই যা দুনিয়াতে কিংবা তোমাদের ওপর পতিত হয় আর আমি তা সৃষ্টির পূর্বেই একটি কিতাবে লিখে রাখিনি।' উক্ত আয়াতের অর্থ এই যে, সবকিছুই আল্লাহর অনন্ত অসীম জ্ঞানে উপস্থিত রয়েছে। আল্লাহ কোনো কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। তাই আল্লাহর নিকট 'অতীত' বা 'ভবিষ্যত' বলে কোনো 'কাল' নেই। মহাকালের সবটুকুই আল্লাহর নিকট 'বর্তমান কাল'।

www.amarboi.org

মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত কে কী কাজ করবে সেটা আল্লাহর অনন্ত অসীম জ্ঞানে জানা রয়েছে। একথা ঠিক নয় যে, আল্লাহর জানা রয়েছে বলে লোকেরা কাজ করে বরং কে কী কাজ করবে তা আল্লাহর জ্ঞানের আদিকালেই জানা আছে। ভালো কাজ হোক, মন্দ কাজ হোক, মানুষ যা করে সেটা আল্লাহর নিকট অজানা নয়। উপরের আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, বিপদ-আপদ যা-ই কিছু আসে তা আল্লাহর অজান্তে আসে না।

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে একথাই জানাতে চেয়েছেন। তারা যেন বিপদ-আপদে পেরেশান না হয়ে দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে থাকে। বিপদ-আপদ আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে আসতে পারে না। বিপদ-আপদ প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার জন্যই আসে। একথাটি সূরা আত তাগাবুনের ১১ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন।

সূরা হাদীদের ২২ আয়াতের অনুবাদ করতে গিয়ে প্রশ্নকর্তা 'লিখিত রয়েছে' এর স্থলে 'নির্ধারিত করা আছে' কথাটি উল্লেখ করেছেন। এর ফলে তিনি ধারণা করেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেকই ভালো মন্দ সব কাজ হয়ে থাকে । অথচ আল্লাহ একথা বলেননি।

একটা কথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালো বা মন্দ কোনো কাজই সম্পন্ন করার ইখতিয়ার দেননি। যে কোনো কাজ করার নিয়ত বা ইচ্ছা করার এবং এর জন্য চেষ্টা করার ইখতিয়ারই শুধু দিয়েছেন। কোনো কাজ সম্পন্ন করা বা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তাই কাজটি সম্পন্ন না হলেও কোনো কাজের উদ্দেশ্যে ইচ্ছা বা চেষ্টা করে থাকলে এর বদলায় পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। কোন্ কাজটি তার দ্বারা সম্পন্ন হবে কি হবে না এটা তকদীরের ব্যাপার। আলোচ্য আয়াতটি তকদীরের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

(খ) যে হাদীসটি অপর প্রশ্নকর্তা উল্লেখ করেছেন তা-ও আল্লাহর অসীম জ্ঞানের সাথেই সম্পর্কিত। আল্লাহ কাউকে দোযখে দেয়ার ফায়সালা করেছেন বলেই সে মন্দ কাজ করে এ ধারণা অমূলক। কারা দোযখে যাওয়ার যোগ্য সেটা অনন্ত অসীম জ্ঞানে আল্লাহর নিকট জানা থাকাটা দূষণীয় ব্যাপার নয়।

কুরআনের কোনো আয়াত বা কোনো হাদীসের এমন অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়—যা গোটা কুরআন ও সুন্নাহর চিন্তাধারা বিরোধী। আল্লাহ তায়ালা রাহমানুর রাহীম। তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করার কোনো যুক্তি নেই যে, ইচ্ছা করেই তিনি কতক মানুষকে দোযখে যাওয়ার যোগ্য হতে বাধ্য করেন।

প্রশ্ন ঃ মুসলিম নামধারী জনৈক ব্যক্তির মতে—'যেহেতু প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর দিন-ক্ষণ ও কারণ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত থাকে, সেহেতু কোনো ব্যক্তিকে খুন করা হলে সেক্ষেত্রে খুনী ব্যক্তির দোষ কোথায় ? কারণ তা তো পূর্বেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত থাকে।'

তার আরো প্রশ্ন 'ইসলাম স্বীকার করে যে কর্ম দ্বারা ভাগ্যকে বদলানো যায় এবং কোনো মানুষের কর্মই নির্ধারিত করে দেয় তার ভাগ্য, সেহেতু এক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য অর্থাৎ তকদীরের গুরুত্ব কোথায় ?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তিকে কেউ খুন করলে খুনীকে এ কারণে শাস্তি দেয়া হয় যে, সে অন্যায় উদ্দেশ্যে খুন করেছে। খুনের কারণে যে ব্যক্তি মারা গেল তার মৃত্যুর জন্য শাস্তি দেয়া আসল উদ্দেশ্য নয়।

একথা সত্য যে, মৃত্যুর দিন-ক্ষণ আল্লাহ নির্ধারিত করেন। যে লোকটি খুন হলো সে আল্লাহর নির্ধারিত সময়ই মারা গেল। সে কেন মারা গেল তার জন্য খুনীকে শাস্তি দেয়া হয় না। সে কেন মারতে গেল তার জন্যই শাস্তি দেয়া হয়।

খুনী কি এ কারণে খুন করতে গেল যে, আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, ঐ লোকের মৃত্যুর সময় এসেছে এবং যেহেতু সে নিজে মরতে পারছে না, তাই তাকে খুন করে মৃত্যুতে সাহায্য করা দরকার ?

প্রকৃতপক্ষে সে তো নিজের কোনো কুমতলবে খুন করেছে। এ কারণেই সে শাস্তির যোগ্য।

এ বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে হলে তকদীর সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শুধু ইচ্ছা করা ও চেষ্টা করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। কিন্তু যে কর্ম সম্পাদনের জন্য মানুষ চেষ্টা করে এর সাফল্য মানুষের ইখতিয়ারে নেই। সে সফল হবে, না বিফল হবে তা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। চেষ্টা করলেই ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার তকদীরে সাফল্য নির্ধারিত হয়ে থাকলে সে অবশ্যই সফল হবে। তা না হলে শত চেষ্টা করার পরও সাফল্য না-ও আসতে পারে।

দুনিয়ার জীবনে কর্ম সম্পাদনে সফল হোক বা না হোক, আখিরাতে মানুষ তার ইচ্ছা ও চেষ্টার বদলে পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। যদি সে ভালো কাজের জন্য চেষ্টা করে থাকে তাহলে দুনিয়াতে সফল না হলেও সে তার পুরস্কার পুরোপুরি পাবে। আর যদি সে মন্দ কাজের জন্য চেষ্টা করে থাকে তাহলে কর্ম সম্পাদন না হওয়া সত্ত্বেও সে অবশ্যই শাস্তি পাবে।

প্রশ্ন ঃ তাকদীরই বড়, না কর্ম প্রচেষ্টাই বড় ? কার ভূমিকা বেশী ?

উত্তর ঃ 'তকদীর' ও 'তদবীর' (কর্ম প্রচেষ্টা) পরস্পর বিরোধী ব্যাপার নয়। দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহ তায়ালা চেষ্টা-তদবীর করারই ইখতিয়ার দিয়েছেন, কিন্তু কোনো কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষমতা দেননি। সম্পূর্ণ করা বা না করা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে এবং আল্লাহর সেই ইচ্ছাটাই 'তকদীর'। 'মানুষের কর্তব্য চেষ্টা করা।' (সূরা তুর ঃ ৩৯ আয়াত)।

যারা এই দুনিয়ার জীবনটাকে আখিরাত থেকে আলাদা করে হিসাব করে তারাই তকদীরের সমস্যা নিয়ে মানসিক যাতনা ভোগ করে। কিন্তু যারা আখিরাতে বিশ্বাসী এদেরকে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, আখিরাতের পুরস্কার বা শাস্তি কর্ম সম্পাদন করার ওপর নির্ভর করে না। ভালো বা মন্দ যে কাজের জন্য মানুষ ইচ্ছা করে ও চেষ্টা

www.amarboi.org

চালায় সে কাজ সম্পন্ন না হলেও ঐ কাজের প্রতিফল তাকে দেয়া হয়। সুতরাং তকদীর আর তদবীর নিয়ে বিতর্ক করা অর্থহীন।

ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন

প্রশ্ন ঃ জিহাদ তো বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের যে সামাজিক অবস্থা তাতে কোন ধরনের জিহাদ করা আমাদের ওপর ফরয হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর ঃ জিহাদ অর্থ চেষ্টা। জিহাদ মানে বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলা করে সব রকমের চেষ্টা করতে থাকা। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে যেটুকু কাজ করা হয় তাই জিহাদ। কাজের অবস্থা অনুযায়ী জিহাদের মর্যাদার-মানের অবশ্যই পার্থক্য হয়। শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক।

ইসলাম কায়েমের জন্য যেখানে যে পর্যায়ের কাজের প্রয়োজন হয় সেখানে সেই পর্যায়ের কাজই জিহাদ। যে নামায পড়ে না, আগে তাকে নামাযী বানাবার চেষ্টা করা জিহাদের মধ্যে গণ্য। আর যে নামায পড়ে তাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম কায়েমের কাজে লাগানোর চেষ্টা করাই জিহাদ।

যে রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা চালানোই জিহাদ। বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ জন মুসলমান। অধিকন্তু তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের বাস্তবায়ন চায়। তাই এখানে দ্বীনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েমের চেষ্টা করা জরুরী। যেহেতু এখানে সেভাবে তা কায়েমের সুযোগ আছে সেহেতু এখানে শুধু নামায রোযার ওয়াজ করলেই জিহাদের দায়িত্ব পুরা হবে না। 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ (ইকামাতে দ্বীন) ও 'খেদমতে দ্বীন' এক কথা নয়।

ব্যাকরণগত দিক থেকে লক্ষ্য করলে জিহাদের অর্থ আরও পরিস্কার হয়। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দের গঠন 'মোফাআলাত' রূপে হলে সেখানে বিরুদ্ধ শক্তির উপস্থিতি বুঝায়। 'জিহাদ' শব্দটি 'মুফাআলাতের' রূপ। এতেই বুঝা যায়, দ্বীন বাধাগ্রস্থ হলে সে বাধাকে অগ্রাহ্য করে দ্বীনকে চালু করার চেষ্টার নামই জিহাদ। দ্বীনকে যতটুকু মানতে বাতিলের আপত্তি নেই, শুধু ততটুকু ক্ষেত্রে দ্বীনের যে খেদমত তা জিহাদের পর্যায়ে পড়ে না। বরং দ্বীনের যে দিকগুলোকে বাতিল বাধা দেয় সেগুলোসহ দ্বীনকে পূর্ণরূপে চালু করার চেষ্টাই জিহাদ।

প্রশ্ন ঃ কোনো কোনো লোক ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক, কিন্তু তাদের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ইসলাম অনুযায়ী চলে না। এ সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ কী ?

উত্তর ঃ প্রশ্নটি ভালো। উঁচু মহল, অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ইত্যাদি পরিবারে এ অবস্থা দেখা যায়। স্ত্রী বোরকা ছাড়া বাজারে যায় আর স্বামী নিজে তসবীহ জপেন। ধার্মিকতা সম্বন্ধে ইসলামের সঠিক ধারণার অভাবেই এরূপ হচ্ছে। পিতা-মাতাকে

www.amarboi.org

ছোট সময় থেকেই ছেলে-মেয়েদের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। ছেলে-মেয়ে বড় হলে তাদেরকে আর মারধর করা যায় না, কিন্তু সংশোধনের চেষ্টা বন্ধ হতে পারে না। চূড়ান্ত চেষ্টা করতে হবে সংশোধনের জন্য। এরপরও সংশোধিত না হলে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। ভদ্রভাবে তাকে বলে দিতে হবে 'তুমি দোযখে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছো, তোমার সাথে সহযোগিতা করে আমিও দোযখে যেতে রাজি নই।'

স্ত্রী'র বেলায়ও একই নীতি প্রয়োগ করতে হবে। সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু হালাল-হারামের ব্যাপারে আপোষ করে চলে জান্নাতের আশা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

প্রশ্ন ঃ নিজে নামায-রোযার পাবন্দ হওয়া সত্ত্বেও ছেলেপেলেদের নামাযের দিকে আকৃষ্ট করা যায় না। ছোট বয়সে নামায-রোযার অভ্যাস করানো সত্ত্বেও শিক্ষিত ও প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর ইসলামের আর ধারই ধারে না। এ অবস্থায় পিতা-মাতার কর্তব্য কী?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নটি আজ প্রায় প্রত্যেকটি দ্বীনদার লোকেরই বাস্তব সমস্যার ইঙ্গিত দান করে। কাজেই সর্বপ্রথম এ অবস্থার কারণ সন্ধান করা দরকার ।

এর প্রথম কারণ হলো সমাজের ইসলাম বিরোধী পরিবেশ। মানুষ সামাজিক জীব। পিতা-মাতার সাহচর্যে যেমন শিশুরা অনেক কিছু শেখে, তেমনি বাড়ীর বাইরে যা কিছু দেখে ও শোনে সেখান থেকেও সবকিছু তারা শিখতে থাকে। তাই অত্যন্ত দ্বীনদার পিতা-মাতার সন্তানও প্রতিবেশীদের ইসলাম বিরোধী চরিত্র অনুকরণ করে। ছেলেপেলেরা পিতা-মাতার চেয়েও অন্যদের সংস্পর্শে বেশী সময় থাকে। যাদের সঙ্গ তারা পায় তাদের মধ্যে সমবয়সীদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী প্রতিফলিত হয়। আমাদের সমাজে অধিকাংশ লোকই ইসলামের বিধান মেনে চলে না। সুতরাং তাদের সন্তানদেরও তাদের মতোই গড়ে তোলা হয়। এসব ছেলেপেলেদের সাথে দ্বীনদারদের সন্তানও মিশতে বাধ্য হয়। কেননা প্রতিবেশীর ছেলেপেলেদের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকা শিশুদের পক্ষে অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী হওয়ায় শিশুরা যখন থেকে স্কুলে-কলেজে শিক্ষা পেতে থাকে তখন থেকেই আস্তে আস্তে বেদ্বীন হওয়ার অভ্যাস শুরু হয়। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মধ্যেও ইসলামী চরিত্রের অভাব ব্যাপক। তাই সেখানে ছেলে-মেয়েদের চরিত্র ইসলাম অনুযায়ী গঠিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

তৃতীয়তঃ বর্তমান সমাজে অশ্লীল নাচ-গান, সিনেমা-ড্রামা ও বিচিত্রানুষ্ঠান, বিকৃত শিল্পচর্চা, উলঙ্গতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, খেলাধুলার বাড়াবাড়ি, জুয়া ও মদের সুযোগ, ঘুষ ও দুর্নীতির প্রশ্রয় ইত্যাদি যাবতীয় অনৈসলামী ক্রিয়াকলাপকে সামাজিকভাবে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। এসবের মারাত্মক প্রভাব থেকে কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী কেন, বয়স্কদেরও বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য।

www.amarboi.org

চতুর্থতঃ আমাদের অধিকাংশ দ্বীনদার পিতা-মাতা ইসলামকে শুধু নামায-রোযা বিশিষ্ট একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম মনে করে সন্তানদেরকে ধার্মিক বানাবার চেষ্টা করেন। তাদেরকে বাস্তব জীবনে ইসলামকে কার্যকরী করার শিক্ষা দেন না। ফলে বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে সমগ্র জীবনের সাথে নামায-রোযার কোনো মিলই যখন তারা খুঁজে পায় না তখন বুদ্ধিমান ছেলেরা নামায-রোযা স্বাভাবিকভাবেই ত্যাগ করে। ইসলামের বিপরীত ভাবধারার চর্চা যখন চারদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ধরে তখন নিরর্থক নামায-রোযাটুকু নিয়ে তাদেরকে শুধু হাস্যাস্পদই হতে হয়। তাই ছোট সময়ে নিষ্ঠার সাথে নামায-রোযা করেও বড় হয়ে অনেকেই নামায-রোযাকে বিদ্রূপ করতে দেখা যায়।

পঞ্চমতঃ কোনো অভ্যাস বা আদর্শের ওপর একা কায়েম থাকার মতো মনোবল খুব কম ছেলের মধ্যেই থাকা সম্ভব। বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং হোষ্টেল জীবনে দ্বীনদার ছেলেদের কোনো কোনো ঐক্যবদ্ধ শক্তি বা সংস্থা থাকে না বলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তারা ক্রমেই বিপথে ধাবিত হয়।

আরো একটি বিশেষ কারণ হলো পিতা-মাতার অবহেলা। বহু দ্বীনদার পিতা-মাতাও ছেলে-মেয়েকে মৃদু তিরস্কার বা ক্ষীণ নসিহত করাই যথেষ্ট মনে করেন। ছেলে কিছু বড় হয়ে উঠলে যখন নামায-রোযার প্রতি অবহেলা করে তখনই দৃঢ়ভাবে এর প্রতিকার না করে অনেক দ্বীনদার পিতা 'পরে ঠিক হয়ে যাবে' মনে করেন। আর যারা দৃঢ় হন তারাও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার দিকে খেয়াল না করে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শন করেন। এদুটো অবস্থাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশোধনের পরিবর্তে সন্তানকে আরও বিকৃত করে তোলে। যখন সামান্য দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেই সংশোধন হয় তখন ঢিল দিলে পরে আর কখনও শক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। আর অত্যধিক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলেও মন ক্রমে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফলে অনেক দ্বীনদার লোকের ছেলে-মেয়ে খোদাকে অস্বীকার করে বিদ্রোহের চরম পর্যায়ে উপনীত হতে দেখা গেছে।

এসব কারণ দূর করা অসম্ভব মনে করে তারা নিরাশ হয়ে বসে থাকেন, বিষয়টি সম্পর্কে তলিয়ে চিন্তা করেন না। সমাজের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব যাদের হাতে তারা যদি দ্বীনদার হন তাহলে সমাজে ইসলাম বিরোধী পরিবেশ সহজে সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং দ্বীনদার পিতা-মাতাকে সমাজের ইসলাম বিরোধী পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করার ও তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। দেশে যারা এরূপ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত তাদের সাথেও এ বিষয়ে সকল প্রকার সক্রিয় সহযোগিতা করা কর্তব্য। নিষ্ক্রিয় দ্বীনদারী দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুসলমান হিসেবে দুনিয়ায় রেখে যাওয়া অসম্ভব।

অবশ্য ইসলাম বিরোধী শিক্ষা ও অনৈসলামী পরিবেশ থেকে সত্যিকারভাবে মুক্তি লাভ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সমাজে পরিবর্তন আসার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এমতাবস্থায় একটি মাত্র উপায়ই উপরোক্ত কারণগুলো থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। দ্বীন ইসলামকে কতক অনুষ্ঠানবিশিষ্ট ধর্ম মনে না করে আল্লাহর দেয়া একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করা উচিত এবং বর্তমান জগতের

www.amarboi.org

প্রচলিত সকল মতাদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে তুলনামূলকভাবে বিচার করে সাধ্যমত প্রত্যেক দ্বীনদারকে ইসলামের 'দায়ী' বা ইসলামের প্রতি 'আহ্বানকারী' হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ যারা ইসলামের দিকে সমাজের অপর লোকদের আহ্বান জানায় তাদের পক্ষে ইসলামের পথে কায়েম থাকা সহজ হয়। এ ধরনের লোকেরা যদি একজোট হয়ে নিজ নিজ স্থানে ইসলামের দাওয়াত ছড়াতে থাকে তাহলে তাদের ওপর ইসলাম বিরোধীদের কার্যকলাপ কোনো প্রকার খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না, বরং তারা ইসলাম বিরোধী যা কিছু দেখবে, তার বিরুদ্ধেই আন্তরিকভাবে বিক্ষুব্ধ হবে।

উপরোক্ত সত্যের ওপর নির্ভর করে দ্বীনদার পিতা-মাতা যদি ছেলে-মেয়েদের ছোটবেলা হতেই ইসলামকে 'জীবন বিধান' হিসেবে বুঝাতে চেষ্টা করেন এবং কলেজ জীবনে প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে ইসলামের কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান তাহলে আশা করা যায় যে, শিক্ষিত ও বড় হয়ে তারা শুধু ইসলামের ওপর কায়েম থাকার যোগ্যই হবে না, বরং ইসলাম কায়েম করার যোগ্যতাও লাভ করতে সক্ষম হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ইসলামের কর্মী হিসেবে জীবন যাপন করার ফলে বেদ্বীন পিতা-মাতার সন্তানও ইসলামের যোগ্য সিপাহীতে পরিণত হয়েছে।

আরও একটি কথা, পিতা-মাতা যদি ছেলেদের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলার সূচনাতেই খোলাখুলি আলোচনা ও যুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলেন তাহলে অনেক সহজেই তাদের সংশোধন করা যেতে পারে। যদি এতেও ফল না হয় তাহলে অবাধ্য ছেলের প্রতি বদমেজাজ প্রকাশ না করে স্থিরভাবে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে। পড়া বন্ধ করে দেয়ার ভয় এবং টাকা-পয়সা না দেয়ার সিদ্ধান্তও দরকার হলে নিতে হবে, কিন্তু কোনো অবস্থায়ই ঢিল দেয়া চলবে না।

প্রশ্ন ঃ পিতা-মাতা যদি ইসলামের কাজ করার জন্য অত্যাচার-উৎপীড়ন করেন, তবে কী পন্থা অবলম্বন করা উচিত ?

উত্তর ঃ দুনিয়ায় সন্তানের জন্য পিতা-মাতার চেয়ে আর কোনো মানুষই অধিক মঙ্গলাকাঙ্খী হতে পারে না। নিজে কষ্ট করেও পিতা-মাতা সন্তানকে সুখ দিতে চেষ্টা করেন। এই পিতা-মাতাই যখন ইসলামের কাজে বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় তখন সন্তানের জন্য এটা বড়ই পেরেশানীর কারণ হয়। কিন্তু সন্তানকে মনে রাখতে হবে যে, এখানেও তার পার্থিব উপকারের নিয়তেই পিতা-মাতা বাধা দিয়ে থাকে। তাঁদের বুঝার ভুলের এবং ইল্‌মের অভাবের কারণেই এরূপ হয়ে থাকে, সৎ নিয়তের অভাবে নয়।

উক্ত অবস্থায়ও আল্লাহ পাক পিতা-মাতার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার ও পথ প্রদর্শনের হুকুম করেছেন। পিতা-মাতার অত্যাচার-উৎপীড়নকে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বরদাশত করা এবং পূর্বের চেয়ে তাদের অধিক খেদমত করার চেষ্টা করা উচিত। তাঁদের যেন আল্লাহ বুঝার তৌফিক দেন সেজন্য দোয়া করাও দরকার। কিন্তু তাঁদের নিকট সন্তানের তাবলীগ বা ওয়াজ করা উচিত নয়। মাতাকে বুঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু পিতাকে নিজে বুঝাবার চেষ্টা না করে এমন কোনো লোকের মারফতে বুঝানো দরকার যাকে পিতাও সম্মান করেন। পিতা-মাতার সঙ্গে এমন ব্যবহার

www.amarboi.org

করতে থাকার সময় ইসলামের কাজ মুলতবী রাখা ঠিক নয়। কোনো অবস্থাতেই কারো উৎপীড়নে ইসলামের কাজ হতে বিরত থাকা চলবে না। অবশ্য প্রয়োজনবোধে কাজের ধরন বদলাতে হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তাফহীমুল কুরআনে সূরা লোকমান-এর ১২-১৯ আয়াত ও তার ব্যাখ্যা পড়ুন।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী প্রতিষ্ঠানকে যারা ধ্বংস করতে চায় তাদের সাথে কী আচরণ করা উচিত ?

উত্তর ঃ যে সমাজে আল্লাহর বিধান ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত জারি নেই সেই অনৈসলামী পরিবেশে ইসলামের জন্য কাজ করতে গেলে এমন বহু মুসলিম নামধারী ব্যক্তিরও দেখা পাওয়া যায় যারা ইসলামের খেদমতের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলদের আদর্শ অনুসরণ করাই একমাত্র পথ।

যারা ইসলামী প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে কিছু কাজ করে সময় নষ্ট করা মোটেই উচিত নয়। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তাদেরকে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেখানে ইসলামী শক্তি প্রবল নয় সেখানে বিরোধী দলকে 'চরিত্র' বলেই জয়ের চেষ্টা করতে হবে। সর্বশেষ নবী ১৩ বছরের মক্কী জীবনে বিরোধীদেরকে সহ্যই করে গেছেন।

আসল কথা হলো, ইসলামী শক্তি জয়যুক্ত হওয়ার আগে ইসলামী কর্মীদের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য এসব বাধা-বিঘ্ন খুবই দরকারী। বিরোধীদের বাধা সত্ত্বেও যারা ধৈর্যের সঙ্গে ইসলামের কাজে এগিয়ে যায় তারাই সত্যিকার কর্মী। গালির জবাবে যুক্তিপূর্ণ উত্তর দেয়া, ক্রোধ দমিয়ে রাখতে পারা, লোকদের ভালোবেসে বোঝানোর চেষ্টা করা ইত্যাদি গুণাবলী সৃষ্টি হবার সুযোগই থাকবে না যদি ইসলামের কাজে বাধা দেবার লোক না থাকে। সুতরাং ইসলামী প্রতিষ্ঠানকে যারা ধ্বংস করতে চায় তাদেরকে কিছু করার চিন্তা না করে এ অবস্থায় ইসলামের কাজ কিভাবে করা যায় সেই চিন্তা করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ যদি কেউ গভীর জঙ্গলে গিয়ে খোদার ধ্যানে মগ্ন হয়, তবে তার সে আরাধনায় খোদা কি সন্তুষ্ট হবেন ? এ ব্যাপারে শেখ ফরীদ ও নিজামুদ্দীন আউলিয়ার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উত্তর ঃ আল্লাহ পাক কোন্ ধরনের ইবাদাতে সন্তুষ্ট আর কোন্ ধরনের আরাধনায় অসন্তুষ্ট সে কথা মানব জাতিকে শিক্ষাদান করার জন্যই তিনি নবী ও রাসূল পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। নিজের খুশীমতো খোদাকে ডাকার নাম ইবাদত নয়। আল্লাহ পাক যে কাজ যে সময়ে যেভাবে এবং যে পরিমাণে সমাধা করার বিধান দিয়েছেন সেই কাজ সে সময় কিভাবে ও কি পরিমাণে করলে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন, সে বিষয় মানব জাতিকে বাস্তব শিক্ষা দান করার প্রয়োজনে মানুষের মধ্য থেকেই তিনি কতক পবিত্র আত্মা ব্যক্তিকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সেই রাসূলগণেরই

www.amarboi.org

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁকে মানব জাতির আদর্শ বলে কুরআন পাকে ঘোষণা করেছে।

মানুষের জন্য আল্লাহর নিজস্ব মনোনীত আদর্শ ব্যক্তি রাসূলে করীম (সাঃ) ওহী লাভ করার পূর্বে সাময়িকভাবে হেরা গুহায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থেকে ছিলেন, কিন্তু ওহীর মারফত দ্বীন ইসলামকে দুনিয়ার বুকে কায়েম করার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করার পর তিনি জঙ্গলে বসে আল্লাহর ধ্যান করেননি। তিনি সাহবায়ে কিরামকেও ধ্যান করার জন্য বনে-জঙ্গলে পাঠাননি। তিনি মানব জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্ম আল্লাহর মর্জিমতো করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং তিনি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন—'ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই।' নামায-রোযা, যিকর ও তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ও তওবা ইত্যাদি মানব জীবনের কর্ম-চাঞ্চল্য থেকে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান নয়। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামে এসব ইবাদতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব ইবাদত বাড়ীতে এবং মসজিদেই করার নির্দেশ। এর জন্য বনে-জঙ্গলে যাওয়ার কোনো বিধান নেই। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধান জারি করে আল্লাহর খলীফা হওয়ার দায়িত্ব পালন করাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ধ্যান ও আরাধনা এ খেলাফতের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই। যারা আসল উদ্দেশ্য ভুলে আল্লাহ ধ্যানকেই চরম লক্ষ্য করে নেয় তারা আর যাই করুক, রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ করে না।

একথা নীতিগতভাবে স্বীকার করে নেয়ার পর প্রশ্ন জাগে—'বহু বিখ্যাত বুজর্গ ও সাধকের জীবনীতে বৈরাগ্যের নজীর পাওয়া যায় কেন? যদি ইসলাম বৈরাগ্য সমর্থন না করে তাহলে তাদেরকে বুজর্গ মনে করা ঠিক নয়। আর যদি তারা বুজর্গ বলেই স্বীকৃত হন, তাহলে ইসলামে বৈরাগ্য আছে বলে মেনে নিতে হয়।'

এ প্রশ্নের সহজ জবাব এই যে, কোনো বুজর্গ আমাদের জন্য আদর্শ নন, একজন সম্মানিত ব্যক্তি মাত্র। আল্লাহ পাক একমাত্র রাসূলকেই আমাদের আদর্শ হিসেবে মনোনীত করেছেন।

একথাও মনে রাখা দরকার যে, সাহাবায়ে কেরাম, ইমামগণ ও অন্যান্য বুজর্গদের নিকট থেকে একমাত্র রাসূলের আদর্শই শিখতে হবে। রাসূল ছাড়া আর কোনো লোককে একচ্ছত্র আদর্শ মানা যেতে পারে না। রাসূলকে কিভাবে অনুসরণ করা উচিত সে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চয়ই আমাদের আদর্শ। কিন্তু সে আদর্শ রাসূলের অনুসরণের জন্যই। রাসূল ব্যতীত আর কোনো মানুষকে এজন্য আদর্শ মানা চলে না। রাসূল ছাড়া আর কেউ নির্ভুল ওহী দ্বারা পরিচালিত নয় এবং অন্য কোনো মানুষ সর্বদিক দিয়ে পূর্ণ হতে পারে না। বুজর্গেদের মধ্যেও বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন জন উন্নতগুণের অধিকারী হন। কিন্তু একজন লোকের সব গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র রাসূলের মধ্যেই সকল গুণের সমাবেশ ও পূর্ণতা সম্ভব। তাই কোনো অপূর্ণ ব্যক্তি আদর্শ হওয়ার যোগ্য নয়।

www.amarboi.org

শেখ ফরীদ ও নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রাহঃ) এবং অন্যান্য মুসলিম সাধকদের সত্যিকার জীবনী খোঁজ করে পাওয়া মুশকিল। কুরআন, হাদীস ও ফিকহ ইত্যাদি বিভিন্ন জ্ঞানের শাখা-প্রশাখার যারা সাধনা করেছেন, তাঁদের অসংখ্য ছাত্রদের মারফত তাঁদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনেকখানি জানা সম্ভব। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনের প্রতিটি বিষয় ও অবস্থায় সত্যতা যাচাই করার জন্য মুহাদ্দিসগণ যে কঠোর সাধনা করেছেন তেমনিভাবে কোনো ইমামের জীবনকে নিয়ে গবেষণা হয়নি। আর যারা ইসলামের আদর্শকে কায়েম করার জন্য কোনো আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, তাদের জীবন সম্পর্কেও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য খবর পাওয়া সম্ভব। কারণ তাদের সংগ্রামী সহকর্মী ও সাগরেদগণ ইলমের চর্চা করার ফলে তাদের নেতাদের মর্তবা বা মর্যাদা সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেন না। কিন্তু যে সাধকগণ দ্বীনি ইলমের চর্চা বা দ্বীনকে কায়েমের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেননি, তাদের ভক্তদের মধ্যে সর্বসাধারণের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে। ফলে তাদের শিষ্য-সাগরেদগণ নানা প্রকার অলীক কাহিনী সৃষ্টি করে ঐসব সাধকদের প্রকৃত অবস্থাকে এতটা বিকৃত করে তোলে যে, পরবর্তীকালে তাঁদের অলৌকিকত্ব ও কেরামতির গল্পগুলোই তাদের প্রকৃত জীবন বলে পরিচিত হয়।

শেখ ফরীদ বা নিজামুদ্দীন আউলিয়া যে সংসার ত্যাগী হয়ে বনে-জঙ্গলে খোদার ধ্যান করে ফিরেছেন একথা সত্য বলে প্রমাণ করা যেমন কঠিন, তেমনি মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করাও সহজ নয়। সুতরাং প্রত্যেক বুজর্গ ও সাধকের জীবনে যেটুকু রাসূলের আদর্শের সাথে মিলে সেটুকুই সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত এবং কোনো ব্যক্তির মধ্যে রাসূলের আদর্শের বিপরীত জীবনধারা দেখা গেলে তাকে সেক্ষেত্রে অনুসরণ না করাই উচিত।

প্রশ্ন ঃ আমি ইসলামী আন্দোলনের একজন সাথী ছিলাম। স্বাস্থ্যগত ও অসলসতার কারণে সংগঠন থেকে ছিটকে পড়ি। এরই মধ্যে শয়তান আমাকে চতুর্দিক থেকে গ্রাস করে ফেলেছে। আমি ফরয ও ওয়াজিবসমূহ পালন করি ঠিক, কিন্তু এর দ্বারা আমার মনের কালিমা দূর হচ্ছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি নামায পড়ি, কিন্তু নামাযরত অবস্থায় আমার মন কুফরীর সয়লাবের দিকে তীব্র গতিতে চলে যায়। আমি চাই প্রাণ ভরে ইবাদত করতে কিন্তু শয়তান আমাকে তা করতে দেয় না। আমি যখন কোনো ইবাদতে শামিল হই বা নীরব থাকি, শয়তান তখন আমার মনের মধ্যে কুফর ও শিরকমূলক অনেক কথার উদ্রেক করে। শয়তানী প্ররোচনা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেও পারছি না। 'লা হাওলা' বলে তাওবা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছি।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরার কারণেই কি শয়তান সুযোগ পেলো ? দয়া করে পাপাচার ও শয়তানী চিন্তা থেকে আমাকে বাঁচার পথ দেখাবেন। হেদায়েত নসীব হওয়ার জন্য আমি আপনার পবিত্র দোয়া কামনা করি।

উত্তর ঃ নবী করীম (সাঃ) ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যোগ্য লোক তৈরী করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা হচ্ছে ইসলামী দাওয়াতের কাজ।

www.amarboi.org

যারাই রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনতেন, তিনি তাঁদেরকে দাওয়াতের কাজে নিযুক্ত করতেন। রাসূল (সাঃ) যে কথা বুঝিয়ে কোনো লোককে ঈমান আনার সুযোগ দিতেন সেই কথা অন্যকে বুঝিয়ে ঈমান আনার সুযোগ দেয়ার জন্য প্রতিটি ঈমানদারকে তাগিদ দিতেন এবং এই কাজের মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ)-এর দ্বীনি সংগঠন গড়ে ওঠে। যারা দাওয়াতি দ্বীনের কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়োজিত থাকে তাদের দাওয়াতে অন্য লোক ঈমান আনুক বা না আনুক এই দাওয়াতের কাজেরই এমন সুফল যে দায়ী ইলাল্লাহর নিজের জীবনে দ্বীনি উন্নতি স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা মওদূদী (রাহঃ)-এর 'ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি' বইটি পড়া দরকার।

আজকাল আমাদের সমাজে মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। এক ধরনের হচ্ছে 'দ্বীনি মাদ্রাসা' আর অন্য ধরনের হচ্ছে পীরের খানকা।' কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর পদ্ধতি ছিলো 'দাওয়াতে দ্বীন।' যদি আমাদের মাদ্রাসা এবং খানকাগুলো দাওয়াতে দ্বীনের কর্মসূচীকে লোক তৈরির কর্মসূচীর মধ্যে শামিল করেন তাহলে আরও উন্নতমানের ঈমান, ইলম ও আমল আশা করা যায়।

প্রশ্নকর্তা দাওয়াতে দ্বীনের একটি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ইবলিসের এই ভরসা হয়েছে যে, তাকে এ দাওয়াতের কাজ থেকে সরিয়ে রাখা যাবে। এ কারণে শয়তানের এ প্রচণ্ড হামলা। দাওয়াতে দ্বীনের সংগঠনে ফিরে যাওয়া ছাড়া শয়তানকে প্রতিহত করার আর কোনো উপায় নেই।

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর জামানায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রামে বাধা আসতো কাফের ও মুশরিকদের পক্ষ হতে। বর্তমান জামানায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রামের বাধা আসে একশ্রেণীর সাধারণ মুসলমান, সমাজে প্রতিষ্ঠিত একশ্রেণীর বড় বড় আলেম, তাবলীগ জামায়াত, কওয়ামী মাদ্রাসা, অধিকাংশ মসজিদের ইমাম এবং দু'তিনটে ইসলামী দল হতে। উল্লেখিত বাধাসমূহ আমরা কিভাবে বিবেচনা করবো এবং সাধারণ লোকদের আমরা কিভাবে বুঝাবো ? এত বাধার সম্মুখে আমাদের করণীয় কী ?

উত্তর ঃ কোনো নবী তখনই দুনিয়ায় এসেছেন যখন পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা মানুষ ভুলে গেছে। তাই নবী নতুনভাবে আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে মানুষকে যখন আল্লাহর দিকে ডেকেছেন তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজের বিভিন্ন রকম কায়েমী স্বার্থ তার বিরোধিতা করেছে। এই কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে ধর্মীয় নেতারাও শামিল ছিলেন। এই ধর্মীয় নেতারা পূর্ববর্তী নবী বা নবীদের নামেই ধর্মীয় নেতৃত্ব দিতো বটে। কিন্তু তা নবীর শিক্ষা অনুযায়ী হতো না। শেষ নবী (সাঃ)-এর সময়েও ইয়াহুদী ও নাসারাদের ধর্ম নেতারা রাসূল (সাঃ)-এর একইভাবে বিরোধিতা করেছে। জনসাধারণের বিরোধিতা সাধারণতঃ কায়েমী স্বার্থবাদীদের সৃষ্ট বিভ্রান্তির ফলেই হয়ে থাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ যখন নবীর

www.amarboi.org

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তখন তাদের প্রভাবাধীন সাধারণ লোকও না বুঝেই বিরোধিতায় শরীক হয়েছে।

'জামায়াতে ইসলামী' শেষ নবী (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে দুনিয়ায় কায়েম করার চেষ্টা করেছে। চিরাচরিত নিয়মে এই যুগের সকল কায়েমী স্বার্থবাদীরা তার বিরোধিতা করছে বলে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যারা বিরোধিতা করছে তাদের মধ্যে কাফের-মুশরিক যেমন আছে, মুসলমান কায়েমী স্বার্থবাদীও তেমন আছে। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিরোধিতা খুব কমই আছে এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রভাবের দরুনই বিরোধিতা করছে।

তবে নবী করীম (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে দৃষ্টিতে দেখেন, অন্যদের পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীদেরকে একই দৃষ্টিতে দেখার কথা নয়। কারণ আল্লাহর নবীদের নিদর্শন এতো স্পষ্ট যে, এর বিরোধিতার পক্ষে হীন স্বার্থপরতা ছাড়া কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু নবী ছাড়া অন্য মুসলমানদের পরিচালিত আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েও বিরোধিতা করা সম্ভব হতে পারে। তাই নবীর বিরোধীদের সমমানে তাদের সম্বন্ধে কুধারণা পোষণা করা উচিত নয়।

আসল বিষয় হলো যারা বিরোধিতা করছে তারা কী নিয়তে এই বিরোধী ভূমিকা পালন করছে সেটার সঠিক বিচার আল্লাহই করবেন। ধর্মীয় মহলছাড়া যারা বিরোধিতা করছে তারা নিঃসন্দেহে দুনিয়ার স্বার্থেই করছে। কিন্তু ধর্মীয় মহলের পক্ষ থেকে যারা বিরোধিতা করেন, তাদের সবার অবস্থা এক নয়। তাদের কেউ ইসলাম সম্বন্ধে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ধারণা রাখেন বলেই ইসলাম সম্পর্কে জামায়াতের ব্যাপক ধারণার প্রচারকে পছন্দ করেন না। আবার কেউ জামায়াতের প্রচারিত ইসলাম সম্বন্ধে ভালোভাবে না জেনেই এই কারণে বিরোধিতা করেন যে, তাদের কোনো বড় উস্তাদ জামায়াতকে অপছন্দ করেছেন।

এসব বিরোধিতা দেখে ধর্মীয় মহলের থেকে যারা বিরোধতিা করেন তাদের সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য করা উচিত নয়। তাদের নিকট জামায়াতের সঠিক পরিচয় তুলে ধরা এবং জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করাই উচিত।

প্রশ্নকর্তার এ ধারণা ঠিক নয় যে, তাবলীগ জামায়াত, কওমী মাদ্রাসা, অধিকাংশ মসজিদের ইমাম জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী। প্রশ্নকর্তার এলাকায় এ রকম হয়েও থাকতে পারে, কিন্তু সারাদেশে এ অবস্থা নয়। তাবলীগ জামায়াতের কোনো কোনো ব্যক্তি বিরোধিতা করে থাকতে পারে, কিন্তু জামায়াত হিসেবে আজ পর্যন্ত 'তাবলীগ জামায়াত' প্রকাশ্যভাবে 'জামায়াতে ইসলামীর' বিরোধিতা করতে দেখা যায়নি। তেমনি কওমী মাদ্রাসার মধ্যে কিছু কিছু আলেম বিরোধিতা করলেও সকলেই বিরোধী নন। ইমাম সাহেবানদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক বিরোধী থাকতে পারেন। বড় আলেমদের মধ্যে

www.amarboi.org

কয়েকজন মাত্র বিরোধিতা করে থাকেন। দেশে লক্ষাধিক ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এ পর্যন্ত যাদের নাম জামায়াতের বিরোধীদের হিসেবে ধরা যায় তাদের সংখ্যা নগণ্য।

ইসলামী দল হিসেবে পরিচয় দিয়েও যারা প্রকাশ্যে জামায়াতের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তারা এ আচরণ দ্বারা জনগণের নিকট সুনামের অধিকারী হতে পারেন না। জামায়াত তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাও করে না। তাই তারা একতরফাভাবে জামায়াতের বিরুদ্ধে কথা বলে নিজেদের মর্যাদাই বিনষ্ট করেছেন। বিশেষ করে তাদেরকে ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকাই পালন করতে দেখা যায় না বলে ইসলামের দুশমনেরাও তাদের বিরোধিতা করে না—যেমন ইসলাম বিরোধী সংগঠনকে জামায়াতের বিরুদ্ধে মারমুখী দেখা যায়। তারা জামায়াত বিরোধী ইসলামী দলকে তাদের সহযোগী বলে মনে করে। এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ইসলামী দল হিসেবে পরিচয় দেয়ার পরও ইসলাম বিরোধী যারা তাদের সম্পর্কে কোনো বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে না।

যারা ইকামতে দ্বীনের কাজে আন্তরিকতার সাথে নিয়োজিত আছেন তাদেরকে নিজের কাজে ইতিবাচক ভূমিকায় ব্যস্ত থাকাই উচিত। ইসলামের নাম নিয়েও যারা জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করেন তাদের সম্পর্কে চুপ থাকাই জামায়াতের নীতি।

প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–'তোমাদের পিতা-মাতা যখন ঈমানের ওপর কুফরীকে প্রাধান্য দেবে তখন তাদের কথা মানা তোমাদের ওপর জরুরী নয়। কিন্তু আমার পিতা-মাতা কুফরীকে প্রাধান্য দেয় না অথচ আমাকে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে প্রবল বাধা দেয়। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী ?

উত্তর ঃ 'ইসলামী আন্দোলন' কথাটা কুরআনের 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'-এরই অনুবাদ। আল্লাহর দ্বীনকে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিজয়ী করার জন্যই এই হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ কাজের জন্যই নবী পাঠিয়েছেন। যারা নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকেও এই কাজে নবীর সহযোগিতা করার জন্য হুকুম করা হয়েছে। তাই নামায-রোজা পালন করা সত্ত্বেও যারা ইকামতে দ্বীন বা ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনে নবীদের সাথে সহযোগিতা করে না তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে।

এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়, ইসলাম কিছু ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের নাম নয়, ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলন করাই ঈমানের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই এ কাজে পিতা-মাতা বাধা দিলে সে বাধা মান্য করা যাবে না। কারণ আল্লাহর হুকুমের বিপরীত আর কারো হুকুম মানা জায়েজ নয়।

পিতা-মাতা কাফের হোক আর মুসলমান হোক, দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে, তাদের প্রতি সর্বাবস্থায় ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। তাদের সাথে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা দিলে সে বাধাকে বিনয়ের সঙ্গে অগ্রাহ্য করতে হবে।

www.amarboi.org

সাধারণতঃ মুসলমান পিতা-মাতার মধ্যে যারা ইসলামকে ভালোবাসেন তারাও ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব সম্পর্কে না জানার কারণে বাধা দিয়ে থাকেন। বাতিলের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের সংঘর্ষের কারণে সন্তানের বিপদ আশংকা করেও এ রকম বাধা দেয়া হয়। আর সন্তান ছাত্র হলে পড়ালেখার ক্ষতির ভয়েও পিতা-মাতা আপত্তি জানায়। সন্তানের মঙ্গল কামনার কারণে পিতা-মাতা এ রকম করে থাকেন। তাই এ কারণে তাদের জন্য কম শ্রদ্ধা-ভালোবাসা অনুভব করাও ঠিক নয়।

সন্তান যদি ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করতে পারে—ঈমান, ইল্‌ম ও আমলের উন্নতি হচ্ছে তাহলে এর কারণে তা উন্নতির প্রভাব পিতা-মাতার ওপর অবশ্যই পড়বে। আর ছাত্র হিসেবে যদি পরীক্ষায় ভালো ফল করে দেখাতে পারে তাহলে ইসলামী আন্দোলনে পিতা-মাতার আপত্তি থাকবে না। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের পথে পিতা-মাতার বাধার মোকাবেলা এভাবে কাজের মাধ্যমেই করতে হবে। এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে, এ আন্দোলন দুনিয়া ও আখেরাতেরই পথ। আর সন্তানকে উন্নতির পথে এগোতে দেখলে পিতা-মাতার আপত্তি আপনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ 'যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে সরে যায় সে যেন ইসলামের বেড়ী আপন ঘাড় থেকে খুলে ফেলে।' এর মানে কি এই যে, কোনো ব্যক্তি 'জামায়াতে ইসলামী কিংবা 'ছাত্রশিবির' কিংবা 'তাবলীগ জামায়াতে' যোগ না দিলে সে কাফের হয়ে গেল ? এখন আমরা তো গরবী ছাত্র, আমরা নিজেরা আয় করে নিজের লেখাপড়ার খরচ চালাই। এমতাবস্থায় কোনো দলের সাথে যোগ না দিতে পারি, তবে আমরা কি মুসলমান নই ? যদিও আমরা নামায পড়ি, হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করি, খোদাকে একক বলে স্বীকার করি, তবু কি আমরা মুসলমান নই ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে ফরয নামায সামষ্টিকভাকে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। জামায়াতে নামায না পড়ে যদি কোনো ব্যক্তি খুব নিষ্ঠার সাথে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায একা একা আদায় করে তাহলেও আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হয়। কোনো কারণে ফরয নামাযের জামায়াত ছুটে গেলে এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে একা পড়লে সেটার কথা আলাদা। কিন্তু একা একা নামায পড়ার ফায়সালা করে যে নামায পড়বে তার দ্বারা আল্লাহর হুকুম পালনের দায়িত্ব পুরো হয় না।

এখন যদি কেউ বলে—'আমার লেখাপড়া, রুজি রোজগার ইত্যাদির কারণে আমার নির্দিষ্ট সময়ে জামায়াতে গিয়ে নামায পড়া সম্ভব নয়, তাই আমাকে একা একাই ফরয নামায পড়ার অনুমতি দিতে হবে'—তাহলে তাকে আল্লাহর কাছ থেকে এ অনুমতি স্বয়ং যোগাড় করতে হবে। এ অনুমতি তাকে দেয়ার ক্ষমতা আর কারো নেই। ঠিক তেমনিভাবে মুসলমানদেরকে জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত তাগিদ দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ নয় এবং মানুষও একা জীবন যাপন করে না, সমাজবদ্ধভাবেই জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। তাই সমাজে যারা কুরআন হাদীসের বিধানমতো চলার জন্য

www.amarboi.org

আগ্রহশীল তাদের পক্ষে জামায়াতবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন না করলে আল্লাহর বিধান পালন করা সম্ভব নয় এবং এ কারণেই রসূল (সাঃ) এত জোর দিয়ে বলেছেন—'যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে দূরে সরে গেল সে ইসলামের বেড়ী তার ঘাড় থেকে ছুড়ে ফেলে দিলো।'

প্রকৃতপক্ষে এই জামায়াতী জিন্দেগীর গুরুত্বের কারণেই দিনের মধ্যে ৫ বার জামায়াতবদ্ধ নামায আদায়ের তাগিদ দেয়া হয়েছে—যাতে নামাযের বাইরে ও অন্যান্য ব্যাপারে ইসলামী সংগঠনের সহযোগিতায় সামাজিক জীবনেও ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব হয়।

একথা রাসূল (সাঃ) বলেননি যে, জামায়াতী জীবন যাপন না করলে সে সত্যি কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু তার পক্ষে একা একা ইসলামী জীবন যাপনও সম্ভব হবে না সেজন্যই কথাটাকে এত গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন। যেমন রাসূল (সাঃ) বলেছেন—'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করলো সে কুফরী কাজ করলো। একথা দ্বারা এ ঘোষণা করা হয়নি যে, নামায ইচ্ছা করে ত্যাগ করার সাথে সাথে সে কাফের হয়ে গেল। কিন্তু সে যে কাজটা করলো তা মুসলমানের পরিচয় দেয়নি।

প্রশ্ন ঃ ছাত্র অবস্থায় ইসলামী আন্দোলন করা কি জরুরী এবং না করলে কী ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ ইসলামী আন্দোলনের অর্থ যদি ইকামতে দ্বীন হয় তাহলে একাজ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। এ ফরয আদায়ের জন্য বয়সের কোনো সীমা নেই। সাবালক মুসলমান হলেই এ কাজ করতে হবে, ছাত্র হোক আর অছাত্র।

এ দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া আরও অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। অন্যান্য দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন না করলে চলে না। কারণ এটা সব ফরযের বড় ফরয। তাই ছাত্র হওয়ার অজুহাতে এ দায়িত্ব থেকে পালাবার চিন্তা করা মারাত্মক ভুল।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব। মন-মগজ ও চরিত্রে খাঁটি মুসলিম হওয়ার আর কোনো বিকল্প পথ নেই।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে অন্যান্য ইসলামী আন্দোলন (নেক নিয়ত) সম্পর্কে আপনার মতামত জানাবেন কি?

উত্তর ঃ যে কোনো সংগঠন বা আন্দোলনের নিয়ত নিয়ে চর্চা করা কারো পক্ষেই উচিত নয়। বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকলাপের দ্বারাই মানুষের কাছে তাদের আসল পরিচয় পরিস্ফুটিত হয়। জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ইসলামীপন্থীর দাবিদার হয়েও যারা অপপ্রচার চালায় বা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ফতোয়া দিয়ে বেড়ায় তাদের নিয়ত সম্পর্কেও আমরা মন্তব্য করি না। কে কী নিয়তে কী কাজ করছে তা বিচার করার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর।

প্রশ্ন ঃ 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' কি একমাত্র ইসলামী আন্দোলনকারী সংগঠন? এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য পেলে খুশি হবো।

www.amarboi.org

উত্তর ঃ বাংলাদেশে ইসলামী খেদমত বহু রকমের আছে এবং এর জন্য অনেক সংগঠনও আছে। জামায়াতে ইসলামী সকলের খেদমতকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। 'ইসলামী আন্দোলন' বলতে শুধু 'খেদমত' বুঝায় না। ইকামতে দ্বীনের প্রচেষ্টাকেই 'ইসলামী আন্দোলন' বলে। কুরআনের ভাষায় যাকে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়। এই আন্দোলন ইসলামকে পূর্ণরূপে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত। এর ফলে সকল রকম বাতিল শক্তির সাথে এর সংঘর্ষ বাধে।

ইকামতে দ্বীনের পদ্ধতি সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে যে, 'একমাত্র রাসূল (সাঃ)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করেই ইসলামের বিজয় সম্ভব।' এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কয়েকটি। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের জ্ঞানের তাবলিগ বা প্রচার, এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দাওয়াত যারা কবুল করে তাদেরকে সুসংগঠিত করে জ্ঞান ও চরিত্রের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি। এসব বৈশিষ্ট্য যেসব আন্দোলনে পাওয়া যায় তাদেরকেই ইসলামী আন্দোলন বলে গণ্য করা উচিত। বাংলাদেশে কোন্ কোন্ সংগঠনকে ইসলামী হিসেবে গ্রহণ করা যায় তা বিবেচনা করার দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের।

প্রশ্ন ঃ যেকোনো মতবাদ এক শতাব্দীর বেশী টিকে না। ইসলামের ব্যাপারে এ সত্যতা কতটুকু ? যদি তা না হয়, তবে ইসলামী শাসন ৩০ বৎসরের বেশী টিকেনি কেন ?

উত্তর ঃ 'এক শতাব্দীর বেশী কোনো মতবাদ টিকে না'-এ কথাটি অন্য কোনো মতবাদের ক্ষেত্রে ঠিক হলেও ইসলামের জন্য মোটেই ঠিক নয়। যদি ইসলামকে একটি 'মতবাদ' বলা হয়, তাহলে আদম (আ) হতে এ পর্যন্ত যে মতবাদ বেঁচে আসছে তা একমাত্র ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে মানব জাতির জন্য এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা দেশজয়ী ও কালজয়ী। ভাষা, বর্ণ ও ভৌগলিক সীমারেখার বন্ধন ছিন্ন করে সকল ধরনের মানুষের অন্তরে স্থান করে নেয়ার যোগ্যতা ইসলাম রাখে। এদিক দিয়ে ইসলামই একমাত্র চিরন্তন মানবাদর্শ।

কিন্তু এই ইসলামী আদর্শকে বিজয়ী করার জন্য যুগে যুগে যে আন্দোলন হয়েছে তা বিজয় লাভ করার পর স্বাভাবিক কারণেই চিরস্থায়ী হতে পারেনি। কারণ ইসলামী আদর্শ আল্লাহর রচিত হওয়ার ফলে যতই নির্ভুল ও কল্যাণকর হোক না কেন, আল্লাহ তায়ালা জবরদস্তিমূলক কোনো মানব জাতির ওপর তা চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ওপরে ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করা বা না করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। যখন কোনো ইসলামী আন্দোলন বিজয়ের সব শর্ত পূরণ করেছে তখনই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যতদিন এটাকে বিজয়ী রাখার জন্য যোগ্য লোক যোগাড় হয়েছে ততদিনই বিজয় চালু রয়েছে। ক্রমান্বয়ে আদর্শের বিচারে দুর্বল লোকদের হাতে নেতৃত্ব ও কতৃত্ব আসার কারণেই বিজয় চিরস্থায়ী হতে পারেনি।

তা সত্ত্বেও একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, মানব জাতির ইতিহাসে বহুবার ইসলামী আদর্শ বিজয়ী হয়েছে। সর্বশেষ মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নেতৃত্বে যে বিজয় সংগঠিত

www.amarboi.org

হয়েছিল তা কমপক্ষে ৩০ বছর আদর্শ হিসেবে শতকরা একশত ভাগ বিজয়ী ছিল। এরপর ১২০০ বছর পর্যন্ত উত্থান-পতনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বিজয়ী সভ্যতা হিসেবে ইসলাম বেঁচে ছিল। দুনিয়ার আর কোনো মতবাদ এ পর্যন্ত শতকরা একশত ভাগ একদিনের জন্যও বিজয়ী হয়নি।

আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলাম চিরন্তন আদর্শ মতবাদ। যুগে যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নামে যত দর্শন ও মতবাদ মানব সমাজে চালু হয়েছে তা সেসব যুগের মানুষের নৈতিক দুর্বলতারই পরিচায়ক। গুণগত দিক দিয়ে ঐসব ভ্রান্ত মতবাদকে আমরা তিনটি নামে চিহ্নিত করতে পারি ঃ

(ক) ভোগবাদ বা বস্তুবাদ (খ) স্রষ্টার দাসত্বের পরিবর্তে প্রবৃত্তির ও শয়তানের দাসত্ব এবং (গ) মৃত্যুর পরের সাফল্যের লক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করে নৈতিকতাহীন জীবন যাপন।

আধুনিক কালের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও তথাকথিত সাম্যবাদ গুণগত দিক দিয়ে ঐ তিনটিরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে পৃথিবীর সবকয়টি দেশে কি ইসলামী আন্দোলন চালু আছে? যদি থাকে তাহলে কোন কোন দেশে আন্দোলনের সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি?

উত্তর ঃ ইসলামী আন্দোলন বলতে তিনটি কাজকে বুঝায়। একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের ধারণা প্রচার করা এবং সে উদ্দেশ্যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় কাজ হলো, এ পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে সমাজে কায়েম করার জন্য যারা আগ্রহী তাদেরকে সংগঠিত করে তাদের মন-মগজ ও চরিত্র ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা।

তৃতীয়ত ঃ প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ইসলামী জীবন বিধানকে কায়েম করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং এ প্রচেষ্টার দরুন স্বাভাবিকভাবেই কায়েমী স্বার্থের সাথে সংঘর্ষ সত্ত্বেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

বর্তমান দুনিয়ায় প্রায় সবদেশেই ইসলামী আন্দোলনের এই তিনটি কাজের মধ্যে প্রথম দু'টি কাজ চালু আছে। তৃতীয় কাজটি অধিকাংশ দেশেই প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে চালু না থাকলেও এর প্রস্তুতি পর্বে অবশ্যই কাজ চলছে। এমনকি কমিউনিষ্ট দেশসমূহের ভেতরেও অত্যন্ত গোপনে প্রথম দুটো কাজ চালু আছে।

অমুসলিম গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম দু'টি কাজ প্রকাশ্যেই চালু রয়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মধ্যে বহু দেশেই প্রকাশ্য আন্দোলন চালু না থাকলেও অরাজনৈতিক পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের কাজ ব্যাপকভাবে চলছে। ফলে আশা করা যায় যে, ঐসব দেশে তৃতীয় কাজটি ইনশাআল্লাহ প্রকাশ্যে শুরু করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে তুরস্কের অবস্থাও কতকটা অনুরূপ। মালয়েশিয়ার মূল ইসলামী আন্দোলন অরাজনৈতিক ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু তাদের প্রভাব রাজনৈতিক অঙ্গণে কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় পূর্ণাঙ্গ একনায়কত্ব চালু থাকায় এবং সরকারী কর্তৃত্বে সংখ্যালঘু খৃস্টানদের প্রভাবের ফলে 'ইসলামী আন্দোলন' হিসেবে সেখানে প্রকাশ্যে কাজ করতে অক্ষম।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী হক পথের দাবীদার একটি ইসলামী সংগঠন প্রচার করছে যে, জামায়াতে ইসলামী কাদিয়ানী হতেও মারাত্মক ফেৎনা এবং মওদূদীর অনুসারীরা কাফের ও যারা জামায়াতের সঙ্গে জড়িত তারা সবাই কাফের। তবে কি আমরা যারা জামায়াতে আছি তারা সবাই কাফের ?

উত্তর ঃ কাউকে কাফের বলার বিষয়ে নবী করীম (সাঃ) কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন—'যদি কেউ কাউকে কাফের বলে তাহলে যাকে কাফের বলা হয়েছে সে যদি আল্লাহর নিকট মুসলিম বলে গণ্য হয়ে থাকে, তবে যে কাফের বলে তাকেই আল্লাহ কাফের বলে গণ্য করবেন'।

এতোবড় সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও যারা এভাবে কাফের ফতোয়া দেয় তাদের সম্বন্ধে এ প্রশ্নই মনে জাগে যে, তাদের মনে আখিরাতের ভয় কতটুকু আছে ?

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যারা ফতোয়া দিয়ে বেড়ায় তাদের সম্বন্ধে চুপ থাকাই ভালো। আমাদের কর্তব্য হলো ইকামতে দ্বীনের কাজ করে যাওয়া। যারা ফতোয়া দেয় তাদের ব্যাপারে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়াই আমাদের নীতি। এ বিষয়ে আমার লেখা 'ইকামতে দ্বীন' বইতে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। (চতুর্থ সংস্করণের ৭২-৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

প্রশ্ন ঃ জামায়াতে ইসলামী এবং নেজাম-ই ইসলামীর মধ্যে পার্থক্য কী ? এই দু'টি আন্দোলন এক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা কোথায় ?

উত্তর ঃ জামায়াতে ইসলামী ও নেজাম-ই ইসলামী পার্টি বহু বছর থেকে রাজনৈতিক ময়দানে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে এসেছে। এ দু'টি সংগঠন একে অপরের বিরুদ্ধে কোনো সময় কাদা ছোড়াছুড়ি করেনি। বরং বিভিন্ন ইসলামিক ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে এসেছে। বর্তমানেও নেজাম-ই ইসলামী পার্টি ইসলামী ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এখনো নেজাম-ই ইসলামীর কতিপয় নেতৃবৃন্দ ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ইত্তেহাদুল উম্মাহর মধ্যে শরীক আছেন। অবশ্য নেজাম-ই ইসলামীর এই পুরাতন নেতৃবৃন্দকে অগ্রাহ্য করে অন্যকিছু লোক নেজাম-ই ইসলামীর নামে সংগঠন করেছে। তাদের সাথেও জামায়াতে ইসলামীর কোনো বিরোধ হয়নি।

এ দু'টি সংগঠনের এক সংগঠনে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক নয়। উভয়ে আদর্শ এক হওয়া সত্ত্বেও সংগঠন পদ্ধতিতে পার্থক্য রয়েছে। যেমন-আলিয়া মাদ্রাসায় ও কওমী মাদ্রাসায় একই তাফসীর, হাদীস ও ফেকাহ পড়ানো সত্ত্বেও পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে উভয় ধরনের মাদ্রাসা এক হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জামায়াতে ইসলামী ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন হওয়ার কারণে অন্য কোনো ক্যাডারবিহীন সংগঠনের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না।

এ ছাড়া দু'টি সংগঠনের একিভূত হয়ে যাওয়াটা জরুরী নয়। যেটা জরুরী সেটা হলো একে অপরের পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে সহায়ক হওয়াটা এবং দু'টি সংগঠনের মধ্যে সে অবস্থা বর্তমান আছে।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজ কায়েম করে তা টিকিয়ে রাখার জন্য যত লোকের প্রয়োজন তত লোক বা কর্মী জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে এখনও তৈরী হয়নি, কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তবে কি এর লক্ষ্য ক্ষমতা দখল করে ইসলাম কায়েম করা ?

উত্তর ঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো জনগণের নির্বাচিত সরকার কায়েম করা। সেই ব্যবস্থা চালু হলে নির্বাচনের মাধ্যমে আইন সভায় ইসলামী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করা হবে। জামায়াতে ইসলামী লোক তৈরির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অগ্রসর হবে, আইনসভায় সে পরিমাণেই ইসলামী প্রতিনিধিত্ব হবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনের ব্যবস্থাই না থাকে, তাহলে আইন সভায় ইসলামী প্রতিনিধিত্বের কোনো সুযোগই হতে পারে না তাই জামায়াতে ইসলামী ইকামাতে দ্বীনের স্বার্থেই ইসলামী দাওয়াতের সম্প্রসারণ এবং সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যায় লোক তৈরি করার সাথে সাথে জনগণের ভোটাধিকার বহাল করার আন্দোলনকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই চূড়ান্তভাবে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হবে কিনা তা গণতান্ত্রিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। ইসলামী আন্দোলনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার ইখতিয়ার আল্লাহর হাতে। তিনি নির্বাচন ছাড়াও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা তুলে দিতে পারেন। সেই গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টির জন্যও নির্বাচন অবশ্যই সহায়ক।

জামায়াতে ইসলামী যেহেতু সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী নয় সেহেতু গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নির্বাচনের মাধ্যমেই গণজাগরণ সৃষ্টি করতে চায়। এর ফলে জনগণ ইসলামী আদর্শের পক্ষে যখন ব্যাপকভাবে সাড়া দিবে তখন এদেশের মতো পরিবেশে নির্বাচনের মাধ্যমেও ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন—কে দোযখে যাবে কে বেহেশতে যাবে। তবু আল্লাহ পাক কেন সৎ কাজের আদেশ দিতে বলেছেন। দয়া করে বলবেন কি ? ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে পারছি না।

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা অতীত-ভবিষ্যত সবকিছুই জানেন। তাঁর কাছে সমস্ত কালই বর্তমান কাল। কে আল্লাহর আদেশ পালন করবে আর কে করবে না এটা তাঁর আগেই জানা। ভালো কাজ ও মন্দ কাজ উভয়টি করার ইখতিয়ার মানুষকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ জানেন বলেই ব্যক্তি ভালো ও মন্দ কাজ করে না। বরং কে ভালো, কে মন্দ করবে এটাই আল্লাহ জানেন। যেমন একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদেরকে লেখাপড়ার ব্যাপারে আদেশ-নিষেধ করেন। যে ঠিকমতো লেখাপড়া করে না তার সম্বন্ধে শিক্ষক মন্তব্য করেন, তুমি ফেল করবে। এখন এই ফেল করাটার জন্য শিক্ষকের বলাটা দায়ী নয়। তার লেখা পড়া না করাটাই ফেল করার আসল কারণ। এমনিভাবে মানুষ আল্লাহর কথামতো চলা বা না চলার জন্যই দায়ী হবে এবং যাতে সে আখিরাতে বিপদে না পড়ে সেজন্যই আল্লাহ তাকে আদেশ ও নিষেধ করেছেন। যেহেতু মানুষের

www.amarboi.org

ইখতিয়ার আছে, সেজন্য মানুষকে সৎ কাজে ডাকার জন্য আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন। সে ইখতিয়ারকে আল্লাহর মর্জিমতো ব্যবহার করার জন্য মানুষকে উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন আছে। তাই আল্লাহ হেদায়াতের জন্য নবী পাঠিয়েছেন, কিন্তু কোনো মানুষকে হেদায়াত করে ফেলার কোনো ইখতিয়ার কোনো নবীকেও দেয়া হয় নাই। যেহেতু মানুষ ভালো ও মন্দ বুঝার ক্ষমতা রাখে, সে জন্য মানুষকে সৎ পথে যাওয়ার জন্য আদেশ দেয়ার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ একজন মহিলার সামগ্রিক কাজ-কর্মের সিদ্ধান্তে রায় দেয়ার বৈধ ও প্রথম অধিকার কে, সংগঠন না মহিলার স্বামী ? বুঝিয়ে দিবেন কি ?

উত্তর ঃ পারিবারিক ব্যাপারে সিদ্ধান্তের অধিকারী অবশ্যই স্বামী, সেখানে সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো হস্তক্ষেপ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি পারিবারিক ব্যাপারে ও দ্বীনি বিষয়ে স্বামী এবং স্ত্রী'র মধ্যে মতপার্থক্য হয় তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে মীমাংসার জন্য সংগঠনের সহযোগিতা উভয়ের জন্যই প্রয়োজন। তা না হলে তারা মীমাংসা কিভাবে করবেন ?

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই যদি ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হন তাহলে সংগঠনের ব্যাপারেও স্বামী-স্ত্রী'র ব্যাপারে বিরোধ হবার কথা নয়। কিন্তু যদি স্ত্রী ইসলামী সংগঠনের সাথে জড়িত হন এবং স্বামী জড়িত না হন, তাহলে সাংগঠনিক ব্যাপারে স্বামী এবং স্ত্রী'র মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনে স্বামীর চেয়ে সংগঠনেরই গুরুত্ব বেশী। স্বামীর কারণে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকে অবহেলা করা উচিত নয়। কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ককে তিক্ততা থেকে রক্ষা করাও স্ত্রী'র কর্তব্য। এই ব্যাপারে স্বামীর অধিকার ও ইকামতে দ্বীনের দাবীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে আপনার ধারণা ও মতামত কী ? দ্বীনি দায়িত্ব আঞ্জামে তাঁদের ত্রুটি থাকলে নির্দেশ করবেন। একটি ইসলামী জামায়াতের প্রকৃত দায়িত্ব কী ?

উত্তর ঃ আমি তাবলীগ জামায়াতকে দ্বীনের মোখলেস খাদেম মনে করি। আমি জামায়াতে ইসলামীতে আসার আগে প্রায় ৫ বছর একাগ্রভাবে তাবলীগ জামায়াতে কাজ করেছি এবং সেখান থেকে দ্বীনের বহু মূল্যবান শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ করে ইসলামের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করার মিশনারী জযবা তাবলীগ জামায়াতেই আমি পেয়েছি। তাই আমি এখনও তাবলীগ জামায়াতকে অন্তর থেকে মহব্বত করি।

তবে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দ্বীনে হককে বিজয়ী করার কর্মসূচী সেখানে নেই। 'খেদমতে দ্বীন' ও 'ইকামতে দ্বীন' এক জিনিস নয়। মাদ্রাসাগুলোর দ্বারা যেমন দ্বীনের এক ধরনের খেদমত হচ্ছে তেমনই তাবলীগ জামায়াতের দ্বারা দ্বীনের আরেক ধরনের খেদমত হচ্ছে। যারা কোনোদিন মাদ্রাসায় পড়েনি তারাও তাবলীগ জামায়াতের

www.amarboi.org

সাথে একটা নির্ধারিত সময় বাড়ী-ঘর থেকে আলাদা হয়ে দ্বীন শিক্ষার চেষ্টা করলে তাদের মন যে আখিরাতমুখী হয়, তাদের নামায যে শুদ্ধ ও সুন্দর হয় এবং বহু রকমের দোয়ায় যে তারা অভ্যস্ত হয় তা আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা।

ইকামতে দ্বীনের কর্মসূচী নেই বলে যেমন মাদ্রাসাগুলোর সমালোচনা করা উচিত নয় তেমনই তাবলীগ জামায়াতেরও এটা ত্রুটি হিসেবে দেখা উচিত নয়। যারা যেটুকু দ্বীনের খেদমত করেন তাঁদের খেদমতের স্বীকৃতি দেয়া সকলেরই কর্তব্য। ত্রুটি হিসেবে দেখলে দ্বীনের খাদেমদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি ছাড়া উপকার হবে না। আমি একথা বিশ্বাস করি যে, ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হলে মাদ্রাসা ও তাবলীগ জামায়াতের তৈরী লোকেরা বাতিলের পক্ষ সমর্থন করবে না। সকলে হয়ত এ সংঘর্ষে ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের সাথে প্রকাশ্যে সহযোগিতা করতে সাহস পাবে না, কিন্তু বিভিন্নভাবে তাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা আশা করা যায়।

একথা ঠিক যে, একটি ইসলামী জামায়াতের আসল দায়িত্ব শুধু দ্বীনের খেদমত নয়, দ্বীনকে বিজয়ী করার কর্মসূচী নিয়ে কাজ করা অবশ্যই ইসলামী জামায়াতের দায়িত্ব। কিন্তু কোনো জামায়াতের সমালোচনা করে একথা তাদের বুঝাবার চেষ্টা করা সঠিক পদ্ধতি নয়। ইকামাতে দ্বীনের বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী ময়দানে চালু থাকলে যারা ইকামতের দায়িত্ব বুঝতে পারবেন তারা এ পথে আসবেন।

আমার ধারণা, তাবলীগ জামায়াতের নেতারা বিশ্বাস করেন যে, তারা যে পদ্ধতিতে কাজ করছেন তারই ফলে দ্বীন বিজয়ী হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারাও দ্বীনের বিজয় চান।

আসল কথা হলো দ্বীনের জন্য ইখলাসের সাথে জান ও মাল দিয়ে কাজ করা দরকার। যেসব জামায়াত দ্বীনের কাজ করছে তাদেরকে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করা জরুরী। বিভিন্ন জামায়াতের আদর্শ, কর্ম-পদ্ধতি, কর্মসূচী, নেতৃত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করার পর যে জামায়াতের সাথে কাজ করার জন্য দীলে এতমিনান বোধ হয় তাতেই জান-মাল দিয়ে লেগে যাওয়া কর্তব্য। একটি জামায়াতকে বেশী ভালো মনে করে তাতে কাজ করার জন্য অন্য জামায়াতকে মন্দ মনে করার কোনো দরকার হয় না। যে জামায়াতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন সেটাকে অবশ্যই সবচেয়ে ভালো মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু এ জামায়াতের চেয়ে কম ভালো অন্য জামায়াতেক মন্দ বলে প্রচার করা ভালো কাজ নয়।

প্রশ্ন ঃ একজন প্রতিশ্রুতিবান কর্মী যদি ইসলামী আন্দোলনের সাথে মোনাফেকী করে তার কাফফারা সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের নির্দেশ কী ?

উত্তর ঃ কী ধরনের মোনাফেকী তা বিবেচনা করেই দায়িত্বশীলগণ তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। সব ধরনের মোনাফেকীরই কাফফারা এক রকম হতে পারে না। আর কর্মীটি যদি প্রতিশ্রুতিবান হয় তাহলে তার মনের এ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য যতটা সুযোগ দেয়া সম্ভব, দেয়া উচিত।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ ইকামতে দ্বীনের দায়িত্বের বোঝা মাথায় না নিয়ে সুসংগঠিত পদ্ধতিতে কাজ না করে যদি আমি কামেল পীরের নিকট বায়াত হয়ে চারি তরীকার যেকোনো তরীকায় (১) ইছমে আজম (আল্লাহ) (২) নফি এছবাত (লা-ইলাহা ইল্লাহু)-এর যিকির মসক করে দশ লতিফায় জিকির করে 'সুলতানে আজকার' জিকিরে পৌছলাম, আমি নাকি অলির স্তরে চলে গেলাম। আল্লাহর নিকট আমার কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না। প্রকৃতই কি আমি আল্লাহর নিকট মুক্তি পেয়ে গেলাম ?

উত্তর ঃ আখিরাতের নাজাত পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নবীদের মাধ্যমেই সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্যই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন বলে কুরআন মজীদে বারবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নবীদের প্রতি যারা ঈমান এনেছেন তাদেরকেও দায়িত্ব পালনে নবীর সঙ্গে পূর্ণরূপে শরীক হতে হয়েছে।

নবীর প্রতি ঈমান আনার দাবী করা সত্ত্বেও এমনকি নবীর সাথে নিয়মিত নামায আদায় করা সত্ত্বেও যারা ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বে অবহেলা করেছে তারা মোনাফিক বলে চিহ্নিত হয়েছে। এর থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে দ্বীন কায়েমের যে দায়িত্ব নবীগণ পালন করে গেছেন সে দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। আর যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া নাজাতের কোনো উপায় নেই সেহেতু নবীর তরীকাই মুক্তির একমাত্র পথ।

প্রশ্ন ঃ যে বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে বেহেশতে যাবে—হাদীসটি একটি বৃহৎ হাদীসের অংশ। যদি এত সহজে বেহেশতে যাওয়া যায়, তবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে জিহাদের ময়দানে হাজির হয়ে নিজের জান-মালের ক্ষতিসাধন করার কি প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ কুরআন ও হাদীসে দুনিয়ায় মানুষের ওপরে যে সমস্ত দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে তা পালন করা মানুষের কর্তব্য। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার প্রতিদান হিসেবেই বেহেশত পাওয়ার কথা। যদি এ উদ্ধৃত হাদীসটি 'একমাত্র কথা' হিসেবেই গ্রহণ করা হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের হাজারো নির্দেশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং কোনো হাদীস থেকে এমন অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয় যা কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য কথার বিরোধী হয়।

কুরআন মজীদেও এমন বহু আয়াত আছে, যেগুলো একটার সাথে আরেকটার মিল নেই বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু সমস্ত কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রাখা হলে এসব আয়াতের মধ্যেও যে সমন্বয় রয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্ধৃত হাদীসটির এ অর্থ করতে হবে যে, যদি কোনো ব্যক্তি ঈমানের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটি বুঝে-শুনে বলে তাহলে একদিন না একদিন সে বেহেশতে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে কোথাও শুধু ঈমানের ফলে বেহেশত দেয়ার ওয়াদা করেননি। ঈমানের সাথে নেক আমলকেও বেহেশতের জন্য শর্ত হিসেবে

www.amarboi.org

ঘোষণা করেছেন। এর অর্থ হলো, যদি কোনো ঈমানদার ব্যক্তির নেক আমল তার বদ আমলের চেয়ে বেশী হয় তাহলে সে বেহেশতের অধিকারী হবে, কিন্তু যদি বদ আমলের চেয়ে কম হয় তাহলে ঈমান থাকা সত্ত্বেও দোযখে যাবে। অবশ্য ঈমান থাকার কারণে সে চিরকাল দোযখে থাকবে না। তার জন্য নির্ধারিত মেয়াদকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে বেহেশত দেয়া হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কবুল করলো সে একসময় বেহেশতে যাবেই। কোনো বুদ্ধিমান মুমিন উক্ত হাদীসের ওপর ভরসা করে আল্লাহর আদেশ নিষেধসমূহকে অগ্রাহ্য করতে সাহস করবে না। উক্ত হাদীসের ওপর ভরসা করে আমলের পরওয়া না করার সাহস তারাই করতে পারে যারা দোযখে যাওয়ার জন্য রাজী আছে।

প্রশ্ন ঃ 'ইসলামী আন্দোলন করা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'— এটা কতটুকু সত্য ? কুরআন ও হাদীসের দলিল দিয়ে যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ঃ ইসলামী আন্দোলন বলতে যে কাজটা বুঝায় তা কুরআনের পরিভাষায় 'আল জিহাদু ফি সাবীলিল্লাহ'। জিহাদ শব্দের অর্থ বিরুদ্ধ শক্তির সাথে মোকাবিলার চেষ্টা করতে থাকা। এর মূল শব্দটি 'জুহদ'। জুহদ অর্থ চেষ্টা। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী মুফায়ালাতের বাবে জিহাদ শব্দটি তৈরি হয়েছে এবং এইভাবে মোকাবিলা বুঝায়।

আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করতে গেলে বাতিল শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা হওয়াই স্বাভাবিক। তাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ মানে হলো আল্লাহর দ্বীনের জন্য বাতিলের সঙ্গে মোকাবিলা করে চেষ্টা করতে থাকা।

অনেকে জিহাদের অর্থ 'যুদ্ধ' মনে করে। এ ধারণা ঠিক নয়। কুরআনে যুদ্ধের জন্য 'কিতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'যুদ্ধ' জিহাদের একটি পর্যায় মাত্র। নবী করীম (সাঃ) দ্বীনের দাওয়াত শুরু করা থেকে ১৩ বৎসর মক্কায় এবং হিজরতের পরও বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত দ্বীন কায়েমের জন্য যা কিছু করেছেন এ সবই জিহাদের মধ্যে গণ্য। আর বাতিলের সঙ্গে যত যুদ্ধ তিনি করেছেন তা-ও জিহাদের মধ্যে শামিল।

নবুয়তের প্রথম তেরটি বছরে ইসলামী রাষ্ট্র চালাবার একদল লোক তৈরি করার পর রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে মদীনায় একটি ইসলামী সরকার কায়েম হয়। আরবের সকল ইসলাম বিরোধী শক্তি এ রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার জন্য বারবার মদীনা আক্রমণ করে। অবশেষে আল্লাহর রহমতে ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর গোটা আরবে আল্লাহর দ্বীন বিজয় হয় এবং ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান চালু হয়। নবুয়তের শুরু থেকে ২৩ বছর এ উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয়েছে সবটুকুই 'আল জিহাদু ফি সাবীলিল্লাহ'।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে আসলে কী কাজ করার জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তা সূরা আত তাওবার ৩৩ আয়াত, সূরা ফাতহের ২৮ আয়াত এবং সূরা আস সাফ-এর ৯ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এ কাজটির গুরুত্ব বুঝাবার জন্যই একই আয়াত তিনি বারবার নাযিল করেছেন।

www.amarboi.org

আয়াতটির অনুবাদ—'তিনিই সে (আল্লাহ) যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও একমাত্র সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তিনি (রাসূল) ঐ দ্বীনকে (মানব রচিত) সকল দ্বীনের ওপরে বিজয়ী করেন।' এটাই ছিল তাঁর মূল দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

সমস্ত বাতিল দ্বীনের ওপরে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার কাজটি এত বিরাট ও ব্যাপক যে, নবীর পক্ষেও একা এ কাজ করা সম্ভব নয়। তাই রাসূল (সাঃ)-কে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ কাজের যোগ্য এক দল লোক যোগাড় করার জন্য চেষ্টা করতে হয়েছে। যাঁরাই নবীর প্রতি ঈমান এনেছেন তাঁদের ওপরই এই কাজে নবীর সাথে পূর্ণরূপে শরীক হতে হয়েছে। কেননা নবীর যে দায়িত্ব পালন করা প্রধান ফরয ছিল নবীর সাথীগণের ওপর তা সমানভাবে ফরয। তাই নবীর সাথী হওয়ার দাবীদার হয়েও এবং নবীর সাথে নামাযে নিয়মিত শরীক থাকা সত্তেও ওহুদের যুদ্ধে বাতিল শক্তির মোকাবিলার জন্য যারা যেতে রাজী হয়নি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা 'মুনাফিক' বলে ঘোষণা করেছেন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করতে থাকা সকল মুসলমানের ওপরও সবচেয়ে বড় ফরয।

এই কাজটিকেই আমরা বাংলায় 'ইসলামী আন্দোলন' ও ইংরেজীতে 'ISLAMIC MOVEMENT' বলে থাকি। এ কাজটিকে আরোও বিভিন্ন নামে বলা যায়। যেমন ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন, নিজামে ইসলামের আন্দোলন, ইসলামী হুকুমাতের আন্দোলন, ইসলামী খেলাফতের আন্দোলন ইত্যাদি।

রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন ও কথাই প্রমাণ করে যে, দ্বীন কায়েমের আন্দোলন সবচেয়ে বড় ফরয।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে যে নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে তা এদেশ চালানোর জন্য পর্যাপ্ত কিনা ? যদি না হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান গতিতে আন্দোলন যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে এভাবে হতে থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ এদেশে ইসলামী বিপ্লব বাস্তবায়ন কি আমরা আশা করতে পারি ? দয়া করে আপনার ব্যক্তিগত মতামত জানালে খুশী হবো। আন্দোলন সম্পর্কে আমি বর্তমানে আশা ও নিরাশা দুটোর মধ্যেই অস্থিরতায় আছি। তাই মানসিক স্বস্তির উদ্দেশ্যেই আপনার শরণাপন্ন হলাম। আশা করি উত্তর দিবেন।

উত্তর ঃ ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার জন্য যে মানের ও যে সংখ্যায় নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন তা পূরণ হলেই সফলতা আশা করা যায়। এর জন্য কোনো সময়সীমা নেই, শর্তসীমাই রয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে এ শর্ত পূরণ হবে কিনা সে ভবিষ্যতবাণী করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপরও ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি নির্ভর করে। কোনো সময় পরিবেশ অগ্রগতি বিরোধী হয়ে গেলে সময় লেগে যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে যে পরিবেশ-পরিস্থিতি রয়েছে, যদি অবস্থা এর চেয়ে মন্দ না হয় তাহলে

www.amarboi.org

আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নেতা ও কর্মী গড়ে ওঠার আশা করা যায়।

অবশ্য ইসলামী বিপ্লবের জন্য শুধু সংখ্যায় যথেষ্ট নয়, মানের প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যার সাথে সাথে মানের শর্তটি পূরা হলে আল্লাহপাক বিপ্লব সফল হওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

কিন্তু আপনি যেভাবে আশা ও নিরাশার অস্থিরতায় ভুগছেন তা মোটেই সঠিক নয়। আমাদের কাজ হলো আল্লাহপাকের নির্দেশ এবং রাসূল (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। এ আন্দোলনের সাংগঠনিক সাফল্য পূরণ হওয়ার ওপর আমাদের ব্যক্তিগত সাফল্য নির্ভরশীল নয়। আমরা যদি সঠিকভাবে মৃত্যু পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে থাকি তাহলে আমাদের জীবনে ইসলামী আন্দোলনের বিজয় দেখার সৌভাগ্য না হলেও আখিরাতে আমাদের ব্যক্তিগত কর্তব্য সম্বন্ধেই জবাবদিহি করতে হবে। কেন ইসলামকে বিজয়ী করতে পারলাম না সে বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ যে দেশে ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো অর্থাৎ কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় ও পালন করার পরিপূর্ণ সুযোগ ও নিরাপত্তা আছে সেই দেশে ইসলামী আন্দোলন করার প্রয়োজন আছে কি ?

উত্তর ঃ নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত চালু করাই যদি ইসলামী আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য হতো তাহলে রাসূল (সাঃ)-এর নবুয়তের শুরুতেই এসব ইবাদত চালু করা হতো। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, নবুয়তের বার বছর পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। এরও আড়াই বছর পর রোযা ফরয করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাদানী জিন্দেগীর শেষাংশে যাকাত ও হজ্ব ফরয করা হয়েছে।

এর থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সাঃ) যে ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন তার আসল উদ্দেশ্য এ কয়েকটি ইবাদাত চালু করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ যে নির্ভুল বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তা বাস্তবায়িত করাই ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। এসব ক্ষেত্রে মানুষ নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা যেসব বিধান রচনা করে তা নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয় বলে আল্লাহ পাক নিজেই 'বিধান' দান করেছেন। এ 'জীবন বিধান' চালু হওয়ার ওপরই মানুষের জীবনে শান্তি নির্ভর করে। এ বিরাট উদ্দেশ্যকে অবহেলা করে যারা শুধু নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত পালন করার সুযোগ পাওয়া যথেষ্ট মনে করে, রাসূলের ইসলামী আন্দোলন সম্বন্ধে তাদের সঠিক কোনো ধারণা নেই।

আমাদের সমাজে নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত যে অবস্থায় চালু আছে তা ইসলামের সঠিক দাবী পূরণ করে না। এগুলোকে আল্লাহ তায়ালা "অবশ্য কর্তব্য' বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এগুলো 'বাধ্যতামূলক' বিধানের মর্যাদা পাচ্ছে না। সমাজে এগুলো 'ফরয' হিসেবে বেঁচে নেই। আল্লাহর এ ফরযগুলো মুবাহ হিসেবে

www.amarboi.org

কোনো রকমে বেঁচে আছে। ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর প্রত্যেকটি নির্দেশকে তার যথাযথ মর্যাদায় চালু রাখা। এ কারণেই ইসলামী বিধানের পেছনে রাষ্ট্রশক্তি অপরিহার্য। যদি এর প্রয়োজন না থাকতো তাহলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) 'ইসলামী সরকার' গঠন করা প্রয়োজন মনে করতেন না। আর একমাত্র ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রশক্তি ইসলামের হাতে আসতে পারে।

প্রশ্ন ঃ যুগে যুগে মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত পয়গাম্বরদের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছেন। যখনই কোনো জাতি চরম গোমরাহীর দিকে ধাবিত হয়েছে তখনই আল্লাহ উক্ত জাতির মধ্যে নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করে সে জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা করলে দেখা যায়, চীন ও পাক-ভারত উপমহাদেশের জনবসতি অতি প্রাচীন। অথচ এ এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো পয়গাম্বরের আবির্ভাব হয়নি। কিন্তু একই সময় কোনো কোনো কাওম বা এলাকায় একই সাথে কয়েকজন পয়গাম্বরও প্রেরিত হয়েছে। এর কারণ কী ?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রাসূল এবং প্রত্যেক কাওমের জন্যই হেদায়াতকারী পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হেদায়াত করার ব্যবস্থা না করেই শাস্তি দেন না। সেই হিসেবে পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশ এবং চীনের মতো প্রাচীন জনপদে নিশ্চয়ই নবী পাঠিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত সকল নবীর নাম আমাদের জানা নেই। হাদীস অনুযায়ী কমপেক্ষ লক্ষাধিক নবী দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। কুরআনে মাত্র ২৭ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁদের বর্ণনা কুরআন মজীদে পাওয়া যায় তাঁদের কেউ এ উপমহাদেশে প্রেরিত হয়েছে বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এ অবস্থায় আমাদের এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা ছাড়া উপায় নেই যে, এসব জনপদে যেসব নবী পাঠানো হয়েছিল তাদের নাম আমরা জানি না। এসব এলাকায় যে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় হয়তো তাঁরা নবী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের শিক্ষা হারিয়ে যাওয়ার কারণে অথবা তাঁদের ইতিহাস বিকৃত হওয়ার দরুন তাঁদের নবী বলে চেনার উপায় নেই।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর ঘোষণা—'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম....ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা।'

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তাঁর দ্বীন তথা আল ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে এখন আমাদের জিহাদ, ইসলামী আন্দোলন বা তাবলীগ ইত্যাদি করার কি প্রয়োজন আছে ?

উত্তর ঃ আপনার এ প্রশ্ন বড়ই আজব। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এ দ্বীন আপনা আপনি কায়েম হবে না এবং আল্লাহ নিজেই দ্বীন কায়েম করবেন বলে ঘোষণা করেননি। বরং তিনি দ্বীন কায়েমের জন্য চেষ্টা

www.amarboi.org

করার দায়িত্ব দিয়েই রাসূলকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সবাইকে রাসূলের নেতৃত্বে একাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই কাজটিকেই বিভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়। কুরআনের পরিভাষায় এ কাজটি 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' বা 'ইকামতে দ্বীন'। 'ইসলামী আন্দোলন' কথাটি 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ'রই বাংলায় সার্থক অনুবাদ। আর এ কাজ করার জন্য তাবলীগ প্রয়োজন।

এর প্রয়োজন আছে বলেই নবী এসেছেন। আল্লাহ যেমন তাঁর আইনকে চন্দ্র সূর্য, গ্রহ-তারার ওপর নিজেই জারি করেছেন তেমনি ইসলামকেও তিনি জারি করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে ব্যবস্থা করেননি।

প্রকৃতি জগতের আইন নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। কারণ আল্লাহ নিজেই তা জারি করেন। কিন্তু মানুষের জন্য যে বিধান তিনি পাঠিয়েছেন সে 'দ্বীন ইসলাম' আল্লাহ নিজে জারি করেন না বলেই বান্দাহদের ওপর আল্লাহ এ দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব যারা পালন করে, আল্লাহ তাদেরকেই আল্লাহর খলিফা বলে গণ্য করেন। যারা আল্লাহর খলিফার মর্যাদা পেতে চায় তারাই এ কাজ করার প্রয়োজন বোধ করে।

ইসলামী সমাজ

প্রশ্ন ঃ মানুষকে হঠাৎ করে বেশী ভালোবেসে ফেলি (অবশ্য খারাপ উদ্দেশ্যে নয়)। এজন্য অনেক সময় নিজের ক্ষতি করে হলেও অন্যের উপকার করি। এ অভ্যাস ছাড়তে চেষ্টা করেও পারছি না। কিভাবে আমি এ ব্যাপারটাকে নিজের জীবনের সাথে ভারসাম্য করে নিবো?

উত্তর ঃ চিন্তা ও কাজকর্মের ভারসাম্য রক্ষা করা তার পক্ষেই সম্ভব যে এ বিষয়ে সচেতন। একবার ভুল হলে এর অভিজ্ঞতা থেকেই সংশোধন সম্ভব। অন্যের উপকার করতে গেলে নিজের কিছু ক্ষতি হবেই। তাই ইসলাম যে সীমা বেঁধে দিয়েছে সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান হাসিল করতে হবে। ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে কাজ করার চেষ্টা করলে স্বাভাবিকভাবেই ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ হবে।

প্রশ্ন ঃ মনের মাঝে অনেক ধরনের খারাপ চিন্তা জাগে, যেগুলো বাস্তবায়ন করলে গুনাহ হবে। আমি কাজে পরিণত করি না এবং চেষ্টা করি যাতে এ খারাপ চিন্তা মনে না আসে। কিন্তু তারপরেও বারবার যে কোনো সময় খারাপ চিন্তাগুলো মনে আসে। এটা নিয়ে আমি বড় বিব্রত বোধ করছি। কিভাবে আমি আমার মনকে পরিশুদ্ধ করতে পারবো?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ মন এমন এক চেতনার নাম যে কোনো সময় ঘুমায় না, কখনো ক্লান্ত হয় না। দেহ যখন শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য বিছানায় লুটিয়ে পড়ে তখনও সে অচেতন হয় না। দেহ সক্রিয় থাকার সময় সাধারণতঃ মন ঐ কাজের প্রতিই সচেতন থাকে যে কাজে অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্মব্যস্ত। মনোযোগ দিয়ে কাজ না করলে যোগ্যতার সাথে সমাধা করা যায় না বলে দেহ কর্মচঞ্চল থাকার সময় ঐ কাজের দিকেই মন কেন্দ্রীভূত থাকে। কাজের সময় মনকে ঐদিকে নিবিষ্ট করাকেই মনোযোগ বলা হয় । অর্থাৎ দেহের কৃত কাজের সাথে মনকে যোগ করার অবস্থাটাই হলো মনোযোগ। মনকে বিয়োগ করে রেখে কাজ করা হলে তাতে কখনও সফলতা আসে না।

মনে হাজারো রকম খেয়াল আসতে থাকে। এটাই মনের অভ্যাস। যারা বেশী কর্মব্যস্ত, যাদের চব্বিশ ঘন্টার রুটিনে ঘুম ও খাওয়া ছাড়া বাকী সময় কাজে খরচ করার ব্যবস্থা আছে তাদের মনে অপ্রয়োজনীয় খেয়াল আসার ফাঁক কমই হয়। কারণ যে কাজে দেহ ব্যস্ত, মনও সেখানেই কেন্দ্রভূত। তাই একথা প্রমাণিত যে, আজেবাজে চিন্তা অলস ও কর্মবিমুখ লোককেই ঘেরাও করে রাখে। কারণ সে মনকে কর্মব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা করে না। মন কখনও খালি থাকে না। যদি তাকে কাজ দেয়া না হয় তাহলে নানা রকম চিন্তা এসে ভিড় জমায়। মনকে সবসময় কাজে ব্যস্ত রাখা ছাড়া এ অবস্থা থেকে বাঁচার উপায় নেই। মন খালি থাকলেই সে শয়তানের কারখানায় পরিণত হয়। Empty mind is devil's Workshop' কথাটি যে কত সত্য আমরা সবাই এর জ্বলন্ত সাক্ষী।

শয়তানের কারখানায় কখনও ভালো জিনিস তৈরি হতে পারে না। তাই মন যাতে খালি না থাকতে পারে তার সুব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য রুটিন করে চব্বিশ ঘন্টার সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। ঘুমটাও একটা কাজ। ঘুমের সময় দেহ অচেতন থাকে তখনও মন কাজ করতে থাকে এবং সে কাজই 'স্বপ্ন' বলে পরিচিতি। ঘুম ছাড়া বাকী সময়টা যে কুচিন্তা থেকে মনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সে আজেবাজে স্বপ্ন কমই দেখে।

অবশ্য মানুষ সবসময় কাজ করতে পারে না। কাজের ফাঁকে তাকে বিশ্রাম নিতে হয়। তখন সে যদি একা থাকে তাহলে সে সময়টা 'সৎসাহিত্য' পড়ে অথবা "আল্লাহর যিকির' করে কাটাতে পারে। যদি অন্য লোকের সাথে থাকে তাহলে দু'কথা আলোচনা করে মনকে কুচিন্তা থেকে হেফাজত করতে পারে। পথে হেঁটে চলার সময় সে কুরআনের মুখস্থ সূরা ইয়াদ করে বা যেকোনো যিকির দ্বারা মনকে ব্যস্ত রাখতে পারে। ইসলামী সাহিত্য সবসময় সাথে রাখা দরকার যাতে রিকসায়, বাসে, ট্রেনে, ষ্টিমারে ও বিমানে যখনই সুযোগ হয় বই পড়ে মনকে বাজে চিন্তা থেকে বাঁচাতে পারা যায়। কারো সাথে দেখা করতে গেলে বা যানবাহনের জন্য ষ্টেশনে অনেক সময় অপেক্ষায় থাকতে হয়। বই সাথে থাকলে তখনও পড়া যায়। আর যিকির সবসময়ই করা যায়। কালেমা তাইয়্যেবা, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়তে থাকার অভ্যাস করলে সব অবস্থায়ই যিকির চলতে পারে।

www.amarboi.org

মুখে যিকির করতে করতে জিহ্বা ক্লান্ত হয়ে গেলে মনে মনে যিকির করার অভ্যাস করতে হবে। মোটকথা কোনো সময় মনকে খালি রাখা নিরাপদ নয়।

শ্বাস টানার সময় সচেতনভাবে 'আল্লাহ' এবং শ্বাস ছাড়ার সময় 'হু' মনে মনে বলার অভ্যাস করতে মনকে হামেশা যিকিরে মশগুল রাখা সহজ। এতে মন বলিষ্ঠ হয় এবং আল্লাহ যে সাথে আছেন তা উপলব্ধি করা যায়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্মীয় রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা ?

উত্তর ঃ ইসলামের আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে। যে রাষ্ট্রে আইন রচনা, শাসনকার্য ও বিচার ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। তারই নাম ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলাম প্রচলিত অর্থে কোনো ধর্মের নাম নয়। ইসলাম কতক অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস-সর্বস্ব 'ধর্মমত' মাত্র নয়। এই জন্যই ইসলামী রাষ্ট্রকে 'ধর্মীয় রাষ্ট্র' বলা চলে না। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যত কিছু প্রয়োজন সেসব বিষয়েও আইন-কানুন দান করে। যে রাষ্ট্র ইসলামকে আইনের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র আখ্যা দেয়া যায়।

'ধর্মীয় রাষ্ট্র' কথাটি ইউরোপের ইতিহাস হতে আমদানী করা হয়েছে। 'হোলি রোমান এমপায়ার (পবিত্র রোম সাম্রাজ্য) নামে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল তাকে ইংরেজীতে 'থিওক্রেসী' বলা হয়। এই থিওক্রেসীই ধর্মীয় রাষ্ট্র। সেখানে ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতোদেরই হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার ছিল। গির্জাকে কেন্দ্র করে পাদ্রীদের নিকট রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী আল্লাহর কোনো বিধান ছিল না। তাদের ইচ্ছাই আইনের মর্যাদা লাভ করতো। তাদের সিদ্ধান্তের বিপরীত কোনো মতামত যুক্তিপূর্ণ হলেও তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো না। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা স্বেচ্ছাচারিতা করতো। কুরআন ও সুন্নাহর ন্যায় কোনো স্পষ্ট বিধানের শাসন কায়েম ছিল না বলে সে রাষ্ট্রকে ধর্ম যাজকদের শাসন বলা যেতে পারে। সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত একমাত্র তাদেরই হাতে।

ইসলামী রাষ্ট্র এ ধরনের ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। এটা কোনো এক বিশেষ শ্রেণীর বা গোত্রের রাজত্বও নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপরিচালক ও জনসাধারণ একই কুরআন এবং সুন্নাহর অধীন। যে কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। সুতরাং ধর্মীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী শাসনের কোন্ যুগটিকে আদর্শ যুগ বলা যেতে পারে ? বর্তমান জটিল যুগে অনুসরণ করার উপযোগী কোনো শাসনতন্ত্র কি সেখানে প্রচলিত ছিল ?

উত্তর ঃ দুনিয়ায় আদিকাল হতে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত বহুবার বহু এলাকা ইসলামী শাসনের 'আদর্শ যুগ' সৃষ্টি হয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ) এবং অন্যান্য অনেক নবীর জীবনে আদর্শ যুগ কায়েম হয়েছে বলে কুরআন পাকে উল্লেখ রয়েছে। সেসব যুগ সম্পর্কে ওহীর মারফতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে সামান্য কিছু জানা যায়। মানব রচিত ইতিহাস এর সন্ধান দিতে অক্ষম।

www.amarboi.org

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ পাক মানুষের নিকট জীবনের সর্ববিষয়েই পূর্ণ আনুগত্য দাবী করেন বলে শুধু নামায-রোযা দ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট নন। তাই তিনি রাসূল পাঠিয়ে জটিল সমস্যাসংকুল মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধানের ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আইন প্রণয়নের বেলায় আল্লাহকে 'সার্বভৌম আইনদাতা' হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর মর্ম দেশ শাসনের ব্যাপারে আল্লাহর রচিত শাসন ব্যবস্থাকে মেনে চলতে অস্বীকার করলে কতক 'ধর্মীয় অনুষ্ঠান' পালন দ্বারাই মুসলমান বলে গণ্য হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বকালের সর্ব বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) হতে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মানব সমাজের যে বিস্তৃতি হয়েছে, এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ পাক সর্বকালের উপযোগী শাসন বিধান দান করেছেন। অতপর কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নীতি শেষ নবীর শিক্ষা দ্বারাই পূর্ণরূপে লাভ করেছে। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার যে বাস্তব রূপ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। তা-ই সর্বকালের এবং সর্বদেশের মুসলমানদের জন্য একমাত্র আদর্শ। তাঁর এই আদর্শ হযরত আলী (রা) পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। তাই রাসূল্লাহ (সাঃ) হতে হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত শাসনকালকেই ইসলামী শাসনের আদর্শ যুগ বলা হয়।

পাশ্চাত্যের অমুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত 'বিকৃত ইতিহাস' পাঠ করার ফলে ইসলামী শাসন সম্পর্কে যাদের মনে বিদ্বেষ বা বিরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে তাদের নিকট ইসলামের প্রথম যুগের বিস্তারিত ইতিহাস তুলে ধরার অবকাশ এখানে নেই। তবে নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণও একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ব্যাপারে হযরত উসমান (রাঃ)-এর পর হতে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়া সত্ত্বেও হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত ইসলামী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ইসলামী আদর্শেরই পরিচয় বহন করে।

উপোরক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের 'জটিল যুগ' ও 'শাসনতন্ত্র' শব্দ দু'টি হতে মনে হয় যে, প্রশ্নকর্তা বর্তমান জটিল যুগের উপযোগী শাসনতন্ত্র সেকালের ইসলামী যুগে সন্ধান করে পাওয়া যায় কিনা তা নিয়েই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রথমতঃ 'জটিল যুগ' কথাটির অসারতা প্রতিপন্ন হওয়া দরকার। ইসলামী শাসনের আদর্শ যুগ হতে বর্তমান যুগকে কোন্ কোন্ কারণে জটিল বলে মনে হয় তা প্রশ্নে উল্লেখ করলে বুঝতে পারতাম যে, কোন দিক দিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্রকে এই যুগে চালু করা অসম্ভব মনে করা হয়। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে যারা আধুনিক শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান খোঁজ করছেন, তাদের বর্তমান জটিল যুগে একমাত্র ইসলামী শাসনতন্ত্রই প্রকৃত সমাধান পেশ করতে সক্ষম। ইসলামী শাসন বিধান সম্পর্কে অধ্যয়ন না করে অযথা সন্দেহ পোষণ করা বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়। এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) লিখিত 'ইসলামিক 'ল' এ্যাণ্ড কনষ্টিটিউশন' নামক গ্রন্থখানি পড়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

www.amarboi.org

ইসলামের আদর্শ যুগে কোন্ শাসনতন্ত্র চালু ছিল এ প্রশ্নে 'শাসনতন্ত্র' দ্বারা যদি আধুনিক কালের 'লিখিত শাসনতন্ত্র' বুঝায় তাহলে বলতে হবে যে, এরূপ পুস্তকাকারে 'শাসনতন্ত্র' নামে তখন কোনো কিছু ছিল না। প্রশ্নকর্তা নিশ্চয়ই জানেন যে, পুস্তকাকারে লিখিত শাসনতন্ত্রের রীতি ২০০ বছর পূর্বে দুনিয়ার কোথাও ছিল না। আজও ইংল্যাণ্ডের 'শাসনতন্ত্র' অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় 'লিখিত' নয়।

ইসলামের আদর্শ যুগের অলিখিত শাসনতন্ত্রও আধুনিক লিখিত শাসতন্ত্রের চেয়ে অধিক নির্ধারিত ও স্পষ্ট ছিল। কেননা আল্লাহর বাণী ও রাসূলের বাস্তব জীবনাদর্শই ইসলামী শাসনতন্ত্রের উৎস। ইংল্যাণ্ড যদি লিখিত আকারে শাসনতন্ত্র রচনা করতে চায় তাহলে সমাজের রীতিনীতি, প্রাচীন ও আধুনিক প্রচলিত আইন ইত্যাদি উৎস হতে মৌলিক আইনসমূহ গ্রহণ করেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। আর বাংলাদেশ যদি ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করতে চায় তাহলে আল্লাহর কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ, খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ এবং ইসলামী আইন বিশারদ (ফকীহ) ইমামগণের গবেষণা ইত্যাদিকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং ইসলামী শাসনের আদর্শ যুগে আধুনিক যুগের লিখিত শাসনতন্ত্রের ন্যায় কোনো শাসনতন্ত্র ছিল না বলে বর্তমানে ইসলামী শাসন প্রণয়ন অসম্ভব বলে মনে করলে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়া হবে।

প্রশ্ন ঃ কবর বাঁধাই করা জায়েজ কিনা ? বুজর্গ ব্যক্তিদের কবর বাঁধাই করার মধ্যে উপকারিতা কী ?

উত্তর ঃ কবর বাঁধাই করা হাদীসে স্পষ্ট নিষেধ। চার খলিফা ও সাহাবায়ে কেরামের কবর বাঁধাই করা হয়নি, চিহ্নিত করা হয়েছে মাত্র। হযরত উসমান (রাঃ)-এর কবর মদীনায় অবস্থিত জান্নাতুল বাকীতে আছে। তাঁর কবরের চারপাশ চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে মাত্র, মাঝখানটা পাকা করা হয়নি। রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর কবর পাশাপাশি রয়েছে। এসব কবর মসজিদে নববীতে অন্তর্ভুক্ত। কবরের চারপাশেই মসজিদ। মাঝখানে কবরস্থানকে লোহা ও পিতলের জাল দিয়ে ঘিয়ে রাখা। জালের ভেতরে পর্দা ঝুলানো থাকায় কবর দেখা যায় না। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে প্রমাণিত যে, এসব কবরের চারপাশ চিহ্নিত বটে, কিন্তু মাঝখানটায় ফাঁকাই আছে। সুতরাং বাঁধাই করা হয়েছে বলা যায় না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কবর মসজিদের বাইরে ছিল। কিন্তু বারবার মসজিদের সম্প্রসারণ প্রয়োজন হলে কবর মসজিদের ভিতরে পড়ে যায়। কবর শরীফের চার পাশে দেয়াল নির্মাণের এটি একটি অন্যতম কারণ। রাসূল (সাঃ)-এর কবরের ওপর যে গম্বুজ তার থেকে এ গম্বুজটি আলাদা করে চেনার জন্য সবুজ রং দেয়া হয়েছে। অনেক বুজুর্গানে দ্বীনের কবরকে যেভাবে পাকা করা হয়েছে এবং যেরকম জাঁকজমকের সাথে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে তা হাদীসের নির্দেশের সম্পূর্ণ খেলাপ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'কবর পাকা করতে তার ওপর ইমারত নির্মাণ করতে, কবরের ওপর বসতে এবং তাতে কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।'(সহীহ মুসলিম)

www.amarboi.org

গম্ভুজ ও দালান বানিয়ে কবরকে রীতিমতো ইবাদতের স্থানে পরিণত করা হয়েছে। এসব যে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা তা সহজেই বুঝা যায়। শরীয়তে এ ধরনের আচরণ কোনোক্রমেই জায়েজ নয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে জাতি-গোত্রভেদ স্বীকার করে কিনা ? বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় তাঁতী সম্প্রদায়ের সাথে অন্য ব্যবসা বা চাকুরী অবলম্বনকারী লোকদের বিবাহ-শাদী সচরাচর হয় না। এ প্রথা সমাজ থেকে কিভাবে দূর করা যেতে পারে ?

উত্তর ঃ জাতি-গোত্র ভেদপ্রথা ইসলামে নেই। রাসূলে করীম (সাঃ) নিজে পাথর বয়েছেন, কাঠ কেটেছেন, কাপড় সেলাই করেছেন, নিজের জুতা সেলাই করেছেন, ছাগলের দুধ দোহন করেছেন ও মেষ চরিয়েছেন। তাই ইসলামে শ্রমের উন্নত মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে।

একসময় আমাদের দেশে মুসলমানরা মাছ ধরতো না। জেলেরা সবাই ছিল হিন্দু। পাকিস্তান হবার পর গ্রামাঞ্চলের জেলেরা অনেকেই যখন ভারতে চলে যায় তখন হাটে মাছ ওঠাই বন্ধ হবার উপক্রম হয়। মুসলমানেরা নিজেরা মাছ বিক্রি করতে চায় না। মাছ বিক্রেতার তখন সমাজে মর্যাদা ছিল না। এক মুরব্বি তখন আরও কিছু লোককে সংগঠিত করে মাছ ধরেন এবং যৌথ উদ্যোগে মাছ বিক্রি করেন। এরপর গ্রামের মুসলমানরা মাছ বিক্রি করতে শুরু করে। আসলে সমাজে সঠিক ইসলামী মূল্যবোধের অভাবের কারণেই মুসলমানদের মাঝে কোনো কোনো জায়গায় উঁচু-নীচু ভেদ চালু রয়েছে। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের যে কোনো স্তর, পেশা বা সম্প্রদায়ের মাঝে বিবাহ হতে কোনো নিষেধ নেই। তবে বিবাহের সাথে যেহেতু সামাজিক সম্পর্ক, আত্মীয়তা ইত্যাদি অনেক কিছু জড়িত, তাই সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য বিবাহের ব্যাপারে উভয় পক্ষের পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার মিল থাকার দিকে খেয়াল রাখা দূষণীয় নয়। পাত্র-পাত্রী ও আত্মীয়-স্বজন উভয় পক্ষের মাঝে রুচি পসন্দ-অপসন্দ, চিন্তাধারা সবদিকে 'কুফু' বা মিলের ক্ষেত্রে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্যই এটা দরকার হতে পারে।

তাই বলে এক পেশার লোক অন্য পেশাকে ছোট বা ঘৃণ্য মনে করবে—এটা অত্যন্ত আপত্তিকর। রাসূল (সাঃ) বিয়ের ব্যাপারে দ্বীনের দিকটা প্রধানতঃ বিচার করার ওপর তাগিদ দিয়েছেন। প্রত্যেকেই যদি নিজের চেয়ে বেশী দ্বীনদার খুঁজে বিয়ে করার চেষ্টা করে তাহলে দ্বীনের দিক দিয়ে সমাজের অগ্রগতি হবে।

প্রশ্ন ঃ এক মাওলানা সাহেবের সাথে আমার 'পীর' ধরার বিষয়ে আলাপ হয়েছে। তার মতে—পীর ধরা ছাড়া পরকালে মুক্তি নেই।' এটাই তার শেষ কথা। শুধু শরীয়তের মাধ্যমে (অর্থাৎ পীর ধরা ছাড়া) পরকালের মুক্তি সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আছি। উত্তরদানে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ 'পীর' শব্দটি কুরআন-হাদীসে নেই। এটা ফার্সী শব্দ। এর অর্থ 'বৃদ্ধলোক'। আরবীতে এর প্রতিশব্দ শায়েখ। পরিভাষা হিসেবে জ্ঞানী, অভিজ্ঞ। আমাদের দেশের

www.amarboi.org

'উস্তাদ' অর্থেই "শায়খ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন 'শায়খুল হাদীস' মানে হাদীসের উস্তাদ। এমন কোনো কাজ নেই যা ঐ কাজে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে শিখতে হয় না। ইসলাম জানার ক্ষেত্রেও সে কথা সত্য। অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের জ্ঞানে যারা উস্তাদ হবার যোগ্য তাদের কাছ থেকে ইসলামকে বুঝতে হবে। যিনি ইসলামের শিক্ষক তাকে উস্তাদ, পীর, বুজর্গ, ওলী যা-ই বলা হোক তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু শর্ত হলো দ্বীন তাঁর কাছ থেকেই শিখতে হবে যিনি দ্বীনের উস্তাদ হবার যোগ্য। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) তাঁর 'কাসদুস সাবীল' (মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রাহঃ) কর্তৃক বাংলায় অনূদিত) গ্রন্থে সঠিক পীর হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি শর্ত দিয়েছেন। তার মধ্যে তিনটি শর্ত সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঃ

প্রথম শর্ত হলো কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান। তিনি লিখেছেন—'কোরআনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তাফসীরে জালালাইনের মতো সংক্ষিপ্ত তাফসীরের জ্ঞানটুকু থাকা দরকার। হাদীসের বেলায় অন্ততঃ মেশকাত শরীফ ভালো করে পড়া থাকা দরকার। (পৃষ্ঠা–৯)

তাঁর মতে—'এতটুকু ইলমও যার নেই তার হাতে বাইয়াত হওয়া মানে ঈমানের ডাকাতের হাতে নিজেকে তুলে দেয়া।' (পৃষ্ঠা–১০)

দ্বিতীয় শর্ত হলো সহীহ আমল। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রাহঃ) এবং তাঁর পীর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) এ রকম পীর ছিলেন—যারা মুরীদের হাদিয়াকে রোজগারের সম্বল বানাননি। এ ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দেয়া হলো—

একবার মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)-এর কাছে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার একজন ছাত্র দোয়া চেয়ে দশটি টাকা মানি অর্ডার করে পাঠায়। হযরত থানবী (রাহঃ) তার টাকা দশটি ফেরত পাঠিয়ে দেন আর লিখে দেন—'আমি দোয়া করেছি। কিন্তু আমি দোয়া বিক্রি করি না।'

'পীর ধরা ছাড়া পরকালে মুক্তি নেই'—একথাটি কোন্ অর্থে বলা হয় ? অশিক্ষিত লোকদের পক্ষে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান লাভ করা এবং জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন-হাদীস মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। তারা নিজ এলাকার মসজিদের ইমাম থেকে জানার চেষ্টা করেন। ইমাম তেমন যোগ্য মনে না হলে কোনো বড় আলেম খোঁজ করতে বাধ্য হন। কোনো লোকের পক্ষে এমন অসহায়ভাবে দ্বীনি জীবন যাপন করা অসম্ভব। এ অবস্থায় কোনো আলেম যদি পীরের দায়িত্ব নিয়ে কোনো লোককে সাহায্য করেন তাহলে এটা দ্বীনের বড় খেদমত বলেই গণ্য হওয়া উচিত। দ্বীনের ব্যাপারে এ রকম কোনো পথ প্রদর্শক ছাড়া সাধারণ লোকের উপায় কী ? এ অর্থে যদি বলা হয় 'পীর ধরা ছাড়া মুক্তি নেই'—তাহলে এ কথাটি অযৌক্তিক নয়।

প্রশ্ন ঃ একজন লোক মুসলমান হিসেবে তার দৈনন্দিন ঈমানী দায়িত্ব পালনের জন্য সংগঠনের সাথে জড়িত হওয়ার পরও সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। এক্ষেত্রে তার সংশোধনের উপায় কী ?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ নিজের সংশোধন নিজেকেই করতে হবে। অন্যেরা পথ দেখাতে পারে, কিন্তু ঐ পথ দিয়ে হাঁটতে হবে নিজেকেই। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন 'যারা আমার পথে মুজাহাদা করে (প্রচেষ্টা চালায়) আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯ আয়াত)

সুতরাং সবাইকে চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তৌফিক চাইতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবেশীর হক কী ?

উত্তর ঃ প্রতিবেশীর হক অনেক বেশী। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে করীম (সাঃ) প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে এত বেশী তাগিদ দিচ্ছিলেন যে, তিনি মনে করছিলেন প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হতে পারে। (তিরমিযী)

হাদীস শরীফ অনুযায়ী প্রতিবেশীর নিম্নোল্লেখিত প্রধান অধিকারগুলো রয়েছে ঃ (১) দেখা হলে সালাম দেয়া (২) অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া (৩) মারা গেলে জানাযায় যাওয়া (৪) বিপদে-আপদে সাহায্য করা (৫) পাক করা খাদ্য মাঝে মাঝে প্রতিবেশীদেরকে হাদিয়া পাঠানো এবং (৬) নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ধার দিয়ে প্রতিবেশীকে সহযোগিতা করা।

প্রশ্ন ঃ ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নেই। কিন্তু তাপসী রাবেয়া এবং অন্যান্য যেসব সংসারবিমুখ দরবেশের কথা জানা যায় তাদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী ?

উত্তর ঃ ইসলামে যে বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই—একথাই সবাই জানে। একথাও সবার জানা আছে যে, মানুষের জন্য আল্লাহ পাক যাদেরকে আদর্শস্থানীয় বলে ঘোষণা করেছেন তারা শুধু নবী ও রাসূল। সর্বশেষ নবী সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন—"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।' (সূরা আহযাব ঃ ২১ আয়াত)

সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে সবদিক দিয়ে একমাত্র অনুসরণযোগ্য রাসূল (সাঃ) ছাড়া আর কেউ নয়।

আমরা খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামকে অনুসরণযোগ্য মনে করি কেন ? তাঁদেরকে অনুসরণ করা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু রাসূলকে মানার জন্যই তাঁদের মানি। রাসূলকে অনুসরণ করার ব্যাপারে তাঁরা আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাঁরাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন, আল্লাহ পাকও তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তাই আমরা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই তারাও তাঁদেরকে অনুসরণ করা প্রয়োজন মনে করি। আমরা ইমাম বোখারী (রাহঃ), ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণকে এজন্যই মানি যে, তাঁরা রাসূলকে অনুসরণ করার জন্য কোরআন-হাদীসের ওপর আজীবন গবেষণামূলক সাধনা করেছেন। তাঁদের সাধনার ফলই আজ ১৪ শত বছর পরেও রাসূলকে অনুসরণ করা এবং রাসূলের জীবনাদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সহজসাধ্য হয়েছে। তবু তাঁদেরকে মানা আসল উদ্দেশ্য নয়—'রাসূলকে মানাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।'

www.amarboi.org

এখন প্রশ্ন হলো, পরবর্তীকালের কোনো কোনো ধর্মসাধকের জীবন যদি রাসূলের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে কোনো দিক দিয়ে সামঞ্জস্যহীন হয় তাহলে আমাদের জন্য সেটুকু অনুসরণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে কি না ?

কোনো তাপস বা তাপসী জীবনে যতটুকু রাসূলকে অনুসরণ করেছেন ততটুকুই তার সাফল্য এবং সে পরিমাণেই তিনি আমাদের নিকট সম্মানিত। যেখানে তিনি ইসলাম ও রাসূলের নীতি পালন করতে পারেননি সেখানে তার অসাফল্য আমাদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে না। এ আলোচনার কষ্টিপাথরেই তাপসী রাবেয়ার জীবনকে যাচাই করতে হবে।

উক্ত প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে, তাপসী রাবেয়ার ন্যায় আরও অনেক সাধকের জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান হাসিল করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁদের সম্পর্কে যা কিছু জানা যায় তা হাদীস সংকলনের ন্যায় কঠোর যাচাই-বাছাই করে সংগৃহীত হয়নি বলে তাঁদের সম্পর্কে লিখিত জীবনীর ওপর পূর্ণরূপে নির্ভরও করা যায় না। তাই এসব জীবনীর ওপর নির্ভর করে কোনো সাধক সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা মোটেই নিরাপদ নয়।

আমরা তাঁদের অনুসরণ করার জন্য যখন আদিষ্ট নই তখন তাঁদের জীবনীর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। এ ধরনের সাধকদের যত জীবনী পাওয়া যায় তা থেকে শিক্ষণীয় যতটুকু পাওয়া যায় তা থেকেই উপকৃত হওয়া উচিত। আর যদি ইসলামের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু পাওয়া যায় তাহলে সেটুকুকে অনর্থক কোনো সমস্যা মনে করার যুক্তি নেই যদি তাদেরকে অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হতো তাহলে অবশ্যই এটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

প্রশ্ন ঃ রেডিও শুনা বা টিভি দেখা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ?

উত্তর ঃ রেডিও-টিভি যন্ত্র বিশেষ। এগুলোকে যেভাবে চালানো হয় তেমনি চলে। যারা দেশ চালায় তাদের নীতি অনুযায়ীই রেডিও-টিভি চলে। তাই দেশ ইসলাম অনুযায়ী চালানোর সিদ্ধান্ত নিলে রেডিও-টিভি ইসলাম অনুযায়ী চলবে। এ সম্পর্কিত কেবল মাসয়ালা জেনে লাভ নেই। কারণ আপনি রেডিও-টিভির প্রোগাম না শুনলেও আপনার ছেলে-মেয়েরা অন্যের বাড়ীতে গিয়ে শুনবে ও দেখবে।

ঈমানের দাবী এ নিষ্ক্রিয় নীতির বিরোধী। সত্যিকার ঈমানদারদের কর্তব্য সংঘবদ্ধ হয়ে জাতি ও সমাজকে আল্লাহর দ্বীনের পথে চালাবার চেষ্টা করা। সমাজকে বদলাতে পারলে রেডিও-টিভি ইত্যাদিকে ইসলামের খেদমতে লাগানো সম্ভব হবে।

তাই রেডিও-টিভিতে পরিবেশিত প্রোগ্রামের যেটুকু ইসলামী নৈতিকতা বিরোধী নয় ততটুকু শুনা বা দেখা দূষণীয় নয়। যেমন রাস্তায় চলার সময় বেপর্দা মেয়েদের থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেই চলতে হবে। রাস্তায় চলা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ মানুষের মৃত্যু আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে, তবে হত্যাকারী কেন অপরাধী ?

উত্তর ঃ শাস্তিটা দেয়া হবে লোকটা মরে যাওয়ার কারণে নয়, বরং হত্যাকারীর অপরাধের কারণে। দুনিয়াবী আইনে একজন হত্যাকারীর বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ

www.amarboi.org

আনা হয় তখন বলা হয়, 'ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিয়াছে' বা 'হত্যার জন্য চেষ্টা করিয়াছে'।

তাই এখানে 'ইচ্ছা' ও 'কাজ' বা কাজের চেষ্টা-এ দু'টো জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একজন লোক আর একজন লোককে মেরে ফেলার ইচ্ছা করলো এবং তদানুযায়ী তাকে আঘাত করতে উদ্যত হলো, এমনি সময়ে হয়ত কিছু লোক এসে তাকে বাধা দিলো। ফলে লোকটি অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেলো। এক্ষেত্রে যদি প্রমাণ হয় যে, লোকটি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার চেষ্টা করেছে তাহলে আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে লোকটির অন্ততঃ ৩ বছর সাজা হবে। সে যদি যুক্তি দেয় যে, আক্রান্ত ব্যক্তি অক্ষতই রয়েছে, তাহলে সেই যুক্তি গ্রাহ্য হবে না।

আবার মনে করুন, একজন লোক শিকারের উদ্দেশ্যে গাছে বসে থাকা পাখিকে গুলী করলো। সে গুলীতে উপবিষ্ট এক লোক মারা গেল। কিন্তু শিকারী খেয়াল করেনি যে, লোকটা গাছে বসে আছে। এক্ষেত্রে তার অসতর্কতার জন্য হয়তো কিছু শাস্তি হতে পারে, কিন্তু হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড হবে না। ১৯৫১ সালের দিকে আজিমপুর কলোনী যখন তৈরি হচ্ছিল তখন এক রাজমিস্ত্রীর হাত থেকেই ইট ফসকে পড়ে নীচে এক লোক মারা যায়। বিচারে রাজমিস্ত্রী বেকসুর খালাস পায়।

ব্যাপার হচ্ছে, যে মারা গেল সে তো হায়াত শেষ হওয়ার কারণে মারা গেল। কিন্তু আল্লাহতো হত্যাকারীকে নির্দেশ দেননি যে, 'ও একা মরতে পারছে না অথচ ওর হায়াত শেষ। সুতরাং তুমি এসে ওকে সাহায্য করো যাতে ও মরতে পারে।' তাই বিচারের স্বাভাবিক দাবী অনুযায়ী হত্যাকারীর বিচার হবে তার কাজের জন্য।

প্রশ্ন ঃ ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের বিরোধ না থাকলে যুগে যুগে ধর্মনায়কেরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরোধিতা করেছে কেন?

উত্তর ঃ ধর্ম শব্দটি বর্তমানে 'RELIGION' শব্দের অনুবাদ হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আর Religion বলতে স্রষ্টার সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কই বুঝায়। তাই ধর্মের সাথে সামাজিক জীবনের সম্পর্ক না থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়। এভাবে ধর্ম বা Religion -কে বাস্তব জীবন হতে বিচ্ছিন্ন কতক অর্থহীন অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইসলাম উপরোক্ত অর্থে কোনো ধর্ম নয়। অবশ্য মানব জীবনের সবদিকের ন্যায় ধর্মীয় দিকও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা কতক অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়।

ইউরোপে বিজ্ঞান সাধনার 'বিরোধিতা' করেছিল খৃস্টান ধর্মযাজকেরা। ইসলামের পতাকাবাহীরা কোনোকালেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথরোধ করে দাঁড়ায়নি। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের সব বস্তু এবং বস্তুশক্তিই মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞান এসব হতে খেদমত নেয়ার গবেষণাই চালিয়ে যাচ্ছে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বিজ্ঞান ইসলামেরও সেবক। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ খোদাবিমুখ লোকদের হাতে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এবং বিশ্বের নেতৃত্ব খোদাদ্রোহীদের হাতে থাকায় স্বল্প ধার্মিক লোকেরা বিজ্ঞানকে ইসলাম বিরোধী মনে করতে পারে।

www.amarboi.org

কিন্তু এটা ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের বিরোধ নয়, ধর্মের সাথে ধর্মহীন মানুষের বিরোধ মাত্র। অথবা এটা বিজ্ঞানের সাথে ধর্মান্ধ অজ্ঞ ধর্মযাজকদের বিরোধ।

প্রশ্ন ঃ মানব জাতির সভ্যতার বিকাশ ও যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার একমাত্র কুরআন শরীফের দানেই হয়েছে কি ?

উত্তর ঃ মানুষের চিন্তাধারা, বিশ্বাস, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনাদর্শের সমন্বয়ে সভ্যতার সৃষ্টি হয়। সভ্যতার এসব উপাদান যদি কুরআনের ভিত্তিতে গঠিত হয় তাহলেই ইসলামী সভ্যতা জন্মলাভ করে। কিন্তু কুরআনের বিপরীত চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও জীবন দর্শনে গঠিত সভ্যতাও অতীতকালে দুনিয়ায় কায়েম হয়েছে। যেমন—রোমান সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, আর্য সভ্যতা' ইত্যাদি। বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতে যে ইউরোপীয় সভ্যতা বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে এ সভ্যতার উপাদানসমূহ কুরআনের বিপরীত চিন্তাধারা ও জীবন-দর্শনের দ্বারা গঠিত। সুতরাং একথা মনে করা ভুল হবে যে, মানব সভ্যতা একমাত্র কুরআন শরীফেরই দান।

অবশ্য উপরোক্ত ব্যবহারিক অর্থ ছাড়াই সভ্যতার দ্বারা সাধারণ অর্থও গ্রহণ করা হয়। মানব জাতির মধ্যে যা কিছু 'মূল্যমান' ও 'মূল্যবোধ' বিরাজ করে এবং যত কিছু কল্যাণকর নীতি ও আদর্শ কায়েম আছে সে সবকেও সাধারণ অর্থেও 'সভ্যতা' আখ্যা দেয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে বিচার করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ বিশ্বের যাবতীয় কল্যাণকর নীতি ও আদর্শ একমাত্র ইসলামেরই অবদান। দুনিয়ায় প্রথম মানুষ আদম (আ)-কে আল্লাহ তায়ালা নবী হিসেবেই প্রেরণ করেন। তিনি মানুষের প্রয়োজনীয় আদর্শ ও নীতি শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং দুনিয়ার প্রথম মানুষটি হতেই সভ্যতার সূচনা হয়। কিন্তু অসভ্যতা এবং মানুষের জন্য অকল্যাণকর নীতিও ক্রমে বিস্তার লাভ করে। সভ্যতা শিক্ষা দেয়ার জন্য আবার নবী পাঠানো হয়। এরূপে সর্বযুগে এবং সকল দেশেই মানুষের নিকট যত নীতি ও আদর্শ ভালো বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে তা একমাত্র নবী ও রাসূলগণের (অন্য কথায় ইসলামের) শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল।

এবার প্রশ্নটির দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। 'যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার একমাত্র কুরআনের দানেই হয়েছে' বলে দাবী করার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। যারা বিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না এবং কুরআন শরীফের প্রকৃত দাওয়াত ও উদ্দেশ্যের খবর জানে না তারাই এ ধরনের বাজে দাবী পেশ করে থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং বস্তুবাদী সভ্যতার প্রাধান্যে একশ্রেণীর মুসলমান এতটা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে যে, তারা মুসলমান হিসেবে অত্যন্ত হীনতা বোধ করছে। তারা কুরআন সম্পর্কে বেশী কিছু না জানলেও একথা বিশ্বাস করে যে, কুরআন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই উৎস এবং দুনিয়ার সব বিষয়ই কুরআনেও বর্ণিত আছে। এটম বোমার নাম শুনেই তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, কুরাআনেও এর উল্লেখ আছে।

এরোপ্লেনের খবর পেয়েই তারা রাসূল (সাঃ)-এর মেরাজের উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চায় যে, উড়োজাহাজের পরিকল্পনাও কুরআন হতেই গ্রহণ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্রষ্টার দেয়া যে নিয়ম-কানুন জারি আছে বিজ্ঞান তা জানবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বস্তু শক্তির সন্ধান পেয়েই মানুষ সৃষ্টিলোকের এতকিছু উপকরণ নিজেদের সেবায় নিযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞান এসব বস্তুশক্তির কোনোটাই সৃষ্টি করতে পারে না। বিজ্ঞান শুধু অস্তিত্ববান সৃষ্টবস্তু ও শক্তির সন্ধান দিতে পারে মাত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের এই শক্তি আল্লাহ পাক মানুষকে দিয়েছেন বলেই ক্রমে মানুষ অধিক বস্তু ব্যবহার করতে পারছে। আগুনের ব্যবহার, পানির ওপর দিয়ে চলার শক্তি, কৃষিকর্ম দ্বারা ফসল উৎপাদন ইত্যাদি যাবতীয় আবিষ্কার আদিকালেই মানুষের বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারাই মানুষ বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও অনেক আবিষ্কার হতে থাকবে।

'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার' শিক্ষা দেয়ার জন্য কোনো নবী বা রাসূল পাঠানো হয়নি। মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে নিজের বুদ্ধি ও শক্তি ব্যবহার করেই বস্তু বিজ্ঞানের উন্নতি অর্জন করতে সক্ষম। রাসূলের নিকট ওহীর মারফতে যে জ্ঞান পাঠানো হয় তা কোনো মানুষই চেষ্টা করে এবং শুধু বুদ্ধির সাহায্যে অর্জন করতে পারে না। এ জন্যেই কোনো মানুষের পক্ষে চেষ্টা-সাধনা দ্বারা নবী রাসূল হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কুরআন বস্তু বিজ্ঞানের কিতাব নয়। কুরআন মানুষকে যে শিক্ষা দিতে এসেছে তা বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ লাভ করতে পারে না। মানুষের নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহকে এবং বিশ্বের যাবতীয় বস্তু-শক্তিকে কোন্ নীতিতে এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব তা শিক্ষা দেয়াই কুরআনের মূল লক্ষ্য।

বিজ্ঞান বস্তু-শক্তির সন্ধান দিয়েই তার কর্তব্য শেষ করে। এই শক্তিকে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না। এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান কুরআন ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কুরআন-হাদীস আল্লাহরই দেয়া জ্ঞানের সমষ্টি। মানুষের জীবনকে সঠিকরূপে পরিচালিত করার জন্য যে নির্ভুল জ্ঞান প্রয়োজন তা শুধু বুদ্ধি দ্বারা পাওয়া যায় না বলেই রাসূলের প্রয়োজন হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ বলেন—'আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে গোমরাহ করি আর আমি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করি।' আল্লাহ পাক যদি একথা বলে থাকেন যে, তাঁর ইচ্ছামত হেদায়াত করে আর ইচ্ছামতো গোমরাহ করে থাকে তাহলে আমি কি চুপচাপ বসে থাকবো ? আল্লাহ্ যখন হোদায়াত করবেন, তখনই আমি আল্লাহর হুকুম পালন করবো ?

উত্তর ঃ আল্লাহ কেবল একটি কথাই বলেননি, তাঁর সব কথা মিলিয়েই বুঝতে হবে। আল্লাহ মানুষকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, হক ও বাতিলের জ্ঞান দিয়েছেন, এমনকি কুরআন-হাদীসের ইলম যার কাছে পৌঁছেনি তার মাঝেও আল্লাহ ভালো-মন্দ বিচারবোধ দিয়েছেন। এখন যে ভালো নীতি গ্রহণ করলো, বোঝা যায় সে হেদায়াতের পথ ইখতিয়ার করলো। এটা এক দিক।

www.amarboi.org

অন্যদিক হচ্ছে, যে হেদায়াতের নিয়ম গ্রহণ করছে সে-ই হেদায়াত পেলো। আর যে গোমরাহীর নিয়ম গ্রহণ করেছে সে-ই গোমরাহী পেলো। কেউ যদি ব্যবহার না করার কারণে অস্ত্রে জং ধরে যায় তাহলে অস্ত্রের দোষ নয়, দোষ ব্যবহার না করার।

দ্বিতীয় কথা হলো, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। কেউ হেদায়াতের যোগ্য না হলে আল্লাহ তাকে হেদায়াত করেন না। কার মন-মানসিকতা কেমন তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। যে হেদায়াত পাওয়ার চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে সফল করেন। অনিচ্ছুক লোককে আল্লাহ জোর করে হেদায়াত দেন না। এ অর্থেই বলা হয়েছে, যাকে আল্লাহ চান তাকেই হেদায়াত দান করেন। মানুষ যত চেষ্টাই করুক আল্লাহ ইচ্ছা না করলে সে হেদায়াত পেতে পারে না। এ ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই।

রাসূল (সাঃ) তাঁর চাচা আবু তালিবকে ঈমান আনাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর এ চেষ্টা সফল হয়নি। আল্লাহ বলেন—'তুমি চাইলেই যাকে ভালোবাসো তাকে হেদায়াত করতে পারো না।।' (সূরা কাসাস ঃ ৫৬ আয়াত)

তৃতীয় কথা হলো, হেদায়াত ও গোমরাহী এমন এক রহস্য যার পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা কঠিন। একথা বুঝতে হবে যে, আল্লাহ মানুষকে নিজের পথ বাছাই করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর তিনি কারো প্রতি যুলুম করেন না। হেদায়াত ও গোমরাহীর জন্য মানুষ অবশ্যই দায়ী।

প্রশ্ন ঃ খোদা প্রেরিত পুরুষ বাদে দুনিয়ার কোনো মানুষকে 'কামেল' বলা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েজ কি না ? কোনো লোকের নামের সাথে 'কামেল' শব্দটি ব্যবহার করার যুক্তি কী ?

উত্তর ঃ 'কামেল' কথাটি একটা পরিভাষা হিসেবে আমাদের দেশে চালু রয়েছে। আরব দেশে কোথাও এটা এ অর্থে চালু নেই। আলীয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শ্রেণীকেও আমাদের দেশে 'কামেল' বলা হয়।

'কামেল' মানে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। আল্লাহর নবী ছাড়া আর কেউ এ দাবী করতে পারে না বা কারো সম্পর্কে এ ধারণা করা যায় না। নবী ছাড়া কেউ মাসুম নন। ইচ্ছাকৃত গুনাহ করে না—নবী ছাড়া এমন লোকও হতে পারে—হাদীসে পাওয়া যায়। তবে অনিচ্ছাকৃত ভুল বা গোনাহ অবশ্যই হতে পারে।

নবী (আঃ)-দেরও ভুল হয়েছে, তবে আল্লাহ ভুলের ওপর কোনো নবীকে কায়েম থাকতে দেননি। ওহী দ্বারা সংশোধন করে দিয়েছেন। তাই যার ওপর ওহী নাযিল হয় না তিনি ভুল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে মনে করতে পারেন না। তাই কেউ কামেল দাবী করেন না।

নবী (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়–'বালাগাল উলা বি-কামালিহি'—অর্থাৎ তিনি তাঁর পূর্ণতা দ্বারা উঁচু মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন। 'কামেল' অর্থ যে পূর্ণতা অর্জন করেছে।

কামেল বলা জায়েজ বা নাজায়েজের প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কারা কোন্ অর্থে এটা ব্যবহার করেন তারাই ভালো জানেন। তবে আমরা এটা ব্যবহার করি না। এ ধরনের

www.amarboi.org

পরিভাষা ব্যবহারের কোনো রীতি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তাঁর জীবিতকালে কামেল বলে প্রচার করলে সে ব্যক্তির মনেও শয়তান অহংকারের ভাব সৃষ্টি করার সুযোগ পেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ বই-কিতাবে আমরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী অনেক আউলিয়া দরবেশের কথা জানি। বর্তমান জামানায় অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী কোনো বুজর্গ ব্যক্তি দেখি না কেন ?

উত্তর ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)-এর কাছে বহু লোক আসতো। একবার তাঁর নিকটে এক লোক আসলো। সে নিয়মিত তাঁর কাছে হাজিরা দিতো। এভাবে প্রায় একমাস পর সে চলে যাওয়ার জন্য হযরত থানবী (রাহঃ)-এর কাছে বিদায় নিতে আসলো।

তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"কী ব্যাপার, তোমাকে অনেকদিন ধরেই দেখি নিয়মিত আসা-যাওয়া করো। কিন্তু কোনো প্রশ্নো করলে না কোনোদিন ?"

লোকটি হতাশার সুরে আফসোস করে জবাব দিলো, 'হুজুর! বড় আশা করে এসেছিলাম আপনার কাছে কিছু কারামাত দেখার জন্য, কিন্তু এতদিনেও সে রকম কিছু দেখতে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত চলে যাচ্ছি।'

হযরত থানবী (রাহঃ) প্রশ্ন করলেন—'তুমি কি আমার এখানে কুরআন-হাদীসের খেলাপ কিছু দেখেছ ? সে জবাব দিলো—'না'।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কি আমাকে কখনো জামায়াতের নামায তরক করতে দেখেছ ?'

সে জবাব দিলো—'না'।

এভাবে তিনি চার/পাঁচটি প্রশ্ন তাকে করলেন। প্রত্যেক বারই সে 'না' সূচক জ বাব দিলো। এরপর থানবী (রাহঃ) তাকে ধমক দিয়ে বললেন—'তাহলে তুমি যাও আমার কাছে এ জাতীয় কারামাতই আছে। তুমি যে ধরনের কারামাত দেখতে চাও আমার কাছে তা নেই।'

সাধারণতঃ অলৌকিক কিছু ঘটনাকেই 'কারামাত' বলে। আল্লাহর ওলিগণের জীবনে কারামাত দেখা যায়। কিন্তু জাহেলিয়াতের পরিবেশে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী চলতে পারাই সত্যিকার কারামাত।

কোনো নেক বান্দাহর মাধ্যমে কারামাত প্রকাশ পেতে পারে। এতে সে বান্দাহর কোনো বাহাদুরী নেই। আল্লাহই কারামাতের ব্যবস্থা করেন। যাদের কারামাত হয় তারা এর কামনাও করে না, জাহির করার চেষ্টাও করে না। কারামাত আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। যেমন খরা হলো। লোকেরা কোনো লোককে 'বুজর্গ' মনে করে দোয়া করতে বললো। তাঁর দোয়ায় যদি বৃষ্টি হয় এটাকে কারামাত মনে করা যেতে পারে। এর অর্থ হলো যে, সেই নেক লোকের দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। নেক লোক কখনো কারামাতের কৃতিত্ব নিজে দাবী করে না।

www.amarboi.org

আউলিয়া-দরবেশদের যেসব কাহিনী পাওয়া যায় তাতে ভক্ত লেখকদের পক্ষ থেকে অনেক বাড়াবাড়িও থাকতে পারে। রাসূল (সাঃ)-এর জীবনী লেখকগণ যেভাবে মুহাদ্দিসগণের যাচাই বাছাই করা সত্যের ভিত্তিতে লিখেছেন সেরকম সাবধানতা পরবর্তীকালে বুজর্গদের জীবনীর বেলায় অবলম্বন করা হয়নি। তাই তাঁদের জীবনীতে যত কারামাত লেখা আছে তা কতটুকু সঠিক ও কতটুকু বাড়াবাড়ি তা আল্লাহই জানেন।

বর্তমান যুগেও কারামাতের অধিকারী লোক নিশ্চয়ই আছে, আমরা হয়তো জানি না। কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, যারা আল্লাহর পথে আছেন তাঁদেরকে আল্লাহপাক আলৌকিকভাবে সাহায্য করেন এবং দুশমনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে তাঁদেরকে অগ্রসর করেন। এটাও কারামাতের মধ্যে গণ্য হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ নেক ও গুনাহের কাজের কোনো প্রতিফল দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদান করেন কি? দুনিয়ায় অনেক গোনাহগারকে দেখা যায় বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দে আছে অথচ নেককার দুঃখ-যাতনা ভোগ করছে। কোনো একলোক বলেন যে, গুনাহের কাজ করলে আল্লাহ যদি পাপীদের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে অন্যায় অনাচার কমে যেতো। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলে উপকৃত হবো।

উত্তর ঃ কাজের দু'রকম ফল হয়, বস্তুগত ও নৈতিক। কেউ কোনো খারাপ কাজ, অন্যায় বা যুলুম করলে এর বস্তুগত ফল দুনিয়ায় প্রকাশ পায়। কেউ অন্যের মাথায় বাড়ি দিলে মাথা ফেটে যাবে, ঘরে আগুন দিলে ঘর জ্বলে যাবে। কিন্তু এ অন্যায় কাজের নৈতিক ফল দুনিয়ায় দেয়া সম্ভব নয়। দুনিয়ার আদালতে এর বিচার হতেও পারে, আবার স্বাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে বা অন্যকোনো কারণে বিচার নাও হতে পারে। বিচার হলেও সঠিক প্রতিফল দুনিয়ায় দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। তাই আখিরাতেই এর সঠিক বিচার হবে।

আল্লাহ কাজের নৈতিক ফলাফল সাথে সাথে দেন না। কারণ দুনিয়া মানুষের পরীক্ষার স্থান। কাজের মন্দ ফল দুনিয়ায় হলে এ পরীক্ষার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই দেখা যায়, অন্যায় করেও মানুষ দুনিয়ায় সুখে থাকে। আর নেক কাজ করেও অনেকে দুনিয়ায় কষ্টে জীবন কাটায়। এটাই দুনিয়ার পরীক্ষা।

প্রশ্ন ঃ আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়, আমরা প্রত্যহ দোয়া কুনুতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা ফাসেক-ফুজুর লোকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি (নাতরুকু মাইয়্যাফজুরুকা)। অথচ বাস্তব জীবনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, যেদিকে তাকান যায় সব বেনামাযী। কিন্তু কই, তাদের সাথে তো সম্পর্কচ্ছেদ করছি না? তাহলে প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহর সাথে সরাসরি মোনাফেকী করছি না? এদিকে রাসূল (সাঃ)-এর নিদর্শন হলো আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিল মহব্বত ও সদ্ভাব বজায় রাখার। এমতাবস্থায় কী করা যেতে পারে?

উত্তর ঃ আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে। তাদের অধিকার আদায় করতে বলা হয়েছে। যে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে সম্পর্ক জুড়তে বলা হয়েছে। এর আসল উদ্দেশ্য হলো আত্মীয়ের হক

www.amarboi.org

আদায় করা দুনিয়ার স্বার্থে এবং হক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। দুনিয়াতে সামান্য সামান্য ব্যাপারে সম্পর্কচ্ছেদ করলে সমাজই টিকতে পারে না।

উপরের দোয়ায় উল্লেখিত সম্পর্কচ্ছেদ করার অর্থ যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করা নয়। এর অর্থ এমনভাবে না মেশা যাতে তার খারাবী নিজের মাঝে প্রভাব ফেলে অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে অন্যের সাথে শরীক না হওয়া।

আল্লাহর নাফরমান আত্মীয়ের সাথে আন্তরিক মহব্বত রাখা যাবে না। তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া সংশোধন করার জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা দূষণীয় নয়। কিন্তু এমন মেলামেশা রাখা ঠিক নয় যার ফলে তাদের নাফরমানীতে শরীক হতে হয়। যারা ফুজুর বা আল্লাহর নাফরমানী করছে তাদেরকে হেদায়াতের পথে আনার জন্য তাদের কাছে যেতেই হবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম বেদ্বীন লোকদের কাছে না গেলে তাদেরকে হেদায়াতই করতে পারতেন না।

বেনামাযী আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে আলাদা না হওয়া মোনাফেকী নয়। মোনাফেকী হচ্ছে তাকে ইসলামপন্থী বানানোর চেষ্টা না করা এবং তার যাবতীয় অনৈসলামী আচরণে খুশীর সাথে সহযোগিতা করা বা আপত্তি না করা।

প্রশ্ন ঃ তাওবা কাকে বলে ? মানুষের হক আদায় না করলে কি তাওবা দ্বারা তা মাফ পাওয়ার আশা করা যায় ?

উত্তর ঃ (১) আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া ও আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া (২) যে গুনাহ হয়ে গেছে তা আবার না করা (৩) অতীত গুনাহের কথা স্মরণ করে মনে কোনো তৃপ্তি বা মজা অনুভব না করা, বরং সেজন্য লজ্জাবোধ করা। এভাবে তাওবা করলে আল্লাহর হক নষ্ট করার গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়, কিন্তু এ তাওবার দ্বারা বান্দাহর হক নষ্টের বদলা হয় না।

হাদীস শরীফে আছে, 'কিয়ামতের দিন সবচেয়ে দুর্ভাগা ঐ ব্যক্তি, যে নামায-রোযা ইত্যাদি দ্বারা অর্জিত অনেক সওয়াব নিয়ে হাজির হবে, কিন্তু মানুষের হক নষ্ট করার কারণে সেখানে তার সওয়াব থেকে তাদের হক আদায় করার পরও হক বাকী থেকে যাবে। তখন তাদের গুনাহের বোঝা তার ওপর চাপানো হবে। শেষ পর্যন্ত সে দোযখে যাবে।

তাই বান্দাহর কোনো হক নষ্ট করে থাকলে তা বান্দাহকে ফিরিয়ে দিতে হবে বা তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ইল্‌ম-এর সাথে আমলের সম্পর্ক কী ? ইল্‌ম বাড়লে আমল বৃদ্ধি হয়, নাকি আমল করতে করতেই জ্ঞান বাড়ে ?

উত্তর ঃ ইলম ও আমলকে গাছ ও তার ফলের সাথে তুলনা করা যায়। আমলবিহীন ইল্‌মের উদাহরণ হচ্ছে এমন গাছ যাতে ফল ধরে না। ইল্‌ম অনেকেরই থাকতে পারে। আমল করাতেই ইল্‌মের সার্থকতা। শয়তান কি কম বড় আলেম ? কিন্তু তার

www.amarboi.org

ইল্‌ম তাকে নেক আমলের পথে পরিচালিত করেনি। হাদীস শরীফে আছে—'যে ব্যক্তি আমল করে না তার ইল্‌ম তার জন্য কিয়ামতের দিন বিরাট বিপদ হবে।'

হাদীস অনুযায়ী কিয়ামতের দিন কোনো ব্যক্তিই ৫টি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এক পা-ও নড়তে পারবে না। তার মাঝে একটি প্রশ্ন হলো যতটুকু ইল্‌ম ছিল সে অনুযায়ী আমল করা হয়েছে কিনা।

আমলের জন্য ইল্‌ম জরুরী। আমলের নিয়তে ইল্‌ম বাড়ালে আমল বাড়ে। ইল্‌ম ছাড়া আমল হতে পারে না। প্রত্যেক আমলের ব্যাপারেই সঠিক ইল্‌ম দরকার। আমলের হাকিকত না জানলে আমল নির্জীব অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। আমলের উদ্দেশ্যে ইল্‌ম হাসিল করা উচিত। আর ইল্‌ম অনুযায়ীই আমল হওয়া প্রয়োজন এটাই ঈমানের দাবী।

প্রশ্ন ঃ মানসিক দুশ্চিন্তা হতে মুক্তির উপায় কী ?

উত্তর ঃ ঈমানদার যারা তারা অন্তরে শান্তি পায় আল্লাহর যিকির করে বা আল্লাহকে স্মরণ করে। যিকির অর্থ কেবল মুখে স্মরণ নয়। যেমন—কোনো ব্যক্তি বাজারে যাওয়ার সময় তার স্ত্রী তাকে ছেলের জন্য একটি নির্দিষ্ট জিনিস কিনে আনতে বললো। ঐ লোকটি যদি মুখে ছেলের নাম জপতে জপতে বাজারে যায়, কিন্তু ঐ জিনিসটা কেনার কথাই ভুলে যায় তাহলে ছেলের নাম জপা অর্থহীন। তেমনি কাজে কর্মে আল্লাহর নির্দেশমতো না চললে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ পথ ত্যাগ না করলে নিছক মুখে আল্লাহকে স্মরণ করা আল্লাহর প্রকৃত যিকির নয়। অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই মুখে যিকির দরকার।

আল্লাহ বলেন—'আর যারা মুমিন তারা আল্লাহকে স্মরণ করেই অন্তরে শান্তিবোধ করে। জেনে রাখো, একমাত্র যিকিরের মাধ্যমে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।'

–সূরা রা'দ ঃ ২৮ নং আয়াত

যাবতীয় চিন্তা ও কাজের ভিতর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে সদা সতর্ক থেকে কাজ করাই সত্যিকার আল্লাহর যিকির। নামাযকেও কুরআনে যিকির বলা হয়েছে। কারণ নামায বারবার আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিপদ আল্লাহর অনুমতিতেই আসে। আল্লাহ যালেম নন, বরং তিনি অতি মেহেরবান। বিপদ আসলে বুঝতে হবে, সংশোধনের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিপদ এসেছে। বিপদে এটা অনুভব করে সংশোধনের চেষ্টাই হলো যিকির। সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট নিজকে সোপর্দ করাই আল্লাহর যিকির। দুশ্চিন্তা যাদের আসে তাদের ঈমানে দুর্বলতা আছে। আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হলে দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচার উপায় নেই। ইসলাম শব্দের অর্থই হলো আত্মসমর্পণ। আল্লাহর নিকট সঠিকভাবে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। বিপদ-আপদ আসবেই। আল্লাহকে স্মরণ করেই দুশ্চিন্তা দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে আইনজীবীরা কিভাবে আইন ব্যবসা করবেন ? আর সত্য ঘটনা কিভাবে উদঘাটন করা হবে ?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ ইসলামী সমাজে আইন ব্যবসা চলবে, তবে বর্তমান অবস্থার মতো নয়। এডভোকেট সাহেব জানেন, জনৈক ব্যক্তি অপরাধী। কিন্তু তাকে নিরপরাধ প্রমাণের চেষ্টাই তিনি করেন। এটা শরীয়তে হারাম। আইনজীবীর দায়িত্ব আইনকে সাহায্য করা। তাঁর শপথেও এটা উল্লেখ থাকে। কিন্তু বর্তমানে আইনকে 'ফাঁকি' দেয়ার নাম রাখা হয়েছে 'আইন ব্যবসা'। ব্যবসার প্রয়োজনে জজকে ধোঁকা দেয়ার উপায় উদ্ভাবন করা হয়। আসামী বলছে—এই ব্যাপার ঘটেছে। উকিল তখন তাকে মিথ্যা শিখিয়ে দেন এবং কথা অন্যভাবে বলার জন্য ট্রেনিং দেন। এটা কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নয়।

ইসলামী সমাজে আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং দোষী নির্দোষী নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনে রাষ্ট্রই আইনজীবী নিয়োগ করবে এবং তার ফী দেবার ব্যবস্থা করবে। আইন ব্যবসায় তখন হালাল পেশায় পরিণত হবে। তখন তারা ব্যবসার খাতিরে সত্যকে চাপা দেবার প্রয়োজন মনে করবেন না, বরং সত্য উদঘাটন করে আইনকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করবেন এবং বিচারকের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার সহায়ক হবেন।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের জন্য ওহুদ যুদ্ধে শিক্ষণীয় কী।

উত্তর ঃ সূরা আলে ইমরানে ওহুদের যুদ্ধের শিক্ষা আল্লাহ স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো নেতার আনুগত্য ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে জয়ও পরাজয়ে পরিণত হয়। আবার ভুলের কারণে পরাজিত হয়েও হিম্মত করে নেতার ডাকে সাড়া দিলে পুনরায় বিজয় লাভ সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমরা যারা ইসলামী আন্দোলন করছি তারা অধিকাংশ পুরুষ। কিন্তু আমাদের সংখ্যার প্রায় সমান মহিলা সমাজ। তাদের ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে আপনি কী কী কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন ?

পুরুষরা তো মাদ্রাসায় পড়ে, মেয়েদের জন্য তা-ও নেই। তাদের ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় ?

উত্তর ঃ একথা ঠিক যে, ইসলামকে জানার যতটুকু সুযোগ পুরুষের আছে মহিলাদের ততোটুকু নেই। সুখের বিষয়, এ ব্যাপারে সমাজে চেতনা জেগেছে, যার ফলে মহিলাদের জন্য পৃথক মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু মাদ্রাসা শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। কারণ খুব কমসংখ্যক মহিলাদের সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব। এ জন্যই ইসলামী দাওয়াতের কাজ মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। আলহামদুলিল্লাহ, গত কয়েক বছরের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ কিছুটা এগিয়েছে। দাওয়াতী কাজ করার জন্য মহিলা কর্মীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে বেশী সংখ্যক মহিলাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে যাচ্ছে।

ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী ছাত্রশিবিরের মাধ্যমে অনেকদিন থেকেই ইসলামী দাওয়াতের কাজ করার ফলে বর্তমানে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ইসলামের আলো পাচ্ছে। কিন্তু ছাত্রীদের ময়দানে এ কাজ মাত্র কয়েক বছর থেকে চালু হয়েছে, ইসলামী ছাত্রীসংস্থার কর্মীসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে দ্বীনের দাওয়াতের হার বেড়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ তিনি (জনৈক) বলেন—'আমরা নামায পড়ছি কিন্তু পাশে অন্যায়-অনাচার হচ্ছে আমরা কেউ প্রতিবাদ করছি না। সুতরাং আমরা বর্তমান যুগের কোনো মানুষই বেহেশতে যেতে পারবো না।' একথা কতটুকু ঠিক ?

উত্তর ঃ বেহেশতে যাওয়ার জন্য আসল শর্ত হচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। শুধু নিজে নিজে নেক কাজ করলেই আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরো দুটো কাজ করা কর্তব্য। একটি হলো অন্য লোককে ভালো কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। আরেকটি হলো সাধ্যমতো মন্দ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করা। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন—'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোনো মন্দ কাজ হতে দেখে তাহলে সে যেন শক্তিবলে তা রোদ করে যদি সে ক্ষমতা তার না থাকে, তবে কথার দ্বারা তা থেকে যেন ফেরানোর চেষ্টা করে। যদি এ ক্ষমতাও তার না থাকে, তাহলে অন্তত মনে মনে ঐ মন্দ কাজকে যেন ঘৃণা করে। আর ঐ তৃতীয় অবস্থাটা ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থা। (সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস অনুযায়ী কর্তব্য পালন না করলে শুধু নামাজ-রোজার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। বরং অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মনোভাব খতম হয়ে গেলে নিজেরাই তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বদরের যুদ্ধে যখন ৭০ জন বন্দী নিয়ে মুসলমানরা মদীনা ফিরে এসেছিলেন তখন কিছু বন্দীকে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়েছিল এবং কিছু বন্দীকে নির্দিষ্ট সময় শিক্ষকতা করার পর মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। তা করা হয়েছিল বেশীর ভাগ সাহাবীদের মতানুসারে। কিন্তু সেদিন হযরত উমর (রাঃ) বলেছিলেন—'প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্দী আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে শিরচ্ছেদ করবে। এতে প্রমাণিত হয়, ইসলাম বিরোধীদের আত্মীয় হলেও ক্ষমা করতে নেই। এ সময় স্বয়ং আল্লাহর নিকট কি হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রস্তাব পছন্দনীয় ছিল ? কিন্তু অধিকাংশ সাহাবীদের মত ছিল যে, অর্থ ও শিক্ষকতার বিনিময়ে বন্দীমুক্তি দেয়া হোক। সেদিন কি অধিকাংশ সাহাবীদের মতের জন্য আল্লাহর মতকেও বাতিল করতে হয়েছিল ? তা কি গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন ছিল ? এজন্য কি আল্লাহর রায় বাতিল করা হয়েছিল ? তা কুরআন-হাদীসের আলোকে বলবেন বলে আশা করি।

উত্তর ঃ বদরের যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবী (রা)-গণের পরামর্শ চাইলে হযরত উমর (রা) তাদেরকে হত্যা করার পরামর্শ দেন। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার মত প্রকাশ করেন। আর আবু বকর (রাঃ) ফিদিয়ার বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার পরামর্শ দেন। ইমাম আহমাদ (রাহঃ) আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরূপ তথ্য উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনুল মাদানী (রাহঃ), আনসার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে উক্তরূপ তথ্য বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে আহমাদ (রাহঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (রাহঃ)-এর গ্রন্থেও অনুরূপ তথ্য বর্ণিত আছে।

www.amarboi.org

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মতের সমর্থক বেশী ছিল বলেই যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। এরূপ কোনো আভাষও কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নিজ মতের অনুকূলে আবু বকর (রাঃ) এর মতকে পেয়েছিলেন বলেই তা পছন্দ করে গ্রহণ করেছিলেন। পরামর্শ নেয়া আল্লাহর হুকুম বটে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নিজের মতের বিরোধী কোনো পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন না। কারণ তিনি ছিলেন শরীয়ত প্রণেতা। কাজেই তাঁর সাথে গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থনের কথা আসতেই পারে না।

ফিদিয়ার বিনিময়ে বন্দী মুক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইজতেহাদী ভুল হতে পারে। আর সেজন্যই আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে কঠোর ভাষায় সূরা আনফালের ৬৭ ও ৬৮ আয়াতে সতর্ক করে দিয়েছেন।

'কোনো নবীর জন্য এটা শোভা পায় না যে, তার নিকট বন্দী থাকবে, যতক্ষণ সে জমীনে শত্রুবাহিনীকে খুব ভালো করে মথিত না করবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও, অথচ আল্লাহ চান (তোমাদের) পরকালীন কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী। আল্লাহর লিপি যদি পূর্বেই লিখিত না হতো তাহলে তোমারা যা কিছু করেছ তোমাদের ওপর কঠিন আযাব আপতিত হতো'।

আয়াত দু'টি বন্দী মুক্তির পর নাযিল হয়েছে। কাজেই বন্দী মুক্তির ব্যাপারে আল্লাহর মত কী ছিল তা তো আগে জানা যায়নি। বন্দী মুক্তির পরে আল্লাহ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে তাঁর নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে কোমলতার পরিবর্তে কঠোরতা অবলম্বন করে ইসলামের দুশমনদের নির্মূল করাই ঠিক ছিল। স্বয়ং আল্লাহই পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদক্ষেপ বহাল রেখেছেন। কাজেই আল্লাহর মতকে বাতিল করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীগণের শানে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করাও জায়েজ নয়।'

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কি আদালতে উকিলের প্রয়োজন পড়বে ? প্রয়োজন না হলে বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।

উত্তর ঃ আদালতে বিচারককে আইনের সঠিক প্রয়োগে সাহায্য করাই উকিলের দায়িত্ব। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে উকিলগণ আইনের সহায়ক এবং সুবিচারের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে বর্তমানে বিশেষ করে নিম্ন আদালতে আইনকে সাহায্য করার পরিবর্তে অপরাধীকে কোনোক্রমেই আইনের ফাঁক দিয়ে মুক্ত করে মোটা অংকের অর্থ কামাই করার যে রেওয়াজ চালু আছে তা আইনকে সাহায্য করার পরিবর্তে অপরাধ বৃদ্ধি করারই সহায়ক। ইসলামী রাষ্ট্রে এ জাতীয় ওকালতির সুযোগ থাকা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু আইনে অভিজ্ঞ উকিলের খেদমত ইসলামী রাষ্ট্রেও প্রয়োজন হবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামপন্থীরা বলে, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বই পৃথিবীর ইতিহাস। সমাজতন্ত্রীরা বলে, শ্রেণী সংগ্রামেই পৃথিবীর ইতিহাস। এ দু'য়ের তফাৎ কী ? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

www.amarboi.org

উত্তর ঃ বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের যে বিবরণ আল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে সেখানে এটাই দেখানো হয়েছে যে, মানব সমাজে চিরকালই হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সংঘর্ষের যে দুটো পক্ষ সৃষ্টি হয়েছে তা আল্লাহর প্রেরিত ওহীকে বিশ্বাস করা ও না করার ভিত্তিতেই হয়েছে। ওহীর মাধ্যমে মানব জাতির জন্য যে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' পেশ করা হয়েছে, যাঁরা তা গ্রহণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই 'হকপন্থী' ছিলেন। আর যারা এর বিরোধিতা করেছে তারাই 'বাতিলপন্থী' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এভাবেই মানুষ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু এ দুটো শ্রেণী হক ও বাতিলের ভিত্তিতেই গঠিত। হকপন্থী তাঁরা যাঁরা প্রচলিত বাতিল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ার সংগ্রাম করেন। আর যারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাই বহাল রাখতে চায় তারা 'কায়েমী স্বার্থ' হিসেবে স্বাভাবিক কারণেই হকপন্থীদের বিরোধিতা করে। কুরআন এ দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বকেই মানব জাতির ইতিহাস হিসেবে পেশ করেছে।

কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীরা মানুষকে একমাত্র 'অর্থনৈতিক' জীব মনে করে। তাদের গোটা দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুবাদী। তাদের মতে মানুষ যা কিছু করে তা শুধু বস্তুগত স্বার্থের জন্যই করে। তাই তারা মানব সমাজকে 'ধনী' ও 'গরীব' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত মনে করে এবং মানব জাতির ইতিহাসকে ধনী ও গরীবের মধ্যে দ্বন্দ্ব হিসেবেই পেশ করে। অর্থাৎ তারা ইতিহাসকে একমাত্র বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতেই ব্যাখ্যা করে।

তারা সমাজে যে পরিবর্তন চায় তার জন্য ধনীদের বিরুদ্ধে গরীবদের ক্ষেপিয়ে দেয়াই সহজ পন্থা বলে মনে করে। অনৈসলামী সমাজে ইনসাফ কায়েম না থাকায় আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে অল্পকিছু লোক কুক্ষিগত করে রাখার সুযোগ পায় বলে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাদেরকে একটি 'অর্থনৈতিক শ্রেণী' হিসেবে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। এভাবে কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতমজুরদেরকে অর্থনৈতিক মুক্তির নামে ধনীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করা হয় এবং ঐ ঘোলা পানিতে তারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। দুনিয়ার যেখানেই কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে সেখানে জনগণ চরমভাবে রাজনৈতিক দাসে পরিণত হয়েছে। অথচ অর্থনৈতিক মুক্তিও তারা পায়নি। সুতরাং তাদের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব একটি ভ্রান্ত মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন ঃ যদি বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সফল হয়, তবে কি সাথে সাথে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণ করা সম্ভব হবে ? যদি হয় তা কিভাবে ?

উত্তর ঃ মানুষের যাবতীয় মৌলিক অধিকার বহাল করাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু সবরকম অধিকারই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হওয়ার সাথে সাথে পূরণ হতে পারে না। কোনো কোনো অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হওয়ার সাথে সাথেই বহাল করা সম্ভব। আবার কোনোটি বহাল করার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হতে পারে।

www.amarboi.org

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সবচেয়ে বড় মৌলিক অধিকার হলো একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্য করার সুযোগ পাওয়া এবং এর বিপরীত সকল প্রকার দাসত্ব ও আনুগত্য থেকে মুক্তি লাভ করা। এটি এমন একটি অধিকার যেটা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই বহাল করা সম্ভব। কারণ কোনো দেশেই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা হঠাৎ করে চালু হয় না। একটা দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য নেতৃত্ব ও প্রয়োজনীয় কর্মীবাহিনী গড়ে উঠতে যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন সে সময়ের ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই এর পক্ষে মজবুত জনমত সৃষ্টি হয়। তাই এ ধরনের যোগ্য লোকদের হাতেই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ভার আসার পর উপরে বর্ণিত প্রশাসন ও প্রথম মৌলিক অধিকারটি বহাল হতে বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালকগণ যত যোগ্যই হোন, ক্ষমতা দখলের সাথে সাথেই দেশের সকলের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক অধিকার পূরণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় লাগা স্বাভাবিক।

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে যদি ইসলামী বিপ্লব সফল হয় তাহলে অমুসলিমদের কি ইসলামের আইন মেনে চলতে হবে এবং যাকাত, উশর ইত্যাদি দিতে হবে? আর অমুসলিমদের জান-মাল ইত্যাদির পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব কি ইসলামী রাষ্ট্র বহন করবে?

উত্তর ঃ কোনো দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হলে সাধারণভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা চালু হবে তা মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। যেহেতু ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা রয়েছে সে জন্য অমুসলিমগণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম মেনে চলতে পারবে। তাদের ওপর ইসলামের ধর্মীয় আইন চাপিয়ে দেয়া চলবে না। যেমন-নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত শুধু মুসলমানদের জন্য, এর কোনোটাই অমুসলিমদের পালন করতে হবে না।

উশরও যাকাতের পর্যায়ে গণ্য। জমির ফসলের যাকাতকেই 'উশর' বলা হয়। তাই তাদেরকে উশরও দিতে হবে না।

যে কোনো রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের নাগরিকদের জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা। যে রাষ্ট্রে এ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই তা কোনো সভ্য রাষ্ট্র বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু অমুসলিমদের সংখ্যা কম থাকারই কথা সেখানে তাদের নিরাপত্তার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় এ দায়িত্বকেই 'জিম্মাহ' বলা হয়। অর্থাৎ অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী রাষ্ট্রের 'জিম্মি'। তাদের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র বিশেষভাবে জিম্মাদার। দুঃখের বিষয় যে, এক শ্রেণীর লোক এ পরিভাষাটির এমন বিকৃত অর্থ করেন যাতে মনে হয় অমুসলিম নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য। অথচ প্রকৃত অবস্থা হলো এই, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জন্য নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা রাখার দায়িত্ব রয়েছে।

www.amarboi.org

ভারতের শাসনতন্ত্রে সকল নাগরিকের সমান নিরাপত্তার বিষয় ঘোষণা করা হলেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য সরকারীভাবে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা না থাকার ফলেই সংখ্যালঘুরা সেখানে সর্বদিক দিয়ে বিপন্ন। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইসলামে সেই বিশেষ ব্যবস্থার নাম 'জিম্মাহ' বা দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের নিকট থেকে যাকাত ও উশর আদায় করা হয়। অমুসলিমদের থেকে একটি আলাদা 'কর' আদায়ের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রেব্যবস্থা রয়েছে। সে করের নামই 'জিজিয়া'। এক শ্রেণীর নিন্দুক এ জিজিয়াকে 'জরিমানা' মনে করে। কিন্তু যাকাতও যেমন জরিমানা নয়, জিজিয়াও তেমনি জরিমানা নয়। অমুসলিমদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা জিজিয়া থেকে ব্যয় করার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ঐসব অমুসলিমদের থেকে জিজিয়া আদায় করা নিষেধ যারা দেশরক্ষা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদের নিরাপত্তার পৃথক ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ঃ যদি বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সফল হয়, তবে কি সাথে সাথে ইসলামের শাস্তির বিধানগুলো কার্যকর করা হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী আইনে জঘন্য মানবতা বিরোধী অপরাধ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ সেগুলোকে অসভ্য ও বর্বর আখ্যা দিয়ে থাকে। সে কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হলে এ কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়ে ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য তারা অপচেষ্টা চালায়। যারা মানব সমাজকে সংশোধন করার ব্যাপারে ইসলামী পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখে না তারা এ ধরনের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হতে পারে। তাই মানব সমাজকে গড়ার ব্যাপারে ইসলামের পরিকল্পনা ভালো করে বোঝা প্রয়োজন।

কোনো দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তখনই চালু হওয়া সম্ভব যখন সে দেশের জনমত তার পক্ষে আসে। তাই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হলে ইসলাম অনুযায়ী জীবন গঠন করার জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। সে দেশের জনগণের মন-মগজ-চরিত্র ইসলাম অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য তিন প্রকারের ব্যবস্থা নিতে হয়।

প্রথমত ঃ ইসলাম সম্বন্ধে তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস মজবুত করা, নামায-রোযার মাধ্যমে চরিত্রের মান উন্নয়ন করা, যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা ইত্যাদি দ্বারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে ইসলামের অনুসারী বানানোর ব্যবস্থা করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামের রাজনৈতিক কাঠামো, অর্থনৈতিক বিধি-বিধান, ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম প্রণালী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে তাদের সমাজ জীবনকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তুলতে হয়।

উপরোক্ত দু'রকম ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য যাতে মানুষ ইসলামের নিয়ম-কানুন মানা তাদের জন্য উপকারী বলে বুঝতে পারে। এ রকম

www.amarboi.org

পরিবেশ সৃষ্টি হলে 'বিবাহ' ব্যতীত নারী পুরুষের মধ্যে 'যৌনসম্পর্ক' গড়ে উঠার সুযোগ থাকে না, ব্যক্তিগত স্বার্থে কাউকে 'খুন' করা স্বাভাবিক হয় না, আদালতে 'সুবিচার' পাওয়ার কারণে আইন অমান্যের মনোবৃত্তি থাকে না, মানুষের 'মৌলিক প্রয়োজন' পূরণের ব্যবস্থা থাকার কারণে পেটের দায়ে 'চুরি-ডাকাতির' প্রয়োজন হয় না। এভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন-কানুন মেনে নিতে পারে না। এ কারণেই উপরোক্ত দু'রকম ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামের উপরোক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার বিধান রয়েছে।

তৃতীয়তঃ এতসব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যারা সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয় ইসলাম তাদেরকে মানবজাতির 'দুশমন' মনে করে। তাদেরকে সংশোধনের যোগ্য বলে মনে করার কোনো কারণ থাকে না। একটি সুন্দর শক্তিময় সমাজে এ জাতীয় লোকদের বাস করার কোনো অধিকারই নেই। তাই কোনো লোক অপরকে খুন করলে, কোনো বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে, কেউ ডাকাতি করলে তাদের জন্য ইসলামে এতো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে যা সমাজে সকলের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য যথেষ্ট। এই ধরনের অপরাধীদের 'শাস্তিবিধান' করা না হলে সমাজ থেকে অপরাধ দূর করার কোনো উপায় থাকবে না।

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলেই সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত কঠোর শাস্তি চালু করা যেতে পারে না। শাস্তি বিধানের পূর্বে একটা নির্দিষ্ট সময় ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। তারপর পর্যায়ক্রমে ইসলামী আইন অনুযায়ী শাস্তির বিধান চালু করতে হবে। নবীগণ মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য প্রেরিত হননি। ইসলামের কাজ হলো মানুষকে সংশোধন করা। সংশোধনের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও যারা সমাজ বিরোধী থেকে যায় তাদেরকে শাস্তি না দিলে গোটা সমাজই কলুষিত হবে।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা দুটো। যদি বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সফল হয়, তবে কি এই দুটোই থাকবে? না থাকলে কোনটি হবে এবং কী রকম হবে?

উত্তর ঃ যে কোনো দেশেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলা। যে দেশে যোগ্যতার যে মাপকাঠি নির্ধারিত হয় সে অনুযায়ীই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। কোনো উন্নত দেশে নাগরিকদেরকে বিভিন্ন বিপরীতমুখী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকে না। কারণ এ ধরনের বিপরীতমুখী শিক্ষার দ্বারা জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

কোনো দেশে সত্যিকারভাবে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে এর গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী মূল্যমান ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তোলাই স্বাভাবিক। সুতরাং কয়েক রকম 'শিক্ষাব্যবস্থা' যুক্তির দিক দিয়ে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আজকাল সরকারী সিলেবাসে পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এমন সিলেবাস রাখা হয়েছে যে, দাখিল পাশ করার পর কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি যে কোনো বিভাগেই ভর্তি হতে পারে। কিন্তু কলেজ পর্যায়ে প্রচলিত যে শিক্ষাই গ্রহণ করা হোক, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এটাই হচ্ছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি।

www.amarboi.org

শিক্ষাব্যবস্থা তখনই ইসলামী বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য হবে যখন প্রবেশিকা মান পর্যন্ত সকলকে একই শিক্ষা দেয়া হবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার যে শাখার প্রতি যার আগ্রহ সে অনুযায়ীই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্যের মধ্য দিয়েও ইসলামী মন-মগজের চরিত্র গড়ে তোলার মতো শিক্ষাই দেয়া হবে।

গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাই ইসলামী হবে। কুরআন ও হাদীসের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান সবাইকে দেয়া হবে যাতে 'মুসলিম' হিসেবে দুনিয়ার যাবতীয় দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়। আর যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তারা যাতে একদিকে মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম ডাক্তার, মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার, মুসলিম দার্শনিক হতে পারে সে ব্যবস্থা করা হবে' অপরদিকে যারা তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদিতে উচ্চ শিক্ষা নিতে চায় তাদের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেবার ব্যবস্থা থাকবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্র হলে অমুসলিম নাগরিকরা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে ? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার দিক দিয়ে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে এবং সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি ঈমান এবং আদর্শ ইসলামী চরিত্রের প্রয়োজন সেসব দায়িত্বে সকল মুসলমানই যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। যারা যোগ্য বিবেচিত হবে শুধু তারাই ঐসব দায়িত্বে নিযুক্ত হবে। ইসলামী রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এ স্বাভাবিক নীতি কোনো অমুসলিমের নিকটও অযৌক্তিক বিবেচিত হতে পারে না। এ জাতীয় দায়িত্ব কোনো অমুসলমানের পালন করা সম্ভব নয় এমনকি সকল মুসলামনও এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতে পারে না।

এ দায়িত্বে যোগ্য বিবেচনা না হওয়ার কারণে যেসব মুসলমানকে নিয়োগ করা হবে না তারা যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত না হয়, তাহলে অমুসলিম নাগরিকগণ'ও একই কারণেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে গণ্য হবেন না।

এ জাতীয় দায়িত্ব ব্যতীত আর সবরকমের দায়িত্বের বেলায়ই অমুসলিমগণ মুসলিমদের সমান অধিকার ভোগ করবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হলে প্রশাসন ও অফিস-আদালত থেকে কিভাবে দুর্নীতি অপসারণ করা হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী শাসন হঠাৎ করে কায়েম হয়ে যায় না। এটা কোনো দুর্ঘটনার ফসল নয়।

ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান সকল মহলে প্রসার লাভ করছে। বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী মহলে ইসলামী আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের জন্য কিছু লোক সক্রিয় হচ্ছে। এভাবেই ছাত্র ও শ্রমিকসহ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইসলামকে জানা ও বাস্তব জীবনে ইসলামকে মেনে চলার মতো লোক তৈরী হচ্ছে।

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলনের অবিরাম সাধনার এক পর্যায়ে যখন সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই কিছুসংখ্যক লোক ইসলামের ঈমান, ইল্‌ম ও আমলের ভিত্তিতে সুসংগঠিত হবে তখন নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইন সভার অধিকাংশ সদস্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। তখন একটি ইসলামী সরকার গঠন করা সম্ভব হবে। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী সরকার সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ইসলামী চরিত্র বিশিষ্ট লোক নিয়োগেরই ব্যবস্থা করবে। তখন প্রশাসনের মধ্যেও সৎ চরিত্রবান ও যোগ্য লোক অফিসারগণ অধিকতর গুরুত্ব পাবেন এবং পদমর্যাদার স্বার্থেই অনেক লোক সৎ হয়ে যাবেন। এই পদ্ধতিতে ইসলামী সরকার প্রশাসন থেকে সহজেই দুর্নীতি উৎখাত করতে সক্ষম হবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সমাজে নীচের তলা থেকে দুর্নীতি শুরু হয় না। দুর্নীতি ওপর থেকেই নীচের দিকে যায়। ওপরতলায় পরিবর্তন এলে নীচের দিকে তার প্রভাব পড়বে স্বাভাবিকভাবেই।

প্রশ্ন ঃ দাস হয়ে মনিবের নির্দেশ পালন না করার নাম বিদ্রোহ। বর্তমানে যারা ইসলামকে শুধু ব্যক্তি জীবনে পালন করছে তারা কি বিদ্রোহী নয়?

উত্তর ঃ নবীর উম্মত হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো মানুষকে পূর্ণ দ্বীন ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই যে এটা সীমাবদ্ধ নয় একথা না বোঝার ফলেই অনেক ধার্মিক লোকও ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুসরণ করা যথেষ্ট মনে করেন। এমনকি সকল আলেমও এ বিষয়টির চর্চা করেন না। তাই এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের ব্যাপক অভাব সমাজে রয়েছে।

যারা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালন করে চলেন তাঁরা নিশ্চয়ই কুরআনে বিশ্বাসী। তাই তাঁদেরকে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বোঝানো সম্ভব। যাঁরা জীবনভর ইসলামকে একভাবে বুঝে এসেছেন তাঁদের পক্ষে ইসলামের এই ব্যপকতাকে বোঝা সহজ নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা যাঁদেরকে দ্বীন সঠিকভাবে বোঝার তৌফিক দিয়েছেন তাঁদের কর্তব্য হলো যাঁরা এখনও সঠিকভাবে বুঝেননি তাঁদের বোঝাতে থাকা। এ কাজটি ধৈর্যের সাথে করেই যেতে হবে।

শয়তান সকল নেক কাজের মধ্যে এই কাজটিকেই তার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক মনে করে। তাই যাঁরা এ কাজ করে তাঁদেরকে এ কাজ থেকে ফেরাবার জন্য সহজ পন্থা এটাই বেছে নিয়েছে যে, যাঁরা দ্বীন বোঝে না তাঁদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে হবে যাতে তাঁদেরকে বোঁঝাবার পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তাই যাঁরা ইসলামকে সঠিকভাবে ব্যক্তিগত জীবনে পালন করছেন তাঁদেরকে 'বিদ্রোহী' বলে ঘোষণা করার চিন্তা মনে স্থান দেয়া উচিত নয়। বরং তাদের প্রতি দরদী মন নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতে থাকাই আমাদের কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ 'মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান একজন মহিলা হতে পারবেন না'–এমন বিধান কি ইসলামে আছে? থাকলে কেন?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির শুরুতেই নারী ও পুরুষ মিলে এক 'জোড়া' পয়দা করেছেন। উভয়ের মিলনেই মানব বংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবার, সমাজ ও সভ্যতা

www.amarboi.org

উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই টিকে আছে। উভয়ের দৈহিক গঠন, শারীরিক শক্তি, মানসিক গুণাবলী একই ধরনের নয়। কিন্তু উভয়ের সমন্বয় ব্যতীত কেউ পরিপূর্ণ নয়। উভয়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যে পার্থক্যটুকু রেখেছেন তাতে একথাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পরিবার গঠনে, সমাজ নির্মাণে, তমুদ্দুনের বিকাশে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় উভয়ের দায়িত্ব এক ধরনের নয়। এসব ব্যাপারে উভয়ের দায়িত্ব ভিন্ন হলেও একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে উভয়কে কাজ করতে হয়।

আল্লাহ তায়ালা কোনো মহিলাকে 'নবী' নিযুক্ত করেননি। সম-অধিকারের দাবীতে আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কেউ আপত্তি তুলেননি। কারণ আল্লাহর এ সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। সেই আল্লাহর রাসূলই ঘোষণা করেছেন—ঐ জাতি কৃতকার্য হবে না যারা নেতৃত্বের দায়িত্ব নারীর ওপর ন্যস্ত করেছে।

আল্লাহ এবং রাসূলের এ সিদ্ধান্তের বোঝা কঠিন নয়। স্বামী ও স্ত্রীকে নিয়ে একটি পরিবার। এ পরিবারের নেতৃত্ব সমভাবে দুইজনের ওপর থাকা সম্ভব নয়। এ দু'জনের একজনকেই যদি নেতৃত্বের দায়িত্ব দিতে হয় তাহলে কোন্ যুক্তিতে স্ত্রীকে স্বামীর ওপর নেতৃত্ব করতে দেয়া উচিত ?

অবশ্যই এটা স্বাভাবিক যে, শুধু নারীদের দ্বারা গঠিত কোনো সমিতি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব নারীর হাতেই থাকা উচিত। এতে কোনো সমস্যাও নেই। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপরেই প্রয়োগ করতে হয় সেখানে পুরুষের নেতৃত্বই স্বাভাবিক। রাষ্ট্র পরিচালনা যাকে করতে হবে তাকে নারী-পুরুষ সকলের ওপরই নেতৃত্ব দিতে হয় বলে এ দায়িত্ব নারীর ওপর ন্যস্ত করা স্বাভাবিক নয়। যে বৃহত্তর তামাদ্দুনিক প্রয়োজনে ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে সে কারণেই নারীকে 'রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব' দেয়া সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ঃ যে সরকার (ইসলামিক বা অনৈসলামিক) মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা না করে, চুরির জন্য হাত কাটা এবং নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা, আলাদা কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি না করে ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ চালু রাখে সেই সরকারকে জেনার জন্য শাস্তি দেয়ার অধিকার আল্লাহ পাক দেননি। যদি দেয়া হয় তা হবে যুলুম।

অপরদিকে আল্লাহ পাক বলেছেন—'খোদার আইনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কখনো অনুকম্পাশীল হওয়া চলবে না। যদি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস থাকে।' (সূরা আন নূর)

কিন্তু যারা সরকারী আইনের সাথে সম্পর্কহীন এবং বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে সামাজিক পর্যায়ে বিচার-সালিশ করে তারা চোর এবং জেনাকারীদের শাস্তি কিভাবে দিলে তা শরীয়তসম্মত হবে ? দয়া করে তা জানাবেন।

উত্তর ঃ সূরা আন নূরের যে আয়াতটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে তা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যই প্রযোজ্য। আল্লাহর আইন যে সমাজে চালু নেই সে সমাজের জন্য এ আয়াতটি বলা হয়নি। এই আয়াতে একথাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর বিধান সমাজে

www.amarboi.org

চালু থাকা সত্ত্বেও যখন কেউ আল্লাহর আইন অমান্য করে তখন তাকে শাস্তি দেয়ার বেলায় আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ব্যাপারে কোনোরকম মানবিক দুর্বলতা প্রদর্শন করা চলবে না। আল্লাহর বান্দাহদের প্রতি আল্লাহর চেয়ে বেশী দয়া আর কারও হতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রের অগণিত আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তিনি অপরাধীদের কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শন জনগণের অকল্যাণ চিন্তারই ফসল।

এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে সামাজিক পর্যায়ে বেসরকারীভাবে অপরাধের যেসব সালিশ-বিচার হয় তা অপরাধ প্রবণতা দমনের জন্য সহায়ক হতে পারে, যদি সমাজ তা মেনে নেয়। এসব বিচারে শুধু ঐসব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব, যার সাথে দেশের আইনের কোনো বিরোধ নেই। শরীয়তের বিধান ব্যতীত যেসব সামাজিক বিচার করা হয় তার সাথে শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই। আর ইসলামী সরকার ব্যতীত ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষমতা আর কারও হাতে দেয়া হয়নি।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে ইসলামী আইন কি অমুসলিমের ওপর আরোপিত হবে ? যেমন ইসলামে মদ খাওয়া হারাম। এমতাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার পর যদি কোনো অমুসলিম মদ খায়, তবে তার কী ধরনের শাস্তি হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন মুসলিম ও অমুসলিম সকলের ওপরই প্রয়োজ্য। শুধু ধর্মীয় এবং পারিবারিক বিধি-বিধানের ব্যাপারে ইসলামী আইন অমুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য নয়। ইসলামী আইনের মধ্যে এমন আরো কিছু বিষয় আছে যা অমুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যেসব খারাপ কাজ সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও নৈতিকমান বিনষ্ট করে তা অমুসলিমদের ওপরও প্রযোজ্য। যেমন সুদের ব্যবসা, মদ উৎপাদন ও বিলি-বন্টন, ঘুষ-জুয়া ও অবৈধ লেনদেন ইত্যাদি ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের ওপর নিষিদ্ধ। তাই এসব কাজ করার যে শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে তা সামাজিক স্বার্থে অমুসলিমদের ওপরও প্রয়োগ করা স্বাভাবিক।

রাজনীতি

প্রশ্ন ঃ ডানপন্থী, মধ্যমপন্থী, বামপন্থী, প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল, মৌলবাদী, গোঁড়া, ধর্মান্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রভৃতি পরিভাষাসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য কী ? মেহেরবানী করে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ আধুনিক পরিভাষায় কোনো ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবীদারদের 'বামপন্থী' আর পরিবর্তন বিরোধীদের 'ডানপন্থী' বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় এ দুটো শব্দের অর্থ ভিন্ন। যারা আল্লাহর পথে চলে তাদেরকে আল্লাহ 'ডানপন্থী' আর যারা এর বিপরীত পথে চলে তাদেরকে 'বামপন্থী' বলেছেন। (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ২৭-৫৬ আয়াত)

www.amarboi.org

সুতরাং কুরআনের পরিভাষায় ইসলামী বিপ্লবের জন্য সংগ্রামরত লোকেরা ডানপন্থী। কিন্তু বর্তমানে বামপন্থী বলতে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রীদেরকে বুঝানো হয় এবং সমাজতন্ত্র বিরোধীদেরকে ডানপন্থী বলে গালি দেয়া হয়। তাই ইসলামী আন্দোলনের সমর্থকগণ নিজেদেরকে আধুনিক অর্থে ডানপন্থী মনে করে না।

'প্রগতিশীল' ও প্রতিক্রিয়াশীল' সমাজতন্ত্রীদের এটাও একটা বিরাট ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণা যে, তারা নিজেদের বলেন প্রগতিশীল বা রক্ষণশীল। তারা বুঝাতে চান যে, তারা যা কিছু করতে চান তাই প্রগতি।

প্রকৃতপক্ষে প্রগতি অর্থ হলো উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া, সামনে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু 'গতি' মাত্রই 'প্রগতি' নয়। ধ্বংসের পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়াকে প্রগতি বলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ইসলামী পরিভাষায় যারা প্রচলিত ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার বিরোধী তারাই হলো প্রতিক্রিয়াশীল। আর ইসলামের পথে এগিয়ে চলার প্রচেষ্টাই হলো প্রগতিশীলতা।

'রক্ষণশীল' শব্দটি ভালো-মন্দ দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যখন সমাজের সংস্কার ও উন্নতির বিরুদ্ধে প্রচলিত রীতিনীতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয় তাকে মন্দ অর্থে 'রক্ষণশীলতা' বলে। আবার সমাজে কল্যাণকর যা কিছু আছে তা নষ্ট হওয়া থেকে যারা রক্ষা করতে চায় তাদেরকেও ভালো অর্থে 'রক্ষণশীল' বলা যায়।

মধ্যমপন্থী' কথাটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা নিষ্ক্রীয়। সমাজের পরিবর্তন করার সংগ্রামও তারা করে না, সমাজকে যারা ভেঙ্গে চুরমার করতে চায় তাদের বিরুদ্ধেও দাঁড়ায় না। এ অর্থে 'মধ্যপন্থী' কথাটা প্রশংসাসূচক নয়।

'মৌলবাদী' শব্দটা অর্থের দিক দিয়ে মোটেই খারাপ নয়। যারা কোনো নীতি ও আদর্শকেই মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকে এবং সমাজে তা চালু করার সংকল্প রাখে তাদেরকেই 'মৌলবাদী' বলা যায়। কিন্তু বর্তমানে ইসলামী আদর্শ বিরোধীরা এ পরিভাষাকে এমন চালাকীর সাথে ব্যবহার করে যে, মন্দ অর্থে ব্যবহার করেছে বলেও দোষারোপ করা যায় না। অথচ আলোচনার পূর্বাপর বিবেচনা করলে সমালোচনার দৃষ্টিতে ব্যবহার করেছে বলেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

'গোড়ামি' অর্থ 'গোয়ার্তুমি' বা অযৌক্তিকভাবে কোনো পক্ষে জিদ ধরে থাকা এবং যারা এ রকম প্রকৃতির তাদেরকে 'গোড়া' বলে। এ 'গোড়ামি' ধর্মের ব্যাপারেও হতে পারে এবং অন্য ব্যাপারেও হতে পারে। যখন কেউ ধর্মীয় বিষয়ে ধর্মের মূল উদ্দেশ্যকে না বুঝে অবিবেচকভাবে অসময়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ও অযৌক্তিক পন্থায় বাড়াবাড়ি করে তখনি তাকে 'ধর্মান্ধ' বলে।

'ধর্মনিরপক্ষ' কথা ইংরেজী 'সেক্যুলার' শব্দেরই অনুবাদ। ধর্মকে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা এবং যারা এই নীতিতে বিশ্বাসী তারাই ধর্মনিরপেক্ষ।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ মহিলারা কি রাজনীতির প্রেক্ষিতে ইসলামের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে ?

উত্তর ঃ রাজনীতির সংজ্ঞা যদি মাঠে-ময়দানে নেমে পুরুষের সাথে হাঙ্গামা করা হয়ে থাকে তাহলে এই রাজনীতির বিধান ইসলাম দেয় না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা কে হবেন এ বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মহিলাদের মতামতও নেয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও মহিলাদের ভোটাধিকার আছে। যদি রাজনীতি সম্পূর্ণ মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ হয় তাহলে তাদের ভোটাধিকারও থাকে না। যে দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম আছে সেখানে ইসলামী সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে এবং মহিলাদেরকে ইসলাম যে অধিকার দিয়েছে তা সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের জন্য যতটুকু রাজনীতি করা প্রয়োজন ততোটুকু করা তাদের ইসলামী দায়িত্ব।

যেদেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা নেই সেখানে ইসলামকে কায়েম করার জন্য নারী-পুরুষ সকল মুসলমানদের ওপরই আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন। পর্দার সীমার ভেতরে থেকে মহিলা মহলে ইসলামী দাওয়াতের কাজকে 'রাজনীতি' মনে করে তা থেকে বিরত থাকলে আল্লাহর কাছে আখেরাতে ঠেকতে হবে কিনা সেটা বিবেচনা করা প্রত্যেকেরই নিজের দায়িত্ব।

প্রশ্ন ঃ হরতাল করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ সরকারের ভ্রান্ত নীতি বা অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা 'শ্রেষ্ঠ জিহাদ' বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। এর অর্থ হলো যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা জনগণের শুধু অধিকারই নয়, কর্তব্যও বটে।

এ কর্তব্য বিভিন্ন পন্থায় পালন করা যেতে পারে। যেমন জনসভা, মিছিল, স্মারকলিপি পেশ, সংবাদপত্রে বিবৃতি, বিজ্ঞাপন প্রকাশ ইত্যাদি। হরতালও জনমত প্রকাশের একটি মাধ্যম। তাই হরতালকে শরীয়ত বিরোধী মনে করার কোনো যুক্তি নেই।

জনসভা, মিছিল ও হরতাল শরীয়তসম্মত হলেও এসব যদি উচ্ছৃঙ্খল পদ্ধতিতে করা হয় তাহলে তা অবশ্যই আপত্তিকর। সরকারের পক্ষ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে এ সবকে প্রতিরোধ করা যেমন অন্যায় তেমনি জনমত প্রকাশের নামে জনগণের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাও দূষণীয়। শান্তিপূর্ণভাবে জনমত সংগঠিত করে জনসভা, মিছিল ও হরতাল করা গণতান্ত্রিক অধিকার। ইসলাম এ অধিকারের বিরোধী নয়।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান পাশ্চাত্য ষ্টাইলে যে নির্বাচন হয় তা কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে জায়েজ কি ?

উত্তর ঃ নবী করীম (সাঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যাননি। তারপর কোনো ব্যক্তি নিজে চেষ্টা করে আমীরুল মোমেনীন হননি এবং প্রথম চার খলিফার কেউ নিজের উদ্যোগে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম কোনো ব্যক্তিকে পদ দখল করা বা শক্তি বলে নিজের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কায়েম করার অধিকার দেয়নি।

www.amarboi.org

অবশ্য নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি কী হবে এ বিষয়ে ইসলাম কোনো বিশেষ পদ্ধতি সকল দেশ ও সকল কালের জন্য নির্ধারিত করে দেয়নি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রস্তাবক্রমে মদীনায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেয়ীগণ নির্বাচিত করেন।

হযরত উমর (রাঃ)-কে নির্বাচনের পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। ইন্তেকালের পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সামনে হযরত উমর (রাঃ)-কে পরবর্তী আমীরুল মোমেনীন নির্বাচিত করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে প্রস্তাব করেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাতে সম্মতি দেন। হযরত উমর (রাঃ) ৬ জন সাহাবী (উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ, আবদুর রহমান রাযিআল্লাহ আনহুম) এর একটি প্যানেল তৈরী করে তাদের ওপর খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

সদস্যগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মধ্যস্থকারী মনোনীত হন। তিনি মদীনার ঘরে ঘরে নারী-পুরুষ থেকে মতামত নিয়ে যার পক্ষে বেশী মত সেটা প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ তিনি আধুনিক পরিভাষায় নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন। হযরত আলী (রাঃ) এভাবেই নির্বাচিত হন যেভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীককে মদীনাবাসীগণ নির্বাচিত করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদার এই উদাহরণ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের কেউ নির্বাচনে প্রার্থীও ছিলেন না এবং নিজেদের উদ্যোগেও তাঁরা এই পদ দখল করেননি। তাঁরা অবশ্যই বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত মুসিলম জাতির নিকট এ আদর্শ স্থাপিত হয়েছে যে, মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হবেন। এখন এ নির্বাচন কী পদ্ধতিতে হবে, এ ব্যাপারে কোনো ধরাবাঁধা পদ্ধতি চিরদিনের জন্য চাপিয়ে দেয়া হয়নি। কারণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশে নির্বাচন পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে সে রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র রচনাকারীরাও এ বিষয় ফয়সালা করে নির্বাচনের পদ্ধতি শাসনতন্ত্রে সংযুক্ত করবেন।

বর্তমানে আমাদের দেশ ইসলামী রাষ্ট্র নয় এবং ইসলামী শাসনতন্ত্রও রচিত হয়নি। এ অবস্থায় যারা ইসলাম কায়েম করতে চায় তারা বর্তমান শাসনতন্ত্রকে ভিত্তি করে ক্রমে ইসলামী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।

প্রশ্ন ঃ ভারতবর্ষে ইংরেজী শাসনামলে ইংরেজদের শোষণ-নির্যাতনের শিকার হয়েছিল মুসলমানগণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ। আর ইংরেজদের পুরোপুরি মদদ করার ব্যাপারে ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ। কিন্তু ইংরেজগণ এদেশ হতে চলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ঐ উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানোর সংগ্রামে লিপ্ত হলো। তাই প্রশ্ন, এটা হলো কী করে ?

উত্তর ঃ বর্ণ হিন্দুরা ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার ফলে যে আধুনিক শিক্ষা পেলো সেই শিক্ষাই তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করলো। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে তারা যে ইউরোপ-আমেরিকার ইতিহাস পড়ার সুযোগ পেলো তাতেও বহু স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলো।

www.amarboi.org

তদুপরি তারা অনুভব করলো আজ হোক কাল হোক, একদিন ইংরেজকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতেই হবে। সুতরাং একমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হস্তগত করা সম্ভব। এসব কারণেই তারা শিক্ষা, সরকারী চাকরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তারের পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জনের জন্য ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে শরীক হলো। সরকারী উচ্চপদে প্রধানতঃ তারাই অধিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতা যখনই হাতে আসবে তখন যোগ্যতার সঙ্গে দেশ শাসন করতে পারবে বলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল।

তা ছাড়াও স্বভাবগতভাবে কোনো জাতির পক্ষেই স্থায়ীভাবে পরাধীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয়। মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার পর বর্ণ হিন্দুদের কোনো ক্ষতিই হয়নি। তাই নতুন প্রভুদের সাথে সহযোগিতা করে মুসলিম জাতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার নীতি অবলম্বন করা তাদের জন্য স্বাভাবিক ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনার ধারণায় বাংলাদেশে কি নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব? ইসলামের ইতিহাসে কি কোথাও নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হয়েছে?

উত্তর ঃ ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহ তায়ালা দু'টি শর্ত রেখেছেন। প্রথম শর্ত হলো, ইসলাম কায়েম করার যোগ্য একদল লোক তৈরি করতে হবে। কারণ যাদের মন-মগজ ও চরিত্র ইসলাম অনুযায়ী গঠিত নয় তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেও তাদের দ্বারা ইসলাম কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামী আদর্শে লোক তৈরি করা ছাড়া ইসলামের বিজয় অসম্ভব।

ইসলামের বিজয়ের দ্বিতীয় শর্ত হলো, যে সমাজে ইসলামের বিজয়ের জন্য চেষ্টা করা হয় সে সমাজের জনগণ যদি ইসলাম বিরোধী না হয় তাহলে সেখানে ইসলাম কায়েম হওয়া সম্ভব। আর যদি জনগণের অধিকাংশ ইসলামের সমর্থক হয় তাহলে বিজয় অনিবার্য। কিন্তু ইসলাম কায়েমের উপযুক্ত লোকদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব না আসা পর্যন্ত বিজয় অসম্ভব।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে যে, ইসলাম কায়েমের উপযুক্ত লোক তৈরি হওয়ার পর তাদের হাতে ক্ষমতা আসার উপায় কী? এ বিষয়ে প্রধান কথা হলো যে, ইসলামী নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা আসা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

সূরা আন নূর-এর ৫৫ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন—একদল 'মুমিন' ও 'সালেহ' লোক যোগাড় হলে তিনি তাদের হাতে অবশ্যই ক্ষমতা তুলে দিবেন।

কিন্তু ইসলামকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর আল্লাহ তায়ালা জরবদস্তি করে ইসলামকে চাপিয়ে দেন না। এ থেকে বোঝা গেল যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলাম বিজয়ী হবে না।

ইসলামের বিজয়ের জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন যেহেতু অপরিহার্য সেহেতু নির্বাচনের মাধ্যমেও ইসলামী সরকার কায়েম হওয়া সম্ভব। যদি নির্বাচনের

www.amarboi.org

সুযোগ না থাকে এবং জনগণ ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাহলে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেও ইসলামের বিজয় আসতে পারে।

নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতি পূর্বে চালু ছিল না। তাই কোনো দেশে নির্বাচনের মাধ্যমেই ইসলামী সরকার গঠিত হয়নি বলেই ভবিষ্যতে সম্ভব নয়, সে কথা অযৌক্তি। আমাদের দেশে জনগণ ইসলামের সমর্থক হওয়ায় এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী সরকার কায়েম হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে নির্বাচনের যে দুর্নীতি চালু আছে এ অবস্থায় তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া জনগণ ইসলাম সমর্থন করলে ইসলাম কায়েম করার জন্য বিভিন্ন ময়দানে যে পরিমাণ লোক তৈরি হওয়া দরকার তা এখনো তৈরি হয়নি। লোক তৈরি হলে তাদেরকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্বাচনকেও মাধ্যম বানাতে পারেন অথবা গণঅভ্যুত্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। সর্বস্তরে ইসলাম কায়েমের যোগ্য লোক তৈরির আন্দোলন যখন বিজয়ের নিকটবর্তী হবে তখন নির্বাচনের দুর্নীতি দূর করাও সম্ভব হতে পারে।

আমরা নির্বাচনকে বিজয়ের একমাত্র পথ বলে মনে করি না। ইসলামী দাওয়াত, সংগঠন ও তরবিয়াত (প্রশিক্ষণ)-এর মাধ্যম হিসেবে আমরা নির্বাচনকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করি। যেহেতু সশস্ত্র বিপ্লব বা জোর করে ক্ষমতা দখল করা নবীদের নীতি ছিল না সেহেতু জনসমর্থন যোগাড়ের জন্য নির্বাচনকে একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করাই সঙ্গত। কিন্তু বিজয়ের চূড়ান্ত পন্থা আল্লাহর মর্জির ওপরই নির্ভর করে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি কী হবে এবং ভোটার কারা হবে ?

উত্তর ঃ নির্বাচনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোটাররা তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করে কাদের হাতে সরকারী ক্ষমতা থাকবে তা নির্নয় করা। আধুনিক নির্বাচনের উদ্দেশ্য এটাই। কিন্তু নৈতিকতার অভাবে কাগজে-কলমে পদ্ধতি সুন্দর করে লেখা হলেও বাস্তবে তা পালন করা হয় না। যেমন পদ্ধতিতে আছে, নির্বাচনের জন্য যে দরখাস্ত করতে হয় তার নাম হলো 'মনোনয়নপত্র' অর্থাৎ ভোটারদের পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনের জন্য প্রস্তাব করা। ঐ ফরমের নাম কোথাও 'প্রার্থীপত্র' লেখা হয় না। দেখা যায় কোনো ব্যক্তি নিজেই প্রার্থী হয় এবং কিছু লোককে দিয়ে তার নাম প্রস্তাব করায়। অথচ প্রার্থী হওয়াটা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর। কারণ নির্বাচিত হওয়ার পর যে কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে সে দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেই গরজ করে অগ্রসর হওয়া এবং এর জন্য নিজের পক্ষ থেকেই টাকা-পয়সা খরচ করা কোনো সৎ উদ্দেশ্যের পরিচায়ক নয়। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে জনগণের খেদমত করার এ আগ্রহ নিঃস্বার্থতার পরিচয় বহন করে না।

এভাবেই বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিতে মৌলিক কোনো খারাবি না থাকলেও স্বার্থপরতার কারণে বাস্তবে অসংখ্য খারাবি সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলামী রাষ্ট্রে এসব খারাবির কোনো সুযোগ দেয়া হবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে ভোটার কারা হবে সেটা সেই রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র নির্ধারণ করবে। প্রত্যেক দেশেই শাসনতন্ত্রে ভোটারদের বয়স, যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণও তা উল্লেখ করবেন।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের অবস্থা দারুল হরব, না দারুল ইসলাম ?

উত্তর ঃ যে দেশ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ইসলামী সরকার আছে এবং যেখানে ইসলামী আইন-কানুন চালু আছে তাকেই 'দারুল ইসলাম' বলে। যে রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তাকেই 'দারুল হরব' (শত্রু রাষ্ট্র) বলে। 'হরব' শব্দের অর্থ 'যুদ্ধ'। বাংলাদেশে এই দুই অবস্থার কোনোটাই নেই। তাই বাংলাদেশ দারুল হরবও নয়, দারুল ইসলামও নয়। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এটাকে দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য চেষ্টা চলছে।

প্রশ্ন ঃ আগষ্ট' ৮৭ সংখ্যা মাসিক পৃথিবীতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ' প্রবন্ধে আপনি বলেছেন যে, পাকিস্তানের ইতিহাস ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেরই কলঙ্কময় ইতিহাস। আপনার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের জন্মকথা পড়ে আমি যে জ্ঞান অর্জন করলাম এতে পাকিস্তানকে আপনি যেভাবে কটাক্ষ করেছেন এর অর্থ আমার বোধগম্য নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ আমার যে লেখাটাকে আপনি পাকিস্তানের প্রতি কটাক্ষ বলে মনে করেছেন তার সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করে আপনার ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করছি।

"মুসলিম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম কামাল পাশাই তুরস্কে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিপূর্বে মুসলমানগণ এরূপ নির্লজ্জভাবে দুনিয়াময় প্রচার করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেছে বলে কোনো নজীর পাওয়া যায় না। এমনকি যে পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হয়েছিল সেখানেও এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী প্রভাবশালী লোক ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকাশ্য সমর্থক। পাকিস্তানের ইতিহাস ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেরই কলঙ্কময় ইতিহাস।"

এখানে আমি একথাই বলতে চেয়েছি যে, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে একমাত্র তুরস্কেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পাকিস্তানেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলেই ইসলামী রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে সে রাষ্ট্রটি কায়েম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ইসলাম কায়েম হয়নি। পাকিস্তান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ষড়যন্ত্র ও ইসলামী আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই তা হয়নি। আমি এ দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছি।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হয়েও কেন ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে না ? এজন্য কী প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হওয়ার জন্য দুটো শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত হলো, যে দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার প্রচেষ্টা চলে সেই দেশের লোকদের মধ্য থেকে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী যোগাড় হতে হবে। লোক তৈরি করা না হলে দেশের সকল মানুষ মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও ইসলামী রাষ্ট্র আপনা-আপনিই কায়েম হয়ে যাবে না। দ্বিতীয়তঃ দেশের অধিকাংশ জনগণ

www.amarboi.org

যদি ইসলামের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকে তাহলে প্রথম শর্ত পূরণ হলেও সে দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়। তাই দ্বিতীয় শর্ত হলো, জনগণের সক্রিয় বিরোধী না হওয়া।

নবী করীম (সাঃ) মক্কায় ১৩টি বছর পর্যন্ত এক জামায়াত লোক তৈরি করার পর তাদেরকে নিয়েই মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হলেন। লোক তৈরির কাজ মক্কায় হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় শর্তটির অভাবে মক্কায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে পারেনি। দ্বিতীয় শর্তটি মদীনায় পাওয়া গেল। মদীনার লোকেরা সকলে ইসলাম গ্রহণ না করলেও জনগণ সক্রিয় বিরোধী ছিল না।

বাংলাদেশের বেলায় দেখা যায়, এখানকার জনগণ ইসলামী আদর্শের বিরোধী নয়, বরং অধিকাংশ মানুষ ইসলামের পক্ষে রয়েছে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের দ্বিতীয় শর্তটি বাংলাদেশে ভালোভাবেই রয়েছে। সুতরাং প্রথম শর্তটি পূরণ হলেই বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়া সম্ভব। এটা কতবড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল (সাঃ)-এর জন্মভূমিতে যে শর্তটি পাওয়া যায়নি তা বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে। এ সত্ত্বেও যদি বাংলাদেশের মুসলমানগণ প্রথম শর্তটি পূরণ করতে ব্যর্থ হন তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে?

আল্লাহ তায়ালা সূরা আন নূর-এর ৫৫ আয়াতে সুস্পষ্ট ওয়াদা করেছেন যে, প্রথম শর্তটি পূরণ হলে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ অবশ্যই দিবেন। সুতরাং বাংলাদেশে শুধু এ শর্তটি পূরণের অভাবেই এ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে পারেনি। এ দেশে ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রমিকসহ সর্বশ্রেণীর মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি করার যে আন্দোলন চলছে তার সাফল্যের ওপরই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়া নির্ভর করে। তাই যারা চান যে, এ দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হোক তাদের অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন না করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার আকাঙ্খা করা অর্থহীন।

প্রশ্ন ঃ ভোট একটি পবিত্র আমানত। কিন্তু কোন নির্বাচনে যদি নির্ভরযোগ্য (সৎ ও যোগ্য) কোন প্রার্থী না থাকে তখন কি ভোটদান বিরত থাকাটা ভালো হবে, না মন্দের ভালো হিসেবে কোনো প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে? যুক্তি সহকারে জানতে চাই।

উত্তর ঃ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের সাথে প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য জড়িত। ইউনিয়ন থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত যাদের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার নিয়ম রয়েছে তারা যদি সৎ হয় তাহলে তাদের দ্বারা সমাজের মঙ্গল আশা করা যায়। তারা যে মানের চরিত্রের অধিকারী সে মানেই তারা জনগণের মধ্যে কাজ করেন। এ কারণেই তারা চরিত্রবান না হলে তাদের দ্বারা সমাজের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়।

এ অবস্থায় যাদের ভোটে তারা নির্বাচিত হন তাদের দায়িত্ব বিরাট। ভোটাররা যদি সত্যই নিজেদের কল্যাণ চান তাহলে ভোটপ্রার্থীদের মধ্যে যারা তুলনামূলকভাবে

www.amarboi.org

সৎ ও যোগ্য তাদেরকেই নির্বাচনে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। শুধু নিজের ভোটটা দেয়াই যথেষ্ট নয়, যাতে খারাপ লোক বিজয়ী না হয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো লোকেরাই বিজয়ী হয় সে চেষ্টা করাও জরুরী। তা না হলে যে ভোটাররা ভালো লোককে ভোট দিলেন তাদের ভোটের কোনো মূল্য থাকবে না।

এ থেকেই একথাই প্রমাণিত হয় যে, ভোটের ক্ষমতা এক পবিত্র আমানত। প্রকৃত ভালো লোক প্রার্থীদের মধ্যে নেই বলে ভোট দান থেকে বিরত থাকা ঐ আমানতের খেয়ানত। যদি সত্যিকার ভালো প্রার্থী না-ও থাকে। তবু প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে কম মন্দ লোককে বিজয়ী করার চেষ্টা করা কর্তব্য। এ কর্তব্যে অবহেলার ফলে যদি অধিকতর মন্দ লোক নির্বাচিত হয় তাহলে এর জন্যও আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান গণতন্ত্রে ইসলামের স্বীকৃতি কতটুকু ? ইসলামী গণতন্ত্রের স্বরূপ জানতে চাই।

উত্তর ঃ পাশ্চত্য গনতন্ত্রের মূল কথা হলো—

১. সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতে অথবা জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্টের হাতে।

২. দেশ শাসনের অধিকার একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই।

৩. জনগণের স্বার্থরক্ষা ও সঠিকভাবে দেশ পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতা করার সুযোগ থাকতে হবে।

গণতন্ত্রের উপরোক্ত তিনটি প্রধান মূলনীতির মধ্যে শেষের দুটোর সাথে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদী মিল রয়েছে। কিন্তু প্রথম মূলনীতির ব্যাপারে ইসলামের সাথে বুনিয়াদী পার্থক্য আছে।

সার্বভৌমত্বের যে সংজ্ঞা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত তা কোনো যুক্তিতেই জনগণ বা পার্লামেন্টের হাতে থাকা সম্ভব নয়। প্রফেসর লাসকী 'সার্বভৌমত্ব' কার হাতে ন্যস্ত এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে, 'সার্বভৌমত্ব' আসলেই অস্তিত্বহীন। অথচ আইনের স্বীকৃত সংজ্ঞাই হলো 'সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছা।' যে কোনো দেশে আইনের ব্যাপারে সর্বশেষ ক্ষমতা কার তা নির্ধারিত থাকা জরুরী। আইনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকেই 'সার্বভৌমত্ব' বলা হয়। যুক্তির বিচারে এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই আছে বলে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।

আল্লাহই 'একমাত্র সার্বভৌম শক্তি' এবং তিনি আইনের প্রধানতম উৎস। জনগণ এবং পার্লামেন্ট আল্লাহর আইনের অধীনে যেকোনো আইন রচনার অধিকার রাখে ; কিন্তু আল্লাহর আইনের বিপরীত কোনো আইন রচনার অধিকার কারো নেই। এটাই ইসলামী গণতন্ত্রের মূল কথা। আর এখানেই ইসলাম ও আধুনিক গণতন্ত্রের মূল পার্থক্য।

প্রশ্ন ঃ সাম্প্রতিককালে কথা উঠেছে, ইসলামে নাকি গণতন্ত্র নেই। আমার ধারণা হলো ইসলামে পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র নেই। তবে ইসলামী গণতন্ত্র বা ইসলামে যে

www.amarboi.org

গণতন্ত্র আছে এ সম্পর্কেও আমার ধারণা খুবই অস্পষ্ট। তাই ইসলামে গণতন্ত্রের স্বরূপ কী হবে, জানাবেন কি ?

উত্তর ঃ ইসলাম ও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কে। ইসলামের মতে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। আর পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের দাবী করা হয়। যদিও প্রকৃত বিশ্লেষণে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট সার্বভৌমত্ব আছে বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ সার্বভৌমত্বের এমন কতক বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানে স্বীকৃত—যা জনগণ বা জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল কোনো সংস্থার হাতে আছে বলে প্রমাণ করা যায় না। প্রফেসর লাস্‌কী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গ্রামার এণ্ড পলিটিক্স'-এ সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে, সার্বভৌমত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ তিনি সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো কোথাও আছে বলে প্রমাণ করা সম্ভব মনে করেননি। যদি তিনি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখতেন তাহলে সহজে এ সমস্যার সমাধান পেতেন।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সে কথা বাদ দিলে গণতন্ত্রের বড় বড় তিনটি পয়েন্টে ইসলামের সাথে কোনো বিরোধ নেই।

জনগণের সম্মতি ব্যতীত সরকারী ক্ষমতা দখলের অধিকার কারো নেই। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলকভাবে ক্ষমতা দখল করা জঘন্য অন্যায়।

সরকারের সমালোচনা করা, সরকারী সিদ্ধান্তের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করা ও তার সংশোধন করার চেষ্টা করা জনগণের শুধু অধিকারই নয় দায়িত্বও।

আইনের নিকট সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আইনের ভিত্তিতে সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়ার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন ঃ ফিলিস্তিনে ইহুদী আগ্রাসনের পেছনে ইহুদীদের দাবী কী এবং তাদের দাবীর যৌক্তিকতা কী ?

উত্তর ঃ ফিলিস্তিনে ইহুদীদের কোনো আইনগত বা রাজনৈতিক দাবী থাকতে পারে না। হাজার বছরেরও অধিককাল ফিলিস্তিনে আরব মুসলমানরা বসবাস করে এসেছে। ১৮ ও ১৯ শতাব্দীতে যখন ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি মুসলিম দেশগুলো আগ্রাসনের মাধ্যমে দখল করে নেয় তখন ফিলিস্তিনও ইংরেজদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সারা বিশ্বের ইহুদী জাতি ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়াকে বিপুল অর্থ সাহায্য দান করে। ইহুদীরা 'সংখ্যায়' বিরাট না হলেও একটি 'সম্প্রদায়' হিসেবে

www.amarboi.org

বিশ্বে সবচেয়ে ধনী জাতি এবং আমেরিকার অর্থনীতিতে এদের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। এর ফলে আমেরিকার প্রচার মাধ্যম ইহুদী অর্থের নিয়ন্ত্রণে চলে। এমনকি ইহুদী অর্থ ব্যতীত কোনো সরকারের পক্ষে নির্বাচনে বিজয় হওয়া সম্ভব নয়। ইহুদীদের বিরাট অংশ হিটলারের আমলে জার্মানী থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে একটি ধনী জাতি হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার কোথাও তাদের কোনো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। তাদের সাহায্যে হিটলার পরাজিত হওয়ার পর ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ার নিকট ইহুদীরা ফিলিস্তিনকে তাদের নিজস্ব আবাসভূমি হিসেবে দান করার দাবী জানায়। ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনের লক্ষ লক্ষ আরব মুসলিম অধিবাসীদেরকে তাদের হাজার বছরের আবাসভূমি থেকে উৎখাত করা হয়। মানবতার এর চেয়ে বড় অপমান আর কী হতে পারে ?

ইতিহাস-ঐতিহ্য

প্রশ্ন ঃ আদিম যুগ বলতে কোন্ যুগের কথা বলা হয় ? সর্বপ্রথম মানব হলেন আদম (আঃ)। তিনি তো আমার জানামতে অসভ্য ছিলেন না। অথচ বইয়ে পড়েছি, আদিম যুগের মানুষেরা নাকি অসভ্য ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা নাকি কাপড় পড়তে জানতেন না। কাঁচা গোশত খেতেন। তাঁরা নাকি বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান বলতে কিছু ছিল না। এগুলো কি সত্যি ?

উত্তর ঃ মানব জাতির সঠিক ইতিহাস অজানাই রয়ে গেছে। ইতিহাস হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য লেখা থেকে মাত্র দুই-আড়াই হাজার বছরের পূর্বের অবস্থা পর্যন্ত মোটামুটি জানা যায়। এর পূর্বের ইতিহাস গবেষকগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় থেকে যেটুকু ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা করেছেন তা-ও দশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত মানব সভ্যতার সামান্য ইংগিত দেয় মাত্র। এসবকে সঠিকভাবে ইতিহাসের মর্যাদা দেয়া যায় না। সুতরাং এর পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে যারাই কিছু বলার চেষ্টা করেছেন তা নিতান্তই আন্দাজ-অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

'মানুষ' নামক জীব কত বছর পূর্ব থেকে দুনিয়ায় বসবাস শুরু করেছে—এ বিষয়েও আজ পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন যুক্তির ভিত্তিতে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব লক্ষ লক্ষ বছর আগে হয়েছে বলে দাবী করা হয়। এ অবস্থায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরা যা কিছু লিখেছেন সেসব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হলেও এসবকে রূপকথার কল্পকাহিনীর চেয়ে বেশী উচ্চ মর্যাদা দেয়া যায় না। মানব জাতির স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে কুরআন মজীদে যেটুকু ইংগিত দিয়েছেন তা থেকে সুস্পষ্ট যে, প্রথম যে মানুষটিকে দুনিয়ায় পাঠানো হয় তাঁকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং সভ্যতার শিক্ষক ও নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

www.amarboi.org

একথা ঠিক যে, আল্লাহ তায়ালা এ বস্তুজগৎকে ব্যবহার করার অধিকার শুধু মানুষকে দিয়েছেন এবং মানুষের জন্যই জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এ বস্তুজগৎকে ব্যবহার করার ব্যাপারে আজ মানুষ যতটা অগ্রসর হয়েছে, হাজার হাজার বছর পূর্বের মানুষ এটুকু কল্পনাও করতে পারতো না। 'আদিম যুগ' বলতে এটাই বুঝায় যে, মানুষ এককালে লোহাকে একটু ধারালো অস্ত্র হিসেবে তৈরি করে তার দ্বারা পশু-পক্ষী শিকার করতো এবং তাদের জীবিকা অর্জন করতো। তারপর ধীরে ধীরে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্রমে ক্রমে আজ এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছে।

বস্তুজগৎকে কাজে লাগাবার এই প্রচেষ্টাকেই আমরা 'বিজ্ঞান' বলে থাকি। আর এ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই শুধু এককালে মানুষ অনেক পেছনে ছিল। তখন মানুষ গাড়ি কাকে বলে জানতো না, আকাশে উড়বার কথা কল্পনাও করতে পারতো না বা স্বয়ংক্রিয় মেশিন সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখতো না। তাই বলে কি তারা মনুষ্যত্ব, মানবিক মূল্যবোধ উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং মানুষের কল্যাণচিন্তা থেকেও বঞ্চিত ছিল ? বরং আমরা এটাকে দেখতে পাই যে, আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে বিপুল বস্তুগত শক্তি দান করেছে; কিন্তু আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ও নৈতিকতাবোধ থেকে বঞ্চিত হয়ে বড় বড় শক্তিমান জাতি আজ বিজ্ঞানের বলে চরম বর্বরতার পরিচয় দিচ্ছে। তাই সমাজ বিজ্ঞানীদের কল্প-কাহিনী আর যা-ই হোক, ইতিহাস পদবাচ্য নয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে আদম ও হাওয়া (আঃ) দুনিয়ার প্রথম মানুষ। তাহলে ইতিহাসে বর্ণিত আদিম যুগের মানুষ 'বন্য মানুষ' এগুলো কি মিথ্যা ? সভ্য আদমের সন্তানেরা অসভ্য হলো কী করে ? কিভাবে সভ্য বনী আদম জংলী হলো ? আর এ আদম সন্তানদের ভাষায় এত বিভিন্নতা কেন ? আদম ও হাওয়ার ভাষা কী ছিল ? তাওহীদবাদী বনী আদম কিভাবে কখন থেকে মূর্তি পূজারী হয়ে গেল ?

উত্তর ঃ কুরআন থেকে একথাই জানা যায় যে, আদম ও হাওয়াকে সভ্য মানুষ হিসেবেই আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে আল্লাহর শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে মানুষ অসভ্যে পরিণত হয়েছে। এ কারণেই যখনি মানুষ নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়ে বর্বর জীবন যাপন করেছে তখন আবার তাদের নিকট আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন।

শেষ নবীর উম্মতের মধ্যে যারা নবীর আদর্শ জানেও না, মানেও না তাদের মধ্যে কি পশু চরিত্রের লোক নেই ? বন্য মানুষ আসলে মানুষ নয়, তারা ভিন্ন এক সৃষ্টি। আজও বন্য মানুষ দুনিয়ায় আছে। মানুষের মতো তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও নৈতিকতাবোধ নেই। কিন্তু বিভিন্ন উপজাতি দুনিয়াতে এমন আছে যারা সভ্য দুনিয়ার জীবন যাপন পদ্ধতি থেকে বঞ্চিত। তাদের পোশাক, খাদ্য ইত্যাদি দেখে আমরা তাদেরকে জংলী মনে করি। কিন্তু তারা বন্য মানুষ নয়। তারা আসলে মানুষ এবং তাদের মধ্যেই শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন করে দেখা গেছে যে, তারা সভ্য মানুষের মতোই বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ।

এক আদম সন্তানের ভাষা বিভিন্ন কেন হলো—এটা সমাজ বিজ্ঞানের খুবই চমৎকার বিষয়। সমাজ বিজ্ঞানীরা বহু কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের দেশে জনগণের

www.amarboi.org

মাতৃভাষা বাংলা কিন্তু চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, দিনাজপুর, রাজশাহী ও খুলনার গ্রাম্য লোকদের ভাষায় এমন পার্থক্য রয়েছে যে, একের ভাষা অপরের বোঝাই কঠিন। অথচ এরা সবাই বাংলাই বলছে। সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষার এই ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন তারা কয়েকশত বছর পূর্বের বাংলা শিখতে গিয়ে আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করে শিখতে বাধ্য হন।

আদম ও হাওয়ার ভাষা কী ছিল সেটা আমাদের জানা নেই।

নবীগণ যুগে যুগে তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন অথচ এ শিক্ষা থেকে যারা সরে গিয়েছে তারাই ক্রমে ক্রমে মূর্তিপূজা ও অন্যান্য গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন—'মূলতঃ মানুষের রং ও ভাষার বিভিন্নতা মহান রাব্বুল আলামীনের নিদর্শনসমূহের অন্যতম।' (সূরা আর-রূম)

গান-ছায়াছবি ও খেলাধুলা

প্রশ্ন ঃ ছায়াছবি আমি দেখি না। খেলাধুলার প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। কিন্তু রেডিও আমার প্রিয়। ২০ শে আগষ্ট সংখ্যা সোনার বাংলা পড়ে জানতে পারলাম বাদ্যযন্ত্রসহ গান শোনা হারাম। এখন আমার উপায় কী হবে? তাছাড়া বেশীর ভাগ কণ্ঠই তো মহিলাদের।

উত্তর ঃ মোমিনের রুচিকে আল্লাহর পছন্দের অনুগত করতে হবে। হাদীস শরীফে আছে—'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের পূর্ণ অনুগত না হবে।' (শরহুস সুন্নাহ)

যে কারণে আপনি ছায়াছবি দেখা বাদ দিয়েছেন সে কারণে এটাও বাদ দিন। বাদ্য ছাড়াও যে গান তৃপ্তি দিতে পারে তা 'সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী' এবং আরও কিছু ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রমাণ করেছে।

তাছাড়া রেডিওর খুব কম গানই শোনার যোগ্য। যে গান মনে আল্লাহর পছন্দনীয় ভাব সৃষ্টি করে না, বরং প্রবৃত্তির বাসনাই জাগ্রত করে সে গান বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হলেও শোনা উচিত নয়।

তাই রেডিওর গানের নেশা বাদ দিয়ে সাইমুমের মতো শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং আপনার সংগীত পিপাসা সঠিক পথে মিটাবার সুযোগ নিন।

প্রশ্ন ঃ শরীয়ত কি কি খেলা ও গান জায়েজ করেছে?

উত্তর ঃ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়াম স্বরূপ বৈধ সীমার মধ্যে খেলাধুলা জায়েজ। ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খেলাধুলা করা যায়। তবে খেলাকেই প্রধান পেশা বানানোর যুক্তি আমার বুঝে আসে না। অবশ্য খেলার শিক্ষক হিসেবে পেশা হতে পারে। আল্লাহর দরবারে প্রত্যেকের জীবনেরই হিসাব দিতে হবে। তখন এ পেশার হিসাব কিভাবে

www.amarboi.org

দেয়া যাবে ? সারাটা জীবন যে খেলাধুলা করে কাটিয়ে দিলো সে কী হিসাব দেবে ? দুনিয়ায় আল্লাহ মানুষকে যেসব দায়িত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে খেলার উদ্দেশ্যে খেলা কোনো দায়িত্ব হতে পারে না। তাই ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে খেলাও কোনো পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিসংগত নয়। যে গানে আল্লাহর স্মরণ ও পবিত্র ভাব বজায় থাকে সে গান শোনা যায়। গানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হারাম। ভক্তিমূলক গানে অনেক সময় ভালো কথা থাকে। কিন্তু বাদ্যের যন্ত্রণায় সেগুলো বুঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্রাটও ছিলেন। তিনি বলেছেন—'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কথার বাহনের ধার ধারে না। দুর্বল সঙ্গীতের পক্ষে উচ্চলোকে বিচরণের জন্য কথার বাহনের উপর ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না।'

উপরোক্ত কথাতেই বুঝা যায়, সঙ্গীত সুরই মূখ্য উপাদান। আর সঙ্গীতের উদ্দেশ্য যদি সুর থাকে তাহলে সে সঙ্গীত জায়েজ নয়।

গান গাওয়া বা শোনা তিনটি শর্তে জায়েজ ঃ

১। বাদ্যযন্ত্র থাকবে না ২। কথায় পবিত্র ভাব থাকবে ৩। পুরুষ নারীদের গান শুনবে না, নারী পুরুষের গান শুনবে না (স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ব্যতীত)।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্র হলে সাংস্কৃতির অবস্থা কিরূপ হবে ?

উত্তর ঃ আজকাল নাচ-গান ও নাটক জাতীয় বিষয়কে 'সংস্কৃতি' মনে করা হয় বলেই অনেকে এ প্রশ্ন করে থাকেন। যেহেতু নাচ-গান ও নারী-পুরুষের মিশ্র নাটক ইসলামে জায়েজ নয় সেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র হলে সংস্কৃতিই খতম হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়। সংস্কৃতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাবই এ ভুল ধারণার কারণ।

সংস্কৃতি এত ব্যাপক বিষয় যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়ে। ইসলামই যার সংস্কৃতি তার জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছুই ইসলাম অনুযায়ী গড়ে ওঠে। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকেই সংস্কৃতি বলা হয়। ইসলামে 'দ্বীন' শব্দ যত ব্যাপক সংস্কৃতিরও তেমনি একটি ব্যাপক পরিভাষা।

বাস্তব জীবনে মানুষ যা কিছু করে তার সবই সংস্কৃতির বাহন মাত্র। আকীদাহ বিশ্বাস ও জীবন দর্শনই হলো সংস্কৃতির ভিত্তি। যদি আকীদাহ-বিশ্বাস ও জীবন দর্শন ইসলাম অনুযায়ী হয় তাহলে বাস্তব জীবনের ক্রিয়াকাণ্ডে তা সুস্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়।

সাহিত্য, গান, শিল্পায়ন ইত্যাদি শুধু সংস্কৃতির বাহন নয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, থাকা-খাওয়ার পদ্ধতি, এমনকি বাড়ীর বৈঠকখানা সাজাবার পদ্ধতির মধ্যেও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনদর্শনই সংস্কৃতির ভিত্তি। আর উপরোক্ত বাহনগুলো সে সংস্কৃতির প্রকাশ মাত্র।

যার সংস্কৃতি ইসলাম অনুযায়ী গঠিত তার বাস্তব জীবন সে যে বাহনকেই ব্যবহার করবে তা ইসলামী বিধি-বিধানের সীমার মধ্যেই গড়ে উঠবে। আর যদি সংস্কৃতির ভিত্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে সংস্কৃতির বাহনের রূপও ভিন্ন হতে বাধ্য।

www.amarboi.org

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে সংস্কৃতি খতম হয়ে যাবে না। বর্তমানে সংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতি চলছে তার রূপ বদলাবে মাত্র।

প্রশ্ন ঃ আমি একজন রেডিওর মেকার। মেরামতের কাজের সময় পরীক্ষা করে দেখতে হয় রেডিওটা বাজে কিনা। গান-বাজনা শোনা হারাম হলেও আমাকে বাধ্য হয়ে তখন গান শুনতে হয়। একজন মুসলমান হিসেবে আমার জন্য একাজ জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ রেডিও একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। এ মাধ্যমটি যাদের দ্বারা পরিচালিত তারা যে মনোবৃত্তির লোক রেডিওতে সে ধরনের জিনিসই তারা পরিবেশন করেন। তারা যদি ইসলামী নৈতিকতা মেনে চলতেন তাহলে কোনো সমস্যাই ছিল না। তারা তা করেন না বলেই আপনার জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য রেডিও যন্ত্রটি দোষী নয়।

রেডিও মেরামতের কাজ সাধারণভাবে আপত্তিকর হওয়ার কোনো কারণই নেই। কিন্তু গ্রাহককে রেডিও বাজিয়ে দেখাবার সময় বাদ্যযন্ত্রসহ যদি গান হয় তাহলে আপনাকে তা বাধ্য হয়ে শুনতে হয়। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মনের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে এ গান আপনি না শুনেন তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা এটাকে গুনাহ হিসেবে গণ্য করবেন না।

রেডিওতে শুধু গানই হয় না, যে সমস্ত অনুষ্ঠান রেডিওতে প্রচারিত হয় তার মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয় এমন বহু অনুষ্ঠানও আছে এবং কখন কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে তার জন্য সময়ও নির্ধারিত আছে। আপনি যদি আপনার খদ্দেরদেরকে নিয়ে রেডিও পরীক্ষার জন্য নির্দোষ অনুষ্ঠানের সময়টাকে বাছাই করে নেন তাহলে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি দেখা নাজায়েজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই অনুষ্ঠানগুলোতে পুরুষ-মহিলা উভয়ের অভিনয় হয়। তা দেখলে পুরুষ-মহিলা উভয়ের গুনাহ হয়। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে টেলিভিশনের ভূমিকা কিরূপ হবে যা দেখলে পুরুষ-মহিলা উভয়ে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে এবং উভয়ে অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করতে পারবে ?

উত্তর ঃ টেলিভিশন, সিনেমা, ভিডিও ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। এগুলো বিজ্ঞানের মহান অবদান এবং এসব প্রযুক্তি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এসব নিজে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যাদের হাতে এগুলো পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে তাদের চরিত্র ও নৈতিকতার যে মান তা-ই তারা প্রচার করে থাকে। বর্তমানে রেডিও, সিনেমা ও টেলিভিশন চরিত্র ধ্বংস করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ইসলামী রাষ্ট্রে এ গণ-মাধ্যমগুলোর দ্বারাই উন্নত চরিত্র গঠনের কাজ করা সম্ভব হবে। তখন আপনার মতো নীতিবান লোকদের পক্ষে টেলিভিশন দেখা সওয়াবের কাজ বলেই মনে হবে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য নীতিবান লোকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও ইত্যাদি কি জায়েজ ? মাওলানা সাঈদীর তাফসীর মাহফিল ও আফগান জিহাদের দৃশ্য দেখা কি জায়েজ হবে ?

উত্তর ঃ রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও ইত্যাদিকে প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোফোনের (মাইক) মাধ্যমেও বড় বড় ওয়াজ ও তাফসীর মাহফিলে বেশী লোকের নিকট আওয়াজ পৌছানো হয়।

মাইক্রোফোনের যন্ত্রটা আল্লাহর-ই দান। আল্লাহ পাক মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি দেয়ার ফলে বিজ্ঞান এসব আবিষ্কার করেছে। মাইক্রোফন নিজে নিরপেক্ষ একটি যন্ত্রমাত্র। এর কোনো দোষ নেই। এ মাইক্রোফোনকে কুরআনের তাফসীর করার জন্য যেমন ব্যবহার করা যায় তেমনি মানুষের চরিত্র নষ্টকারী কাজেও ব্যবহার করা হয়। যারা এরকম ব্যবহার করে, দোষটা তাদের।

রেডিও, টেলিভিশন ও ভিডিও-এর বেলায়ও ঐ কথাই প্রযোজ্য। এসব এত শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম যে, এসবের দ্বারা অতি অল্প সময়ে নৈতিকতা, মানবতা ও সামাজিকতা ধ্বংস করার কাজ চলছে। এর জন্য এ যন্ত্রগুলো দোষী নয়। যারা এগুলোকে ব্যবহার করছে তারাই প্রকৃত দোষী। এই যন্ত্রগুলো দিয়ে যদি তাফসীর মাহফিলের বক্তব্য ও দৃশ্য, আফগান জিহাদের চিত্র জনগণের মধ্যে তুলে ধরা হয় তাহলে ইসলামের বিরাট খেদমত হতে পারে। এসব যন্ত্রকে আজ চরিত্র ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ এসবকে চরিত্র গঠন করার জন্য করা সম্ভব। তবে জায়েজ না জায়েজ প্রশ্নটি সম্ভবতঃ এ কারণে তোলা হয় যে, ইসলামে ছবি তোলা হারাম। টেলিভিশন, ভিডিও ও সিনেমায় যেসব দৃশ্য দেখানো হয় তা সেলুয়েডের ফিতায় ধরে রাখা হয়। তা চর্ম-চক্ষে বা কোনো যন্ত্র দিয়েও ছবির মতো দেখায় না। যখন ঐসব সেলুয়েড থেকে ফোকাস করে পর্দায় এর ছায়া ফেলা হয় তখনই এ দৃশ্যগুলো দেখা যায়।

এর উদাহরণ এ রকম, যেমন আয়নায় চেহারা দেখা। চেহারাটা আয়নার সামনে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই দেখা যায়। এরপর আর ছবি দেখা যায় না, ঠিক তেমনি পর্দায় যখনি ফোকাস করা হয় তখনই এটা দেখা যায়। আর ফোকাস বন্ধ করলে তা দেখা যায় না তাই যে কারণে ছবি হারাম সে কারণটি এখানে অনুপস্থিত। এ সেলুয়েড থেকে যদি কেউ ছবি কাগজে ছাপিয়ে প্রচার করে তাহলে তা ছবি বলে গণ্য হবে।

এসব বিবেচনায় ইসলামের নৈতিকতার সীমালংঘন না করে বিজ্ঞানের ঐসব অবদানকে দ্বীনের প্রচার ও মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা জয়েজ বলে গণ্য হতে পারে। আমি ফতোয়ার ভাষায় কথা বলছি না, ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যারা এসব যন্ত্রকে ব্যবহার করার জায়েজ সীমা নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের যুক্তিটুকু শুধু এখানে পেশ করলাম।

www.amarboi.org

ইসলামী সাহিত্য

প্রশ্ন ঃ সাহিত্য রচনায় যে কল্পনার আশ্রয় নেয়া হয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম কী ? যদি নাজায়েজ হয় তাহলে সার্থক সাহিত্য রচনা কি সম্ভব ?

উত্তর ঃ গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নত চরিত্রের নমুনা যদি সাহিত্যে সৃষ্টি করতে হয় তাহলে কল্পনার আশ্রয় অবশ্যই নিতে হবে। বিকৃত সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ক যেভাবে কলুষিত করা হচ্ছে তার মোকাবিলায় বিপুল পরিমাণে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং দ্বীনের স্বার্থেই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক সাহিত্য রচনা করা দরকার। আর এ জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে হলে যেসব ঘটনাবলীর মাধ্যমে চরিত্র সৃষ্টি করতে হয় তা কল্পনা প্রসূত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইসলাম বিরোধী ঔপনাসিক ও নাট্যকারগণ তাদের রচনায় ঘটনাগুলোকে এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করে যাতে পাঠকদের নিকট ধার্মিক লোকেরা চরিত্রহীন, মানবতা বিরোধী ও যালিম হিসেবে চিত্রিত হয়। পাঠকদেরকে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করা ও ধার্মিক লোকদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করাই এ ধরনের সাহিত্যের উদ্দেশ্য। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য সৃষ্টি করা ছাড়া অপসাহিত্যের মোকাবিলা অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব নয়। আর এ সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে কল্পনার আশ্রয় নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রশ্ন ঃ সাহিত্য বলতে কি বুঝায় ? ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা-ইবা কী ? সাহিত্য কি শুধু সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতই দিবে, না সমাধানের বাস্তব পন্থাও পেশ করবে ?

উত্তর ঃ জীবন ও জগত সম্পর্কে সকল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। জীবনের উদ্দেশ্যও বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের দেখা যায়। এই মৌলিক পার্থক্যের ফলেই সৌন্দর্যবোধ ও মূল্যমানের এত বিভিন্নতা মানব সমাজে জটিলতা সৃষ্টি করে চলেছে। ভালো ও মন্দ, সৎ ও অসৎ ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে এ কারণেই মানুষে মানুষে এত পার্থক্য। স্বাভাবিকভাবেই এ বিভিন্নতা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রকট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের সংজ্ঞা, সার্থক সাহিত্যের ধরন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সকলের ধারণা তাই এক রকম হওয়া সম্ভবপর নয়।

এ বাস্তব কথাটি স্বীকার করে না নিয়ে এসব বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে কোনো লাভ নেই। আর মৌলিক বিষয়ে মতভেদ থাকলে শাখা-প্রশাখার বিতর্ক করে কোনো মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব নয়। নিছক ভোগবাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসীদের কাছে ইসলামী পর্দা, রমযানের রোযা, হালাল হারামের বাছাই নিতান্তই বাজে কথা বলে মনে হবে। কিন্তু মানুষের নৈতিক সত্তায় বিশ্বাসীদের নিকট এসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ মৌলিক ব্যবধান বহাল রেখে পর্দা, রোযা ও হালাল-হারাম সম্পর্কে বিতর্ক তোলা অর্থহীন।

www.amarboi.org

সাহিত্য সম্পর্কেও মানুষে মানুষে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা বহাল রেখে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিতর্ক করা মুশকিল। একসময় সাহিত্যের জন্য যখন সাহিত্য রচনা করা আদর্শ বিবেচিত হতো তখন সাহিত্যে মানুষকে পথের সন্ধান দিতো না। তথাকথিত সৌন্দর্য সৃষ্টিই তখন সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিলো। মানুষের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে মাথা ঘামানো সাহিত্যের পক্ষে অমর্যাদার বিষয় মনে করা হতো।

আজ একশ্রেণীর লোক অত্যন্ত গাম্ভীর্যসহকারে পাণ্ডিত্য জাহির করে বলেন— 'সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হওয়া উচিত নয়।' কিন্তু মানুষ কি উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনো কাজ করে? মানুষ প্রত্যেক কাজই বিচার-বিবেচনা করে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যেই করে থাকে। অথচ একমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রেই পাগলের ন্যায় উদ্দেশ্যহীন হওয়ার অর্থ কী?

কতক লোকের ধারণা-'সাহিত্য জীবনের আলেখ্য।' অর্থাৎ ক্যামেরার ন্যায় কেবল সমাজের ছবি এঁকে যাওয়াই সাহিত্যের কাজ। জীবনের প্রতিচ্ছবি মানুষের সামনে তুলে ধরলে মানুষ নিজেই ঠিক পথ বের করবে। সাহিত্য সেখানে পথ নির্দেশকের দায়িত্ব বহন করতে গেলে সে সাহিত্য প্রচারধর্মী হয়ে ওঠবে। কিন্তু এক্ষেত্রে এটুকু বিবেচনা করা উচিত যে, মানুষ ক্যামেরার মতো 'নির্জীব' নয়। একই ঘটনা হতে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন 'সত্য' আহরণ করে। এর কারণ এই যে, মানুষ চোখ দিয়ে যা দেখে তার সঙ্গে মনের রং মিশে যায়। নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার যে রূপ ইউরোপ হতে আমাদের দেশে আমদানী হয়েছে, তাকে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা যখন সাহিত্যেও রূপ দান করে, তখন ক্যামেরার ন্যায় শুধু ফটোই পরিবেশন করে না, বরং তাদের সাহিত্য সেই পশু সভ্যতার মহিমা এমন আকর্ষণীয়রূপে প্রচার করে যে, তা মানুষকে তার কুফল হতে অন্ধ করে ঐ প্রগতির নেশায় উন্মত্ত করে তোলে। আর এটুকু আলেখ্যই যখন উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন সাহিত্যিকের কলমে ফুটে ওঠে তখন পাঠকের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়ে এরূপ প্রগতিকে চরম ঘৃণা করতে শিখে। কিন্তু ক্যামেরায় একই বস্তুর এরূপ বিপরীত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠতে পারে না।

এবার মূল প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাক। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাহিত্যিকগণ নিজস্ব মূল্যবোধ ও মূল্যমান অনুযায়ী মানব সমাজকে অধ্যয়ন করেন। তাঁরা সমাজে যেখানেই ঐ মূল্যবোধের বিপরীত কিছু দেখতে পান তার ছবিকে ভাষা-বর্ণে এমনভাবে এঁকে তোলেন যেন তীব্র কষাঘাত অনুভব করেন।

'শরৎ সাহিত্য' হিন্দু সমাজের বহু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর আক্রমণ করেছে। তাঁর রচিত আলেখ্য সমাজ সংস্কারের দিকে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে বলে তা সফল সাহিত্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেনি? মানব জীবন যতটা ব্যাপক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ততটা বিস্তৃত। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগেই সাহিত্যের প্রবেশাধিকার আছে। তাই সাহিত্য মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক এমনকি আধ্যাত্মিক দিক নিয়েও চর্চা করবে। নারী-পুরুষের পরস্পরের সম্পর্কও স্বাভাবিক-ভাবেই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যিকগণের দায়িত্ব অত্যন্ত

www.amarboi.org

ব্যাপক। তাঁরা জীবনের এসব ক্ষেত্রে আপত্তিকর যা দেখবেন তা এমনভাবে তুলে ধরবেন যাতে সমাজ তা উৎখাত করার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে। আর তাঁরা যা কিছু সুন্দর ও কল্যাণকর দেখবেন তা এমনভাবে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলবেন যাতে পাঠকগণ তা বাস্তব জীবনে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন। সুতরাং এ অর্থে সাহিত্য জীবনের শুধু ছবিই নয়, জীবনে যা আছে তা যেমন সাহিত্যে স্থান পাবে, জীবনে যা হওয়া উচিত তা-ও তেমনি সাহিত্যের উপজীব্য হওয়া উচিত। সাহিত্য সম্বন্ধে এ মৌলিক কথাটুকু বুঝে নিলে ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা সহজভাবেই বোঝা যাবে। যে সাহিত্য ইসলামী জীবন দর্শন ও ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে তা-ই 'ইসলামী সাহিত্য'। জীবন সমস্যাকে ইসলামী দর্শন ও মূল্যমানের দৃষ্টিকোণ হতে সমাধান করতে হলে যে ধরনের সমাজ সংস্কারের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে হবে তার সন্ধান ইসলামী সাহিত্যে মিলবে।

এ হিসেবে সাহিত্য শুধু সমস্যারই আলোচনা করবে না, সমাধানেরও পথ নির্দেশ করবে। তবে সরকারী বিজ্ঞপ্তি বা কোনো সমাজ সংস্কারক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রতি সার্কুলারে যে ভঙ্গিতে সমস্যার উল্লেখ ও সমাধানের পরিকল্পনা পেশ করা হয় তা সাহিত্যের পর্যায়ে আসে না। ঠিক তখনই কোনো রচনা সাহিত্যের মর্যাদার আসন লাভ করে যখন সেখানে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক আবেদন বর্তমান থাকে। সাহিত্য সকল মানুষের নিকটই বিস্তর খোরাক পরিবেশন করে। ইসলামী হোক আর অনৈসলামী হোক, মানব মনের নিকট আবেদনের তাগিদ না থাকলে কোনো রচনাই 'সাহিত্য পদবাচ্য' হতে পারে না।

বিবিধ বিষয়

প্রশ্ন ঃ কাল্‌ব, নাফ্‌স ও রূহ কাকে বলে ? মানব দেহের কোথায় কার অবস্থান ? এদের কার কী কাজ ? মানব দেহের যন্ত্রগুলো কার অধীন ? কালবের, নাফসের অথবা রূহের মৃত্যুর পর ইল্লিয়ীন অথবা সিজ্জীনে কোন্‌টি থাকে ? আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বৃদ্ধির জন্য কোন্‌টির পবিত্রতা ও উন্নতি বিধান প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ মানুষ যখন কোনো কাজ সমাধা করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন যে ইচ্ছাশক্তি ঐ সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করে তাই কাল্‌ব। এ ইচ্ছাশক্তি হৃদয়ের বলের ওপর নির্ভর করে বলেই হার্ট বা হৃপিণ্ডকে কালব বলে। এক হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা পাওয়া যায়—'নিশ্চয়ই শরীরে একটি মাংসের টুকরা আছে, যদি তা সুস্থ থাকে, তবে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, সমস্ত শরীরও বিনষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো তা হচ্ছে কাল্‌ব।' (বুখারী ঃ ঈমান, মুসলিম ঃ মুসাকাত, দারিমী ঃ ব্যবসা, ইবনে মাজা ঃ সিয়াম অধ্যায়)

www.amarboi.org

দেহের যত রকম দাবী আছে তার সবটুকুকেই নাফস বলা হয়। পেটের দাবী শীত ও গরমের আক্রমণ থেকে বাঁচার দাবী, ইন্দ্রিয়ের দাবী, যৌন কামনা ইত্যাদি মিলেই নাফ্স বা প্রবৃত্তি। আর রূহ হচ্ছে আসল সত্তা। ভালো-মন্দের বিচার বোধ বা বিবেককে রূহ বলে। রূহ হচ্ছে মানুষের 'সুমতি' আর নাফ্স হচ্ছে 'কুমতি'। 'জীবন' আর 'রূহ' কিন্তু এক বস্তু নয়, যেমন নিদ্রার সময় জীবন অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু রূহ যত্রতত্র বিচরণ করে। তাই মানুষ নানাবিধ স্বপ্ন দেখে। মনে রাখতে হবে, দেহ ঘুমায়, কিন্তু রূহ ঘুমায় না এবং ক্লান্তও হয় না। রূহই হলো আসল মানুষ, দেহ আসল মানুষ নয়। দেহ পয়দা হবার আগে রূহ পয়দা হয়েছে। রূহকে দেহরূপে যন্ত্র দেয়া হয়েছে কাজ করার জন্য।

নাফ্স আইন বানায়, নির্দেশ দেয় এবং দাবী পেশ করে। আর রূহ রায় দান করে যে, সেই আইন নির্দেশ ও দাবী সঠিক কি না। রূহ ও নাফসের মধ্যে লড়াই চলে, তারপর যার জয় হয় তাই ফয়সালা বলে গণ্য হয়। কাল্‌ব সে ফয়সালাকেই পছন্দ করে। আসলে নাফ্স এবং রূহের দ্বন্দ্বে যে জয়ী হয় তার হুকুমই কাল্‌ব মেনে চলে। 'কাল্‌ব' অর্থ পরিবর্তনশীল। এর থেকে ইনকিলাব শব্দটির বের হয়েছে। যেমন হাদীসে দোয়া আছে—'হে কাল্‌বের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের কাল্‌বসমূহকে তোমার আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।'

মানব দেহের যন্ত্রগুলো কাল্‌ব, নাফ্স ও রূহ এ তিনটির যে কোনোটির অধীন হতে পারে। আল্লাহ চান নাফ্সের দমন করে রূহকে শক্তিশালী করা—যাতে কাল্‌ব আল্লাহর কথামতো কাজ করতে পারে। দ্বীন ইসলামের নির্দেশ হলো, এগুলোকে স্বাধীন রেখো না। রূহের প্রতি নির্দেশ, নাফ্সকে শরীয়তের লাগাম লাগাও। আল্লাহ পাক রূহ দিয়েছেন নাফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। যদি রূহ নাফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তবে উল্টোভাবে নাফ্স রূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। যেমন কোনো নতুন চাকরীজীবী প্রথম প্রথম ঘুষ নিতে লজ্জাবোধ করে, কিন্তু সে যখন ক্রমশঃ ঘুষ খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং পাকা হয়ে ওঠে তখন প্রকাশ্যে ঘুষ নিতেও লজ্জাবোধ করে না। তার মানে এখন তার নাফ্স রূহকে পরিচালিত করছে।

আর কাল্‌বের অবস্থা হলো নাফ্স এবং রূহের এ দ্বন্দ্বে যে জিতে সে তারই সঙ্গে থাকে। রূহ আসলে পবিত্র, তাকে শক্তিশালী করতে হবে। যিকির, নামায, রোযা ইত্যাদি শরীয়তী লাগাম দ্বারা নাফ্সকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। রূহের ভূমিকা হলো, সে নেতৃত্ব দেবে এবং নাফ্স রূহের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে নাফ্সে মোতমায়েন্নায় পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি নাফ্স নেতৃত্ব না মানে তবে তা নাফ্সে আম্মারায় পরিণত হয়ে যাবে। নাফ্স রূহের কর্তৃত্ব মেনে নিলে কাল্‌বও রূহের আনুগত্য করে।

'ইল্লিয়ীন' শব্দের অর্থ উচ্চ স্থান, সম্মানিত স্থান। মৃত্যুর পর নেককার ব্যক্তিদের রূহসমূহ এ স্থানে অবস্থান করে। আর 'সিজ্জীন' শব্দের অর্থ জেলখানার দফতর। বদকার ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর রূহসমূহ এ স্থানে অবস্থান করে। এর বাস্তব অবস্থা ও বিবরণ জানার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নাফ্সের পবিত্রতা সাধন ও কাল্‌বের ওপর রূহের প্রাধান্য লাভ করতে হবে।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ কুরআনে তো অনেক জায়গায় দাসদের কথা আলোচিত হয়েছে, কিন্তু কুরআন কি দাস প্রথাকে উচ্ছেদ করেছে ? যদি তা না করে থাকে, বর্তমানে দাসী রাখা বা দাসীকে ব্যবহার করা যাবে কি না ?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ কুতুব-এর 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম' বইটি পড়লে এ সম্বন্ধে জানা যাবে। এছাড়া মাওলানা মওদূদী (রাহঃ)-এর তাফহীমুল কুরআনের সূরা আন নূরের ৩৩ আয়াতের তাফসীরে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তবে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। কোনো এক মানুষ অন্য মানুষের দাস হওয়া বা কোনো মানুষকে দাস বানানো সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী।

একমাত্র মুসলিম ও অমুসলিম জাতির মধ্যে যুদ্ধের কারণে যদি মুসলিমদের সাথে অমুসলিম পুরুষ ও মহিলা বন্দী হয় এবং শত্রুপক্ষ যদি এই বন্দীদের ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য মুসলিম জাতির সঙ্গে কোনো সমঝোতায় না পৌঁছে তাহলে এই বন্দীদেরকে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান ইসলামে রয়েছে। সেই বিধান অনুযায়ী তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জেলখানায় রাখা মানবতা বিরোধী বলে ইসলাম মনে করে। তাই তাদেরকে প্রথমে 'দাস' এবং 'দাসী' হিসেবে মুসলিমদের পরিবারভুক্ত করে তাদেরকে সমাজে পূর্ণ মানবিক অধিকার দিয়ে গ্রহণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এ যুদ্ধবন্দী ছাড়া আর কোনো প্রকারে কোনো মানুষকে 'দাস-দাসী' হিসেবে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা কিছু দরকার সে সবকিছু করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শয়তানের ধোঁকায় অনেক সময় ঈমানী কর্তব্যে গাফলতি আসে। কিভাবে এই শয়তানের ধোঁকা থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে ?

উত্তর ঃ শয়তান থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলাম সর্বপ্রথমেই মনকে মজবুত করার বিধান দিয়েছে। আল্লাহকে সবসময় হাজির নাজির জানা এবং আখিরাতে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির পূর্ণ চেতনা নিয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমানকে মজবুত করতে হবে। ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য এবং নাফসকে (দেহের দাবী বা প্রবৃত্তি) দমন করার জন্য নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায, মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদের নামায, রমযান মাসের ফরয রোযা ছাড়াও প্রতি চান্দ্র মাসে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে নফল রোযার অভ্যাস করার বিধান রয়েছে। এ ছাড়াও নবী করীম (সাঃ) সবসময় সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। সে পদ্ধতিটা হলো, যে কাজই করবে সে কাজের উপযোগী আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবে। আর যখনই মনে শয়তান 'মন্দভাব' সৃষ্টি করে তখনই 'আউযুবিল্লাহ' ও 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে শয়তান তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

শয়তানের কাজই হলো মানুষের দুর্বল মুহূর্ত খোঁজ করে কুমন্ত্রণা দেয়া, যে ব্যাপারে যার দুর্বলতা আছে সেদিকে সুযোগ মতো উস্কিয়ে দেয়া; আর ঈমানদারদের কাজ হলো সর্বাবস্থায় শয়তান থেকে সাবধান থাকা এবং নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সদা

www.amarboi.org

সচেতন থাকা। শয়তানের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম, মানুষের নিরাপত্তা লাভের চেষ্টা মানুষের আজীবন সংগ্রামের বিষয়। এরপরও যদি ভুলত্রুটি হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট মাফ চাইতে হবে। আল্লাহ মানুষের কাছে নিষ্পাপ হওয়ার দাবী করেন না, আল্লাহ এটাই চান যে, মানুষ পাপ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে কিনা এবং ভুল হয়ে গেলে অনুতপ্ত হয় কি না।

প্রশ্ন ঃ আমাদের এলাকায় 'মিলাদ' নিয়ে কোন্দলের সৃষ্টি হয়েছে। কতক লোক, এটাকে নাজায়েজ বলায় বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তাই 'মিলাদ' সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক সিদ্ধান্ত কী হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ আমাদের দেশে মুসলমানদের মধ্যে 'মিলাদ' ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কারো মৃত্যুতে দোয়ার মাহফিল, নতুন বাড়ী বা দোকান উদ্বোধন, দোয়া সমাবেশ এবং বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মিলাদ করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটা একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

যারা মিলাদ পড়ান তারাও আলেম, আর যারা মিলাদ নাযায়েজ বলে তারাও আলেম। এই কারণে কোনো কোনো এলাকায় মিলাদ জায়েজ-নাজায়েজ সম্পর্কে জনগণ পর্যন্ত দলাদলি চলে। এর ফলে মুসলিম জনগণের মধ্যে ধর্মীয় কোন্দল সৃষ্টি হয় এবং জনসাধারণ আলেমদের দলাদলি দেখে বিভ্রান্ত হয় তাই মিলাদ সম্বন্ধে যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা হওয়া দরকার এবং বিতর্কও যদি করা হয় তা-ও সুন্দর ও ভালোভাবে করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে যতোগুলো মিলাদের অনুষ্ঠান হয় সেখানে আসল উদ্দেশ্য দোয়া করা। মৃতের জন্য দোয়া, দোকানে বরকত হওয়ার জন্য দোয়া, বিয়ে-শাদী উপলক্ষে দোয়া-এরকম বিভিন্ন অবস্থায় দোয়াটাই আসল উদ্দেশ্য। সেই হিসেবে এই মাহফিলগুলোর নাম 'মিলাদ মাহফিল' না রেখে 'দোয়ার মাহফিল' রাখলে ভালো হয়। কিন্তু এটা জোর জবরদস্তি করে চালু করা সম্ভব নয়। কারণ কোনো একটা সামাজিক রীতি জোর করে উৎখাত করতে গেলে উপকারের চেয়ে অপকার হয় বেশী।

'মিলাদ' আরবী শব্দ—যার অর্থ হলো 'জন্মদিন' ১২ই রবিউল আউয়াল নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মদিন। সেদিনে ঈদে মিলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহর জন্মদিন উৎসব পালন করা হয়। কিন্তু আমাদের পাক-ভারত বাংলা উপমহাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে সারা বছর দোয়ার মাহফিলগুলোকে 'মিলাদ' হিসেবে পালন করা হয় না। যদি রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ ও জীবনচরিত আলোচনার উদ্দেশ্যে মাহফিল করা হয় তাহলে এর জন্য পরিভাষা 'সিরাতুন্নবী মাহফিল'। আমাদের দেশে এই পরিভাষাও বেশ প্রচলিত আছে। যদি রাসূল (সাঃ)-এর জীবনী আলোচনার উদ্দেশ্যে এই মিলাদের আয়োজন করা হয়, তবে ১২ই রবিউল আউয়াল মিলাদুন্নবী হিসেবে পালন করা যেতে পারে, কিন্তু সারা বছরই মিলাদ বা জন্মদিন পালন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

আমাদের দেশে মিলাদের মাহফিলে দু'একটি এমন কাজ হয়ে থাকে সে বিষয়ে হাক্কানী (সত্যপন্থী) আলেম সমাজ সঙ্গতভাবে আপত্তি করেন। তার একটি হলো, এ মিলাদে কতকগুলো আরবী গদ এমন বলা হয় যা কুরআন-হাদীসের সাথে মিলে না।

www.amarboi.org

একথাগুলো বলার দ্বারা কোনো উপকারও হয় না। অথচ নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে এত কথা আছে যেগুলো বলে শেষ করা যাবে না। সুতরাং এ বেহুদা কথাগুলোকে বাদ দিলে আপত্তির একটা কারণ দূর হয়। আরেকটি কাজ হলো, মিলাদের শেষদিকে দাঁড়িয়ে নবী (সাঃ)-কে সম্বোধন করে সালাম বলা। মাহফিলের যাবতীয় কাজ বসে বসে করা হলো অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম বলার সময়ে দাঁড়ানোর দরকার হলো। যদি মনে এই ধারণা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 'রূহ' মাহফিলে উপস্থিত হয়েছে এবং তাঁরই সম্মানে দাঁড়াতে হবে তাহলে কুরআন-হাদীসে একথার কোনো ভিত্তি নেই। এ আক্বীদার সঙ্গে দাঁড়ানোকে হাক্কানী আলেমগণ নাজায়েজ বলেন।

রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ অতিবড় সওয়াবের কাজ। রাসূল (সাঃ) নিজেও নামাযের মধ্যে বসা অবস্থায় তাশাহহুদ ও দরূদের মাধ্যমে রাসূলের প্রতি সালাম ও দরূদ পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। যদি এই সালাম ও দরূদ দাঁড়িয়ে পড়লে বেশী সওয়াব হতো তাহলে নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায়ই তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার হুকুম দেয়া হতো। দরূদ ও সালাম দাঁড়িয়ে পড়ার দ্বারা অতিরিক্ত সওয়াব হবে তার কোনো যুক্তি নেই।

এখন কথা হলো মিলাদ মাহফিলে দরূদ ও সালাম দাঁড়িয়ে পড়া হবে, না বসে পড়া হবে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। যার ইচ্ছা বসে পড়ুক, যার ইচ্ছে দাঁড়িয়ে পড়ুক, এ বিষয়ে কারো ওপর কারো জোর খাটানো অন্যায়। কেউ যদি রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বতের জোশে দাঁড়িয়ে যায় তাকে জোর করে বসাবার চেষ্টা করা যেমন অন্যায় আর কেউ যদি না দাঁড়ায় তবে তাকে জোর করে দাঁড়াতে বাধ্য করাও তেমন অন্যায়। আর সারা বৎসর সব দোয়ার মাহফিলকে মিলাদ মাহফিল নাম দেয়াই হাস্যকর ও অযৌক্তিক। 'মিলাদ' শব্দের অর্থ না জানার কারণে এভাবে এ শব্দটির অপব্যবহার চলছে।

প্রশ্ন ঃ নাফ্সের গোলামী অর্থ কী ? নাফ্স কাকে বলে ? আমরা তো খোদার কিতাব এবং রাসূলের হাদীস মোতাবেক চলি। তবু কি আমরা নাফ্সের গোলাম ?

উত্তর ঃ কুরআন এবং হাদীসে নাফ্স দ্বারা দেহের দাবীকেই বুঝানো হয়েছে। আর একটি শব্দ কুরআন শরীফে এ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সেটা হলো 'হাওয়া' যার অনুবাদ করা হয় প্রবৃত্তি।

মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে একটা লড়াই চলে। দেহ যেহেতু বস্তু দিয়ে তৈরি সেহেতু বস্তুজগতের দিকে তার আকর্ষণ স্বাভাবিক। তাই যত কিছু জিনিসকে দেহ দ্বারা ভোগ করা যায় সেটার দিকে দেহ সহজে ধাবিত হয়। দেহের এই আকর্ষণবোধকেই 'নফস' বলে। অপরদিকে 'আত্মা' বা 'রূহ' আল্লাহর এমন এক বিশেষ সৃষ্টি যা ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার যোগ্য। তাই 'দেহ' যখনি যা করতে চায় 'আত্মা' সে সম্পর্কে রায় দেয়। যদি সে কাজটা মন্দ হয় তাহলে আত্মা প্রতিবাদ করে এবং তা থেকে ফিরে থাকার জন্য তাগিদ দেয়। এটাই হচ্ছে মানুষের নৈতিক সত্তা। কুরআনের পরিভাষায় এটাকে বলে 'রূহ'।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ মানবতা কি ধর্মের উর্ধে ? মানবতাবাদের আলোকে যেখানে সকল মানুষ এক অখণ্ড জাতি সেখানে 'বিশ্বাসীরা ভাই ভাই' কুরআনের বর্ণিত এ আয়াত কি সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট (নাউযুবিল্লাহ)।

উত্তর ঃ কেউ আল্লাহর চেয়েও বেশী উদার হওয়ার দাবী করলে বুঝতে হবে সে ইবলিসের পাল্লায় পড়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহর চেয়ে বেশী উদারতা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠতে পারে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মানবিকতা, ব্যবহার এসব দেখে পারস্পরিক হৃদ্যতা সৃষ্টি হতে পারে। আমার এক 'হিন্দু' প্রফেসর বন্ধুকে আমি হাদীসের কথা শোনাতাম। কোনো কোনো কাহিনী শুনে তার চোখে পানি আসতে দেখেছি। কিন্তু সব 'মুসলমান' শিক্ষকদের আমি এসব কথা শোনাতাম না। কারণ তাদের অনেকেরই আগ্রহ ছিল না।

'সকল মুসলমান ভাই ভাই' একথার অর্থ এই নয় যে, অমুসলমানরা মুসলমানদের শত্রু। বরং ভাষা, বর্ণ বা ভূগোলভিত্তিক ভ্রাতৃত্বের ধারণাকে দূর করার জন্য আল্লাহ তায়ালা 'মুসলমান' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। মানুষে মানুষে তফাৎ শুধু এক জায়াগায় অর্থাৎ ঈমান ও আক্বীদার ক্ষেত্রে।

মানবতার কী দৃষ্টান্ত অন্যদের কাছে তা জানি না। তারা কেবল স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই মানবতার দোহাই দেয়। এমন কোনো জিনিস কি তারা দেখাতে পেরেছে যা দুনিয়ার সব মানুষের জন্য কল্যাণকর ?

বিদায় হজ্বের ভাষণে নবী করীম (সাঃ) বলে দিয়েছেন—'সকল মানুষ আদম (আঃ)-এর সন্তান। কোনো আরবের ওপর অনারবের বা অনারবের ওপর আরববাসীর কিংবা শ্বেতাঙ্গ বা অশ্বেতাঙ্গ কারো ওপর অন্যের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) মানবতার যে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন তার চেয়ে উত্তম নজির আর কার কাছে আছে ?

প্রচলিত অর্থে 'ধর্ম' একটা ধোঁকাবাজির শব্দ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) মানবতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটাই 'ইসলাম'। একে কেউ 'ধর্ম' বললে আপত্তি নেই, তবে ইসলাম থেকে মানবতাকে পৃথক করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। মানবতাকে ধর্মের উর্ধ্বে উঠাবার প্রশ্নই ওঠে না, বরং মানবতার শ্রেষ্ঠ বিধানই হলো ইসলাম। ইসলামের মানবতাই মানুষের স্বভাবসুলভ ধর্ম।

প্রশ্ন ঃ কোনো অমুসলিম (হিন্দু) তার কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলমান সহপাঠিকে শুধুমাত্র আপ্যায়ন করানোর জন্য দাওয়াত করলো। এই দাওয়াত রক্ষার ব্যাপারে একজন মুসলমানের কী করা উচিত ?

উত্তর ঃ হিন্দুর ঘরে খাওয়া দোষের নয়। তবে যাতে হারামের আশংকা থাকে না—সেটা খাওয়া চলে। বিশেষ করে 'গোস্ত' খাওয়া কিছুতেই উচিত নয় কারণ হালাল উপায়ে জবেহ করা পশুর গোস্ত কিনা তা জানার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত খাদ্য (যেমন পূজার প্রসাদ) খাওয়াও জায়েজ নয়।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ টেলিভিশন দেখা যাবে কি ? কেননা ওটাকে তো সিনেমাই বলা চলে।

উত্তর ঃ শিল্প হিসেবে সিনেমা নাজায়েজ নয়। ইসলামের সীমার মধ্যে রেখে সিনেমা তৈরি হলে তা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সিনেমা বা টেলিভিশনে শিল্পও নাই, ইসলামের সীমানাও রক্ষিত হয় না। সঙ্গীত, ঘোষণা, খবর প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষ ও মহিলার জোড়া ছাড়া ওদের চলে না। টিভিতে সংবাদ দেখতে গিয়ে মাথা নীচু করে থাকা কি সম্ভব ? তাহলে রেডিও শোনাই তো যথেষ্ট। সবদিক বিবেচনা করলে জনৈক লেখকের মতোই বলা যায়, টেলিভিশন এখন, টেলিভিশন-ই বটে। এখন ঘরে ঘরে সিনেমা। লোকেরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে সেগুলো কি করে দেখে তাই ভেবে অবাক হই। বোঝাই যাচ্ছে আমাদের নৈতিকতার মান শেষ হয়ে যাচ্ছে।

মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান করা যায়— যেখানে পুরুষের অনুষ্ঠান পুরুষরা এবং মহিলাদের অনুষ্ঠান মহিলারা উপভোগ করবে। কিন্তু এমনটা করা হয় না।

প্রশ্ন ঃ নবী (সাঃ) কি 'গুনাহ' করেছিলেন ? তাঁর কি ভুলত্রুটি হয়েছিলো ?

উত্তর ঃ না, যাকে 'গুনাহ' বলে এমনি কোনো কাজ নবী (সাঃ) করেননি। ইচ্ছাকৃত ভুলের কারণে গুনাহ হয়। নবী (সাঃ) কখনও ভুলের ওপর কায়েম থাকতে পারেন না। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে অবশ্যই তা সংশোধন করে দেন। নবী করীম (সাঃ) ছোটখাট কিছু 'ভুল' করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দিয়েছেন। নবী যে 'মানুষ' তাই এতে প্রমাণ হয়। সুতরাং তিনি আরো 'ভুল' করে থাকতে পারেন এমন মনে করার কোনো যুক্তি নেই।

তাঁর আরো ভুল হয়ে থাকলে আরো সংশোধনী আল্লাহ পাঠাতেন এবং কুরআনে তা উল্লেখ করা হতো। তাই যে ক'টি ছোটখাট ভুলের উল্লেখ কুরআনে আছে এ ছাড়া আর কোনো ভুল তিনি করেননি।

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা)-এর অবর্তমানে সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী ইমামগণ এবং বর্তমানে যারা 'উলিল আমর' তাঁরা কি সত্যের মাপকাঠি নয় ? উত্তর যদি 'না' বোধক হয়, তবে কুরআন-হাদীস দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ঃ সত্যের প্রকৃত 'মাপকাঠি' একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না। রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমেই সেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই মানুষ রাসূল (সাঃ)-কেই সত্যের 'মাপকাঠি' হিসেবে গণ্য করতে বাধ্য।

'মাপকাঠি' কী তা বুঝা দরকার। এটা কষ্টিপাথরের মতো। কষ্টিপাথর দিয়ে যেমন সোনা খাঁটি, না খাদ মেশানো তা বোঝা যায়, তেমনি মাপকাঠিতে বিচার করে বা মাপকাঠির সাথে তুলনা করে বোঝা যায় যে, কোনটা সত্য এবং কতটুকু সত্য।

আল্লাহ পাক বলেন 'লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা...।' অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।' (সূরা আহযাব ঃ ২১ আয়াত)

www.amarboi.org

এখানে 'উসওয়াতুন হাসানা' শব্দটা লক্ষ্যণীয়। 'উসওয়াহ' মানে 'আদর্শ' যা অনুকরণের যোগ্য। যেমন আদর্শ লিপি। আদর্শ মানেই সবচেয়ে ভালো। এ সত্ত্বেও আবার 'হাসানা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো সুন্দর, উত্তম। উত্তম আদর্শ মানে এর চেয়ে ভালো আদর্শ আর হতে পারে না।

এরপর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণের কথা আসে। তাঁরা আসলে কী? রাসূলের আদর্শ পরিপূর্ণভাবে পালনের মাধ্যমে তাঁরা খাঁটি সোনা হয়ে উঠেছিলেন। খেয়াল করতে হবে যে, 'সোনা' হলেও তাঁরা 'কষ্টিপাথর' (অর্থাৎ মাপকাঠি) নন। রাসূলের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করেই জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম খাঁটি সোনা। কিন্তু খাঁটি সোনাকে 'কষ্টিপাথর' বলা হয় না। কষ্টিপাথর কষ্টিপাথরই। রাসূল (সাঃ) ও সাহবায়ে কিরাম (রা)-এর মর্যাদা সমান হতে পারে না।

কুরআনে আল্লাহপাক আনুগত্যের নীতি ঘোষণা করছেন—'আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের ওপর হুকুমকারী মানুষেরও। যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে তা পেশ করো।' (সূরা নিসা ঃ ৫৯ আয়াত)

'হুকুমকারী মানুষ' মানে রাষ্ট্রপতি বা সংগঠনের নেতা বা যে ব্যক্তির হুকুম করার অধিকার বা ক্ষমতা আছে। এখানে 'আনুগত্য করো' কথাটি দুইবার অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, হুকুমকারীদের বেলায় ৩য় বার 'আনুগত্য' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি।

তাফসীরকারগণ ও কুরআন বিশেষজ্ঞরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আল্লাহকে যেমন বিনা দলিল-প্রমাণে মানতে হবে তেমিন রাসূল (সাঃ)-কেও বিনা প্রতিবাদে, বিনা যুক্তিতে মানতে হবে। কোনো কথা না বুঝলেও তাকে মানতে হবে। কিন্তু অন্য কারো এ রকম নির্বিচারে আনুগত্য করা যাবে না। যেমন প্রথম যুগের খলিফাদের কথা বলা যায়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা হয়েই ঘোষণা করলেন—'আপনারা ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আনুগত্য করবেন, যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক আপনাদের পরিচালিত করি। যদি আমি তাঁদেরকে অমান্য করি তাহলে আমাকে মান্য করার কোনো দায়িত্ব আপনাদের থাকবে না।'

খলিফা বলতে সবসময়ই রাসূলের 'খলিফা বা প্রতিনিধি বুঝতে হবে। সাধারণভাবে সব মানুষই আল্লাহর খলিফা বটে, তবে সাধারণ মানুষের যারা নেতা হবেন তাদেরকে খলিফাতুর রাসূল বা রাসূলের প্রতিনিধি বলা হয়। এর দ্বারা রাষ্ট্রপতি, সংগঠনের নেতা বা নামাযের ইমাম ইত্যাদি সবাইকে বুঝায়। যতক্ষণ হুকুমকারী রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত করে ততক্ষণ তার আনুগত্য করতে হবে।

হুকুমকারীর সাথে মতপার্থক্য হতে পারে। রাসূলের সাথে মতের অমিল হতে পারে না। কারণ তাঁর সাথে পার্থক্য হলে বিরোধ মীমাংসার জন্য তাঁর দিকে ফিরে যেতে বলা

www.amarboi.org

হতো না। এছাড়া 'মাপকাঠি' তিনি ছাড়া আর কেউ হলে আয়াতে সে ব্যাপারেও উল্লেখ করা হতো। কুরআন ও হাদীসের বিচারে রাসূলকেই একমাত্র মাপকাঠি মনে হয়।

রাসূল (সাঃ)-এর একটি হাদীস-'আমার সাহাবীরা তারকার মতো, তাঁদের যাঁকেই তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে'।

এ হাদীসটি সহী বলে ধরে নিলেও এর দ্বারা সাহাবাগণ 'উসওয়াতুন হাসানা' প্রমাণিত হন না। মনে রাখা দরকার, আকাশে শুধু তারাই নেই, চাঁদ-সূর্যও রয়েছে। আল্লাহকে সূর্য এবং রাসূল (সা)-কে চাঁদের প্রতীক হিসেবে ধরে নিলে 'সাহাবাগণ' তারকার মর্যাদা পান। সূর্য থাকলে চাঁদের দরকার নেই। অর্থাৎ কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গেলে হাদীসের দরকার হয় না। তেমনিভাবে চাঁদ থাকলে তারকার দরকার হয় না। অর্থাৎ হাদীসের নির্দেশ পাওয়া গেলে সাহাবীর মতের দরকার পড়ে না। সূর্য ও চাঁদ যখন অনুপস্থিত তখনই তারকার আলো প্রয়োজন হয়। সুতরাং যেখানে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর কাছে সমাধান পাওয়া যায় সেখানে সাহাবাদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট সমাধান না পেলে সাহাবায়ে কেরামের মত খোঁজ করা জরুরী।

প্রশ্ন ঃ একজন মুসলমান সব মাযহাবের কিছু কিছু নিয়ম মেনে চললে কোনো অসুবিধা আছে কি? শুধু এক মাযহাবের সব নিয়ম অনুসরণ করা কি জরুরী?

উত্তর ঃ নিজের পছন্দমতো বিভিন্ন মাজহাব থেকে যেটা সহজ ও সুবিধাজনক তা মানা জায়েজ নেই। এর দ্বারা কোনো মাযাহাবই মানা হয় না। কোনো একটি মাযহাবকে মানাই উচিত। সহজ দেখে বিভিন্ন মাসয়ালা বিভিন্ন মাযহাব থেকে মানলে নাফসেরই আনুগত্য হয়, দ্বীনের আনুগত্য হয় না। কুরআন-হাদীস অনুযায়ী জ্ঞানের ভিত্তিতে কোনো মাসয়ালায় নিজের মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবের আমল যদি বেশী সহীহ হয় এবং সে অনুযায়ী আমল করা যদি কুরআন-হাদীস অনুযায়ী বেশী ভালো বলে বিবেক বুদ্ধি দাবী করে তাহলে তা করা উচিত, সহজ দেখে বাছাই করা অনুচিত।

প্রশ্ন ঃ (ক) আপনি ব্যক্তিগতভাবে কোন্ মাযহাবের অনুসারী?

(খ) মাওলানা মওদূদী মরহুম ব্যক্তিগতভাবে কোন্ মাজহাবকে অনুসরণ করতেন?

উত্তর ঃ (ক) হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

(খ) তিনি নিজে লিখেছেন যে, তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করতেন।

প্রশ্ন ঃ যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। কুকুর এত নিকৃষ্ট হওয়ার কারণ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) যখন কোনো কিছুকে 'হারাম' বলেন তখন যুক্তি বুঝে না আসলেও তা মেনে নেয়াই ঈমানের দাবী। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ হওয়ার কারণেই সেটা একজন মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

www.amarboi.org

মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ফলে কুকুরের অনেক দোষ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমেরিকায় এক মুসলিম পরিবারের একজনের অসুখ হয়েছিল। ডাক্তার এসে জিজ্ঞেস করলেন, কুকুরকে খাবার ঘরে ঢুকতে দেয়া হয় কিনা। কারণ ঐ রোগটা কুকুরের দেহ থেকেই ছড়ায়। ডাক্তারের পরামর্শ কুকুরকে কোনো অবস্থাতেই খাবার ঘরে ঢুকতে দেবেন না।

কুকুরের লালা নাপাক। কাপড়ে লাগলে নামায হবে না। কী কারণে, নাপাক, গবেষকরাই বলবেন। মুমীনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের কথাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ক্লাসে শিক্ষকদের সাথে অনেক কথা নিয়ে তর্ক হয়, অনেক সময় উচ্চস্বরে কথা বলতে হয়। তা কি বেয়াদবী বলে গণ্য হবে ?

উত্তর ঃ হুজুরদের (শিক্ষকদের)-কে বুঝাবার চেষ্টা করা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ঠিক নয়। কারণ উস্তাদের পক্ষে শাগরিদের কাছ থেকে দ্বীনের দাওয়াত কবুল করা স্বাভাবিক নয়। যদি ইসলামী আন্দোলন করার ব্যাপারে কোনো হুজুরের এতমিনান না হয় তাহলে তাঁর সাথে তর্ক করা ঠিক নয়। তাঁর প্রতি পূর্ণ আদব রেখে কথা বলতে হবে। এমন কোনো কথা বলা যাবে না যাকে উস্তাদ বেয়াদবী মনে করেন।

একথা মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে হুজুরদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব ছাত্রদের নয়। ইসলাম কোনো অবস্থায়ই উস্তাদের সঙ্গে বেয়াদবীর অনুমতি দেয় না। ইসলামী আন্দোলন করার কারণে যদি কোনো উস্তাদ মন্দও বলেন, তবু তার সাথে আদব রক্ষা করেই চলতে হবে। অবশ্য ইসলামী আন্দোলন করতে নিষেধ করলে সেটা পালন করা সম্ভব নয়। কারণ কারো হুকুমে ফরয ত্যাগ করা যায় না।

প্রশ্ন ঃ ১৩০ ফরযের মধ্যে ৪ মাযহাব মানা ৪ ফরয বলা হয়েছে কোনো কোনো ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। এটা ফরয হওয়ার কোনো দলীল আছে কী ? নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের বহু বৎসর পরে মাযহাবগুলোর সৃষ্টি। অথচ এটা ফরয হলো কি করে তা বুদ্ধিতে কুলায় না।

উত্তর ঃ ১৩০ ফরয বলে কোনো কিছুই নেই। কুরআন-হাদীস থেকে মাসয়ালা বের করে চলার ক্ষমতা যাদের আছে বলে মনে করেন তাদের জন্য মাযহাব মানা জরুরী নয়। কিন্তু এ ক্ষমতা আছে এবং নিজের ওপর নির্ভর করে আখিরাতে নাযাত পাওয়া যাবে -এ বিশ্বাস রেখে কেউ দায়িত্ব নিতে চাইলে নিতে পারেন।

মাযহাব মানা 'ফরয' নয়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের জন্য 'মাযহাব' না মেনে কোনো উপায়ও নেই। এমনকি যারা কুরআন-হাদীস থেকে মাসয়ালা বের করার যোগ্যতা রাখেন বলে মনে করেন তারাও এমন বহু মাসয়ালা আছে যেগুলোর ব্যাপারে গবেষণা করার সময়-সুযোগ পান না। এ অবস্থায় তিনি এগুলোর ওপর কিভাবে আমল করবেন? তাই নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর একজন থেকে অজানা মাসয়ালা জেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

যারা মাযহাব মানা 'জরুরী' মনে করেন না তারাও বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান অনুযায়ী চলার জন্য অবিজ্ঞ আলেম ও মুফতী থেকে সঠিক মাসয়ালা জেনে নিতে

www.amarboi.org

বাধ্য হন। সুতরাং এ জেনে নেয়ার প্রয়োজন পূরণ করার জন্যই 'মাযহাব' দরকার। কুরআন-হাদীস থেকে গবেষণা করে ফিকাহর ইমামগণ যেসব মাসয়ালা বের করেছেন তাঁরা বড় বড় আলেম ছিলেন। মাযহাব মানা অর্থ হলো ঐ আলেমদের রচিত কিতাব থেকে মাসয়ালা জেনে নেয়া। এ জেনে নেয়ার কাজটুকু করার জন্যও যে পরিমাণ ইলম দরকার তা-ও সব আলেমদের নেই। সুতরাং যারা মোটেই আলেম নন তাদের পক্ষে নিজের চেষ্টায় মাযহাব মানাও অসম্ভব। তাদেরকে কোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকেই মাসয়ালা জেনে নিতে হয়।

প্রশ্ন ঃ মসজিদে প্রবেশ ও বাইর হওয়ার দোয়া, পায়খানায় প্রবেশ ও বাইর হওয়ার দোয়া, গোসল ও ফরয গোসলের দোয়া, অযু ও আযানের দোয়া, যাত্রার প্রাক্কালের দোয়া, মোসাফার দোয়া, বিপদকালীন দোয়া, ঘুমাবার দোয়া, চাঁদ দেখার দোয়া, নতুন কাপড় পরিধানের দোয়া-এ ধরনের আরো অনেক দোয়া আছে যা আমরা দৈনন্দিন বিভিন্ন সময় পড়ে থাকি। এগুলো কি কুরআন-হাদীস থেকে সংগৃহীত, না কোনো সাহাবীর মাধ্যমে পেয়েছি?

উত্তর ঃ এসব বিষয়েই হাদীসে দোয়া আছে। নির্ভরযোগ্য দোয়ার কিতাব হলে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। যেহেতু আপনার প্রশ্নে কোনো নির্ধারিত দোয়া সম্পর্কে উল্লেখ করেননি। তাই তার উত্তরও নির্ধারিতভাবে দেয়া গেল না। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)-এর রচিত মুনাজাতে মকবুল কিতাবে এবং কুরআন ও হাদীসের হাওয়ালাসহ সংকলিত দোয়ার যেসব বই পাওয়া যায় তার থেকেই দোয়া শেখা উচিত।

প্রশ্ন ঃ জামায়াতে ইসলামী অন্য ফেরকার মতো 'বাহাস' করে না কেন?

উত্তর ঃ জামায়াতে ইসলামী কোনো 'ফেরকা' নয়। আর সমাজে 'বাহাস' নামে যেটা প্রচলিত আছে এর দ্বারা মীমাংসা হয় না। দু'দল উলামা কোনো বিষয়ে বাহাস বা তর্ক-বিতর্ক করলে তা দ্বারা জনগণ আরো বিভ্রান্ত হয়। তাই এ জাতীয় বাহাস জামায়াতে ইসলামী পছন্দ করে না।

যারা জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে চান বা জামায়াত সম্বন্ধে মনের খটকা দূর করতে চান তারা জামায়াতের দায়িত্বশীলদের সাথে মন খুলে আলোচনা করতে পারেন। এর জন্য বাহাস-এর কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

আমি জামায়াতে ইসলামীকে এই ব্যাপারে শ্রেষ্ঠতম মনে করেই এই সংগঠনে যোগদান করেছি। যারা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভব করে তাদের দায়িত্বও সব সংগঠনের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা সন্ধান করা। যার যে সংগঠন বেশী পছন্দ তার সেখানেই কাজ করা উচিত। কিন্তু কোনো অবস্থায় ইসলামী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা জায়েজ নয়।

প্রশ্ন ঃ 'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও যুব সমাজ' বই-এর ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর সাথীদের অধিকাংশের বয়স ছিল ১০ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ বয়স্কদের তুলনায় বেশীর ভাগ যুবকরাই ইসলামের পতাকাবাহী

www.amarboi.org

হয়েছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, জ্ঞান-বুদ্ধি যুবকদের তুলনায় বয়স্কদের অনেক বেশী। তাই প্রশ্ন জাগে, যুবকদের থেকে বয়স্কগণ পিছনে ছিলেন কেন ?

উত্তর ঃ ইসলাম শুধু কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়। মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে রাজনীতি, অর্থনীতিসহ গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য ইসলাম পূর্ণাঙ্গ বিধান দান করেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর ইসলামী দাওয়াত একটি বাস্তব বিদ্রোহ ছিল,। ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য রাসূল (সাঃ)-এর ঐ আন্দোলনে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সুবিধাভোগীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই যোগদান করেছিলেন। যারা বয়স্ক তারা স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের জীবনকে খাপ খাইয়ে নেন। নতুন কিছুকে গ্রহণ করার জন্য যে উদ্যোগ ও প্রেরণা যুবকদের মধ্যে দেখা যায় তা বয়স্ক লোকদের মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। তদুপরি সমাজ বিপ্লবের এই আন্দোলনে সমসাময়িক শাসকদের পক্ষ থেকে যে যুলুম-নির্যাতন নেমে আসে তা সহ্য করার মনোবল যুবকদের মধ্যে বেশী থাকে। বয়স্কগণ অবশ্যই অধিকতর অভিজ্ঞ, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য দায়িত্ব ও অভিজ্ঞতা তাদেরকে আন্দোলনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে বাধা দেয়। কিন্তু এই ঝুঁকি যুবকরা অতি সহজেই মাথা পেতে নিতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী বিপ্লবোত্তর সময়ও কি দেশের বিচার ব্যবস্থায় বর্তমানে প্রচলিত আদালতের পদ্ধতি থাকবে ? যদি না থাকে, তবে সে পদ্ধতি সম্পর্কে বলবেন কি ?

উত্তর ঃ প্রত্যেক আইনের ধরনের উপরই তার পদ্ধতি নির্ভর করে। ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য যারা উপলব্ধি করতে সক্ষম তাদেরপক্ষেই ঐ আইন অনুযায়ী বিচার করা সম্ভব। প্রয়োজনেই 'পদ্ধতি' রচিত হয়। ঐ পদ্ধতি আইনের 'উদ্দেশ্য' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ বিষয়টি আইন ও বিচারের ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকদের কমিশনই সুপারিশ করবে যে, বর্তমান বিচারপদ্ধতি কতটুকু ইসলামী আইন উপযোগী এবং কতটুকু পরিবর্তনযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ কোনো মহিলা যদি বাদী বা বিবাদী হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হন তখন কি প্রকারে বক্তব্য পেশ করা হবে।

উত্তর ঃ পর্দার সাথে তাকে আদালতে যেতে হবে এবং প্রয়োজন হলে মহিলার সঠিক পরিচিতির জন্য বিচারকের সামনে চেহারা খুলতে হবে, যেমন পর্দানশীল মহিলাকেও চিকিৎসার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে ডাক্তারকে শরীরের যে কোনো অংশ দেখাতে হয়।

প্রশ্ন ঃ শয়তান ও জিন্নাতের মধ্যে পার্থক্য কী ? মানুষ ও জিন্নাতকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। জিন্নাত জাতির ইবাদাতের ধরন কিরূপ ? শয়তানরা ইবাদত করে কি নাযাত পেতে পারে ? শয়তান ও জিন্নাতের আনুমানিক সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা 'মানুষ' এবং 'জ্বীন' এই দুই জাতি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে মাটি এবং জ্বীনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কুরআনে উল্লেখ আছে। আল্লাহ

www.amarboi.org

মানুষ এবং জ্বীন জাতিকে অন্যান্য সৃষ্টির মতো বাধ্যতামূলক দাস বানান নাই। তাদের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এর ফলে আল্লাহর দাসত্ব করা না করা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ তায়ালা জ্বীন জাতির মধ্যে নবী পাঠাননি। মানুষই জ্বীন এবং মানুষের নবী হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। জ্বীন জাতিকে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। সে দায়িত্ব শুধু মানুষকে দেয়া হয়েছে।

শয়তান কারো কোনো নাম নয়। যে জ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা হুকুম করেছিলেন আদমকে সিজদা করো, সে অহংকার প্রকাশ করে বলে—'আমি আগুন থেকে তৈরি, আমি মাটির আদমকে সিজদা করবো না।' তখন তাকে আল্লাহ তায়ালা 'শয়তান' নামে অভিহিত করলেন। আর শয়তান শব্দের অর্থ হলো—'যে নেক কাজ থেকে দূরে'। এই অবাধ্য জ্বীনের আরেকটি উপাধি হচ্ছে 'ইবলিস'। আর এর অর্থ হলো 'নিরাশ' (যেহেতু সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে) কুরআন শরীফে 'শয়তান' এবং 'ইবলিস' এ দু'টি উপাধিতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্বীন জাতির ইবাদতের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী তাদের ওপর নামায-রোযা ফরয এবং তারা এ কুরআনই তেলাওয়াত করে থাকে। মানুষের মধ্যে যেমন আল্লাহর অনুগত অনেক লোক আছে জ্বীনের মধ্যেও তেমনি আছে।

তাদের নাযাতের জন্য কী পরিমাণ ইবাদত বাধ্যতামূলক এর সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। তবে খেলাফতের দায়িত্ব তাদের না থাকার কারণে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে মানুষকে যেমন ইসলামী খেলাফত কায়েম করতে হয়, এ ধরনের কোনো দায়িত্ব তাদের নেই। জ্বীন জাতির 'সদস্য' সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ বলতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ সূরা নূর-এর ৩৩ আয়াতের অর্থ এবং ব্যাখ্যা কী ? ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কী ?

উত্তর ঃ আপনার দু'টি প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়ার প্রয়োজন নেই। এর বিস্তারিত উত্তর সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে মাওলানা মওদূদী (রাহঃ)-এর তাফহীমুল কুরআনে সূরা আন নূর-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দেখুন। অনুরূপ জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জানতে হলে একই লেখকের 'ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ' এবং মরহুম আবদুল খালেক সাহেবের 'ইসলামের দৃষ্টিতে জনসংখ্যা ও সম্পদ' বই দুটি পড়ুন।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম সন্ত্রাসবাদের বিরোধী, তবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও অস্থিরতায় ইসলামী আন্দোলন কিভাবে চলবে। বর্তমানে গায়ের জোড়ে ভোট নেয়ার যে রেওয়াজ চালু হয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের করণীয় কি ?

উত্তর ঃ একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, ইসলাম সন্ত্রাসবাদের বিরোধী। ইসলাম বিরোধী অন্যান্য সব মত ও পথকে প্রতিহত করে ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ী করতে চেষ্টা করা যেমন ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব, সন্ত্রাসবাদকে সমাজ থেকে উৎখাত করাও ইসলামী আন্দোলনের কর্তব্য। ইসলামী আন্দোলন শক্তি প্রয়োগ করে ব্যক্তি বা সমাজের ওপর চেপে বসারও তেমনি বিরোধী।

www.amarboi.org

সন্ত্রাসবাদীরা নিরীহ লোকদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়। আর ইসলামী আন্দোলন জনসমর্থন যোগাড় করে বিজয়ী হতে চায়। সুতরাং জনগণকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা ছাড়া জনসাধারণকে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে রেহাই দেয়া সম্ভব নয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা নিজেরা সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন অবশ্যই করবে না, কিন্তু সন্ত্রাসকেও নীরবে সয়ে যাবে না।

ভোটের ব্যাপারেও একই নীতি প্রয়োগ করতে হবে। ভোটকেন্দ্রে ইসলাম ও বিরোধীদের গুণ্ডামী প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি যোগাড় করতে না পারলে যেসব ভোটার ইসলামের পক্ষে ভোট দিতে আগ্রহী তাদের পক্ষে ভোট কেন্দ্রে আসাই সম্ভব হবে না। এমনকি তাদের ভোটগুলো ইসলামের বিরোধী বাক্সে ফেলা হবে। জনগণ সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থক কখনো হতে পারে না, অবশ্যই তাদের ভয়ে ভীত হতে পারে। তাই জনগণকে সুসংগঠিত করে এই ভীতি দূর করতে হবে। তাহলে জনগণের সামনে সন্ত্রাসবাদীরা কখনো টিকে থাকতে পারবে না। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যায় যে, সশস্ত্র ডাকাত দলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের মোকাবিলা করে ডাকাতদলকে কাবু করে ফেলে ।

প্রশ্ন ঃ আপনি কাকে মুজাদ্দিদ মানেন ?

উত্তর ঃ 'নবী' মানা যেমন ঈমানের জন্য শর্ত 'মুজাদ্দিদ' মানা তেমন জরুরী নয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের নিকট কুরআন ও সুন্নাহ রেখে গেছেন। এ দুটোকে মেনে চলাই হচ্ছে ঈমানের দাবী। এই দুটোকে পূর্ণরূপে মানার ব্যাপারে চুপে চুপে যারা কাজ করে গেছে তাদের মধ্যে অনেকেই উম্মতের নিকট 'মুজাদ্দিদ' বলে গণ্য। আমিও তাদেরকে 'মুজাদ্দিদ' বলে মানি। কোনো এক ব্যক্তি সকল যুগের জন্যই মুজাদ্দিদ বলে গণ্য হন না। প্রত্যেক যুগেই ইসলামকে মানুষের নিকট এর আসল রূপে পরিবেশন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যাঁদের তাওফিক দান করেন তাঁদেরকেই পরবর্তীকালে উম্মত 'মুজাদ্দিদ' বলে ঘোষণা করেন। এ যুগে মুজাদ্দিদের দায়িত্ব কেউ পালন করেছেন কি না তা পরবর্তী যুগের উলামায়ে কেরামই সাব্যস্ত করবেন।

প্রশ্ন ঃ ফটো ছাপানোর ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের আলোকে আলোচনার আবেদন করছি।

উত্তর ঃ ফটো নিষিদ্ধ হওয়ার যে আসল কারণ সে সম্পর্কে সকলে সচেতন। যার কারণে ঘরের মধ্যে কোনো জীবের ফটো পর্যন্ত রাখা আলেমগণ সমর্থন করেন না। কিন্তু সেই আলেমগণই কয়েকটি বিষয়ে ফটোর ব্যবহার জায়েজ রেখেছেন। যেমন —শিশুদের পাঠ্য বইতে পশু-পাখির ফটো, পাসপোর্টের ফটো, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজনে রোগীর ফটো ইত্যাদি। এগুলো থেকেই খবরের অংশ হিসেবে সংবাদপত্রে খবরের প্রয়োজনে ফটো ছাপাকে এতটা আপত্তিকর মনে করা হচ্ছে না। এর জন্য যদি কুরআন-হাদীসের দলীলের দাবী করা হয় তাহলে পাসপোর্ট ইত্যাদির জন্যও তো দলীল দাবী করতে হয়। কুরআন-হাদীসে কোনো রকম ফটোরই অনুমতি নেই। অথচ পাসপোর্ট ইত্যাদির জন্য ফটোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

www.amarboi.org

তাই সর্বাবস্থায়ই ফটোর ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য যাতে ফটোর ব্যাপারে ঢিলেমী এমন পর্যায়ে না আসে যার ফলে ইসলামী নীতি লংঘিত হয়।

প্রশ্ন ঃ আমাদের আদি পিতা আদম (আ)-কে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সেজদা না করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক যখন অহংকারী ইবলিস বেহেশত থেকে বিতাড়িত হলো তখন সে বলেছিল—'আমাকে যখন বিতাড়িতই হতে হলো তখন আমিও আদম সন্তানদের বিপথগামী করার জন্য তোমার সিরাতে মুস্তাকীমে বসে থাকবো।'

কথাটা অত্যন্ত গুরুতর। তাই কিভাবে সে সিরাতে মুস্তাকীমে বসে বান্দাহকে পথভ্রষ্ট করবে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং কী উপায় ইবলিসের এই ধোঁকাবাজি ধরা যাবে তা একটু বিস্তৃত আলোকপাত করলে বাধিত হবো।

উত্তর ঃ শয়তান আদমকে সিজদা না করে অভিশপ্ত হওয়ার কারণে আদমের দুশমনীতে অন্ধ হয়ে একথা বলেছিল। মানুষকে জোর করে সিরাতে মুস্তাকীম হতে সরাবার ক্ষমতা ইবলিসের নেই। সে শুধু মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা দান করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে থাকে। এ চেষ্টা শুধু ইবলিসেই করে না, এ শয়তানী কাজ মানুষও করে থাকে। যেমন সূরা নাস-এর মধ্যে আল্লাহ বলেছেন—'জ্বীন এবং ইনসানের মধ্যে যারা মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা দেয়।'

সুতরাং ওয়াসওয়াসা শুধু ইবলিসই দেয় না, মানুষও দেয় এবং তাদের ক্ষমতা ওয়াসওয়াসা দেয়া পর্যন্তই।

এখন কিভাবে 'ওয়াসওয়াসা' দেয় সেটা প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতায় আছে। আল্লাহর প্রতি ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে, আল্লাহর পথে চলতে যেসব কষ্ট আছে সেগুলি বড় করে দেখায় এবং নানান রকম ওজর আপত্তি তুলে নাফরমান হতে উদ্বুদ্ধ করে ইত্যাদি।

কিন্তু মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুপথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা জ্বীন বা ইনসানরূপী শয়তান বা অন্যকারো নেই। সূরা ইবরাহীমের ২২ আয়াতে শয়তান নিজেই আদালতে আখিরাতে একথা বলবে বলে উল্লেখ আছে—'তোমাদের ওপরে আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না। আমি তোমাদেরকে আমার পথে ডেকেছি আর তোমরা সে সাড়া দিয়েছো।'

তা ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষকে গোমরাহ করার চেষ্টা করার সুযোগ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন বটে, কিন্তু একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর বান্দাহদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে না। সূরা বনী ইসরাঈলের ৬১-৬৫ আয়াতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।

যতো রকমের আল্লাহর নাফরমানী আছে সেগুলিতে শয়তানের হাত তো থাকে, তাই বলে নাফরমানী যে করে সে শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে না। যে অন্যের প্ররোচনায় অন্যায় করে সে এ কারণে শাস্তিমুক্ত ও দোষমুক্ত হতে পারে না যে, অন্যের উস্কানিতে তা করছে। উস্কানিদাতা তার উস্কানির জন্য শাস্তি পাবে, আর অন্যায় করার জন্য অন্যায়কারী শাস্তি পাবে।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের পরে অনেক বয়স্ক ও যোগ্য সাহাবা জীবিত ছিলেন। অন্যদের বাদ দিয়ে কেন পর পর চারজন হযরত আবু বকর, ওমর ফারুক, ওসমান গনী ও আলী (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হলেন ?

উত্তর ঃ সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য মনে করেই একের পর এক খলিফা মনোনীতে করেছিলেন। তাঁদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মতের বিরুদ্ধে কেউ নিযুক্ত করে দেননি।

প্রশ্ন ঃ সাপ্তাহিক সোনার বাংলার 'প্রশ্নোত্তরের আসরে' দেখতে পেলাম 'আল্লাহ যাদের নবী হিসেবে উল্লেখ করেননি তাদের কাউকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।' এই অংশ দ্বারা ২৮ জনের বাইরে যারা নবী ছিলেন তারা নবী নন একথাই বুঝায় না কি ?

উত্তর ঃ উক্ত কথা থেকে এ রকম বোঝায় না। উক্ত কথার অর্থ এটা নয় যে, এই ২৮ জনের বাইরে আর কোনো নবী ছিলেন না। ওখানে বলা হয়েছে যে, এই ২৮ জনের বাইরে আর কোনো 'নাম' নবী হিসেবে স্বীকার করা যায় না। অতীতের অনেক বড় বড় মনীষীর 'নাম' নিয়ে কেউ তাদেরকে 'নবী' বলে অনুমান করেন। সেসব লোক 'নবী' ছিলেন যেমন আমরা বলতে পারি না, তেমনি তাঁরা 'নবী' ছিলেন না একথাও ঘোষণা করা চলে না। যাদের 'নাম' নবী হিসেবে কুরআন পাকে উল্লেখ আছে তাদের ছাড়া আল্লাহ বহু নবী পাঠিয়েছেন একথা সত্য। কিন্তু 'নাম' ধরে কুরআন পাকে উল্লেখিত নবীগণ ব্যতীত অন্য কাউকে 'নবী' হিসেবে স্বীকার করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ 'লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন' ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে পার্থক্য কী ?

উত্তর ঃ আমপারার সূরা কাফেরূন-এর তাফসীর পড়লে একথাই স্পষ্ট হয়, 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' কথাটার আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট কাফেররা আপোষ প্রস্তাব দিয়েছিল যে, তাদের দেব-দেবীর পূজাও কিছুটা মেনে নেয়া হোক। তাহলে তারা আল্লাহর ইবাদত কিছুটা মেনে নিবে। সূরা কাফেরূন-এ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একথারই জবাব দেয়া হয়েছে। এ সূরাটির শেষ আয়াতে 'লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন' বলে একথাটিরই সুস্পষ্ট জবাব দেয়া হয়েছে—'দ্বীনের ব্যাপারে এ রকম কোনো আপোষ হতে পারে না। যে দ্বীন আমাকে দেয়া হয়েছে আমি সেই দ্বীন-ই মানুষের কাছে প্রচার করবো। তোমরা যদি এই দ্বীন গ্রহণ না করো তাহলে তোমাদের ইচ্ছা তোমরা তোমাদের দ্বীন নিয়ে যদি সন্তুষ্ট থাকতে চাও সেটাও তোমাদের মর্জি। তোমাদের দ্বীন থেকে আমি কোনো কিছু গ্রহণ করবো না।' এ আয়াত দ্বারা তাওহীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে এবং ইসলাম যে একমাত্র সত্য ও সঠিক 'দ্বীন' সে দাবীই পেশ করা হয়েছে।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষতা একটি 'রাজনৈতিক মতবাদ'। এ মতবাদ অনুযায়ী ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকা উচিত নয়—এই মতবাদ শুধু তারাই মেনে নিতে পারে যারা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মত

www.amarboi.org

অনুষ্ঠান সর্বস্ব মনে করে। যারা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান রাখে তারা ইসলামকে মানব জীবনের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে বিশ্বাস করে। তাই তারা ধর্মনিরপেক্ষ হওয়াকে ঈমানের বিপরীত মনে করে।

প্রশ্ন ঃ ইত্তেহাদুল উম্মাহ ও আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মধ্যে পার্থক্য কী ? আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত নাম না হয়ে ইত্তেহাদুল উম্মাহ নাম হয়েছে কেন ?

উত্তর ঃ 'আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত' কোনো সংগঠনের নাম নয়। যারা নবী করীম (সাঃ)-কে এবং সাহাবায়ে কেরামকে মেনে চলে তারা বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও আহলুস-সুন্নাহভুক্ত এবং শিয়াগণ ছাড়া সমস্ত মুসলমানকেই আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মধ্যে গণ্য করা হয়। এই পরিভাষাটা শিয়াদের থেকে সুন্নীদের পৃথক করে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

আর 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' এ দেশের একটি সংগঠন—যারা সব ধরনের সুন্নী মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করছে। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে যতো ধরনের বিরোধ আছে সেগুলি দূর করে তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা সৃষ্টি করাই ইত্তেহাদুল উম্মাহর লক্ষ্য, যাতে বাতিলের বিরুদ্ধে দ্বীন-ই হককে কায়েম করার জন্য মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ বিনা প্রয়োজনে ফটো তোলা বা রাখা জায়েজ নয়। ইসলামী আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগানোতে সহায়ক ফটোগুলো পত্রিকায় ছাপানো জায়েজ হতে পারে। কিন্তু অন্যগুলো, যেমন রাষ্ট্রপ্রধান, জনসভার চিত্র, কোনো মৃত মন্ত্রীর ছবি ইত্যাদিও কি পত্রিকায় ছাপানো জায়েজ ? বিপ্লবোত্তর সময়ও কি পত্রিকায় ছবি থাকবে ?

উত্তর ঃ বিনা প্রয়োজনে ফটো তোলা বা রাখা জায়েজ নয়। এমনকি ঘরে কোনো জীবের ফটোও দৃশ্যমান রাখা জায়েজ নয়। পত্রিকায় ফটো ছাপানোর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনো ঘটনার লিখিত বিবরণের মতোই সেই ঘটনার ফটোকে সাংবাদিকরা ঐ সংবাদের অপরিহার্য অংশ মনে করেন। তাই সাংবাদিকতার ময়দানে ফটোবিহীন সংবাদ পাঠকদের নিকটও অপূর্ণ মনে হয়। ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার পর পত্রিকায় ছবি ছাপার এই রেওয়াজ পরিবর্তন করার চেষ্টা হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আমার আব্বা একজন সমাজতন্ত্রী (নামাযও পড়েন)। তার সাথে আমার প্রায়ই আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা হয়। তিনি আমার সাথে এমন সব প্রশ্নের অবতারণা করেন যেগুলো একজন মুসলমান কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে না। অথচ তার যুক্তিগুলো বেশ বলিষ্ঠ বলে মনে হয়। কিন্তু একমাত্র ইসলামী আন্দোলনের প্রতি গভীর আস্থা এবং এই আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করার কারণেই তার সব যুক্তি আমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। তিনি আমাকে বলেন, যেহেতু নবী বা রাসূলগণ দুনিয়ায় এসেছেন। মানবতার মুক্তির জন্য, মানুষকে শান্তি দেয়ার জন্য, কল্যাণের জন্য, তদ্রূপ মার্কস, লেনিন, এরিষ্টটল এদেরও একই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরাও নবী বা রাসূলের সমতুল্য (নাউজুবিল্লাহ)। এর সপক্ষে তিনি আরো যুক্তি পেশ করেন, ১ লাখ মতান্তরে ২

www.amarboi.org

লাখ ৪০ হাজার পয়গাম্বর দুনিয়ায় এসেছেন। এতো পয়গাম্বরের পরিচয় কোথায় ? সেহেতু মার্কস, লেনিন, মহাত্মা গান্ধী এরাও পয়গাম্বর।

এসব কথার সঠিক জবাব দিতে না পেরে আপনার শরণাপন্ন হলাম। আশা করি জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি মার্কস, লেনিন, এরিষ্টটল এমনকি মহাত্মা গান্ধীকেও পয়গাম্বর মনে করে সেই ব্যক্তির প্রলাপ নিয়ে আলোচনা করাটাই সময়ের অপচয়। নবী ও রাসূল কাকে বলে, তাদের পরিচয় কী, তাদের দায়িত্ব কী এ সম্পর্কে যার ধারণা নেই সে-ই এ ধরনের প্রলাপ বকতে পারে। আর মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে থেকে নবী হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বে এমন অনেক মনীষীই থাকতে পারেন যাঁরা হয়তো নবী ছিলেন, কিন্তু তাদের নাম কুরআনে উল্লেখ নেই। লক্ষাধিক নবীর মধ্যে কুরআনে মাত্র ২৮ জন্য নবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ যাদের নবী হিসেবে উল্লেখ করেননি তাদের কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। যদিও নীতিগতভাবে আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবীর উপর ঈমান আনা জরুরী।

প্রশ্ন ঃ বিসিএস পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষাতে আমার এক আত্মীয় জনৈক পরীক্ষা গ্রহণকারীকে প্রশ্ন করেছিলো, আপনারা কি নিরপেক্ষ বিচার করে থাকেন ? শুনেছি নিরপেক্ষ বিচার নাকি এখানেও অনুপস্থিত, তাহলে পরীক্ষা দিয়ে কি হবে।'

জবাবে পরীক্ষা গ্রহণকারী বললেন, 'দেখুন নিরপেক্ষ বলতে পৃথিবীতে কোনো কিছুই নেই। এমনকি আল্লাহ নিজেও নিরপেক্ষ নন। তা না হলে আমাদের নবীকে আল্লাহ সকল নবীর ওপরে মর্যাদা দিয়েছেন, আবার তাঁর উম্মতদেরও অন্যান্য সকল নবীর উম্মতদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে পরীক্ষা গ্রহণকারীর জবাবটি অবশ্যই সঠিক নয়, তবে তা দ্বীনি দৃষ্টিতে কিভাবে ?

উত্তর ঃ পরীক্ষায় যে কেউ ভালো নম্বর পেলে তাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। আল্লাহ সেভাবেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যান্য নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যদি এমন হতো যে, অন্য নবী তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাহলে পক্ষপাতিত্ব হতো। পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে যার যে মর্যাদা পাওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী দেয়া। আল্লাহ তায়ালা নিজেকে কুরআনে 'আহকামুল হাকিমীন' বা শ্রেষ্ঠ বিচারক বলেছেন। সুতরাং আল্লাহকে 'পক্ষপাতী বলা' ঈমানের বিপরীত।

আল্লাহ কোনো মানুষকে বেশী সুন্দর করে সৃষ্টি করেন, কোনো মানুষকে কুশ্রী করে সৃষ্টি করেন, কাউকে ধন-সম্পদ বেশী দেন, কোনো লোককে কম দেন। এ জাতীয় যতো পার্থক্য আছে, মূলত সেটা পক্ষপাতিত্ব নয়। আল্লাহ তায়ালা যাকে যেভাবে পয়দা করেছেন সে অবস্থা তার জন্য পরীক্ষা। সম্পদও পরীক্ষা, দারিদ্রও পরীক্ষা। এই পৃথিবীর স্বল্পকালীন জীবনের এই পরীক্ষায় যারা যেভাবে উত্তীর্ণ হবে পরকালে তার

www.amarboi.org

যেমন প্রাপ্য তা ঠিক ঠিকভাবে আল্লাহ্ দিবেন। তাই আল্লাহর ব্যাপারে কোনো অবস্থাতেই পক্ষপাতিত্বের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

প্রশ্ন ঃ দু'জন ইসলামী রাজনৈতিক নেতা দিনে জনসভা; পথসভা সমানভাবে করেন, কিন্তু শেষ রাতে একজন তাহাজ্জুদের নামায পড়েন, অপরজন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি উত্তম ? এবং শেষ রাতে ইসলামী বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা আর তাহাজ্জুদের নামায পড়ার মধ্যে কোন্টা আফজল ? পবিত্র কুরআনে তাহাজ্জুদ পড়ার এবং হাদীসে কিভাবে ফেকাহ শাস্ত্র পড়ার ইঙ্গিত আছে ? অতএব জটিলতার সমাধান কী ?

উত্তর ঃ এটা কোনো জটিল ব্যাপার নয়। নফল ইবাদতের মধ্যে দ্বীনি ইল্মের চর্চা করা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। হাদীসে আছে–'রাতের কিছু সময় দ্বীনের ইল্ম চর্চা করা সারারাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।' হাদীসে আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বুঝানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও দ্বীনি ইল্মের সাধকদের পক্ষে তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব অনুভব করা উচিত। শুধু ইলমের চর্চার ফলে শয়তান অন্তরে অহংকার পয়দা করতে সুযোগ পায়। কিন্তু তাহাজ্জুদের দ্বারা নির্জনে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ঐ অহংকারের ভাব বিনষ্ট হয়। তাই যারা ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের দ্বীনি ইল্ম চর্চা ও তাহাজ্জুদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের জন্য সংসারই উত্তম ক্ষেত্র। মেয়েদের এই সাংসারিক দায়িত্ব কোন্ পর্যায়ে পড়ে এবং কিভাবে আল্লাহর কাছে এর হিসাব হবে ?

উত্তর ঃ মানুষ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা যাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্ব যদি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী পালন করা হয় তাহলে তার প্রতিটি কাজই ইবাদতে পরিগণিত হয়। এই সাংসারিক দায়িত্ব কুরআন-হাদীস অনুযায়ী পালিত হলেই এটা দ্বীনি দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হবে। এর অর্থ এই নয় যে, এই পারিবারিক কাজের অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য নয়। যারা দ্বীনদার মহিলা তারা যদি অন্যান্য মহিলাদেরকে তাদের পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে দ্বীনকে অনুসরণ করার গুরুত্ব না বুঝান তাহলে সমাজে অন্যান্য মহিলারা কিভাবে ইসলামী জীবন যাপন করবে ? তাই শুধু নিজের পরিবারে দ্বীনের অনুসরণ করা যথেষ্ট নয়। মহিলা সমাজের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবার দায়িত্ব প্রধানতঃ মহিলাদের পালন করতে হবে। শুধু পুরুষের চেষ্টায় মহিলা সমাজকে ইসলামের অনুসারী করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ যে দেশে বিভিন্ন মাযহাবের লোক বাস করে, সে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কোন্ মাযহাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে ?

উত্তর ঃ দেশে যে মাযহাবের লোকসংখ্যা বেশী সে মাযহাব অনুযায়ী সেখানে শাসন ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বিবাহ, তালাক, ফরায়েজ ইত্যাদি ব্যক্তিগত

www.amarboi.org

ও পারিবারিক বিষয়ে প্রত্যেকের স্ব-স্ব মাযহাব অনুযায়ী জীবন যাপন করার শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তা থাকবে।

চার মাযহাব ও আহলে হাদীসগণ যেহেতু আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত, সেজন্য তাদের মধ্যে খুব কম বিষয়ে মতভেদ আছে। তবু যার যার মাযহাব অনুযায়ী বিচার-ফায়সালার সুযোগ আদালতে থাকবে।

প্রশ্ন ঃ সপ্তম শতাব্দীতে বিজ্ঞানচর্চায় মুসলামানদের যে অগ্রযাত্রা হয়েছিল তা পঞ্চদশ শতাব্দীতে একেবারে অস্তমিত হয়ে যায়। এর আসল কারণ কী ছিল ? বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবস্থা কোন পর্যায়ে ?

উত্তর ঃ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানরাই নেতৃত্ব দিচ্ছিল। দুনিয়ায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল, বিজ্ঞানচর্চাও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়-ই এগিয়ে চলছিল। আজ যেমন আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় যাই, সেকালে ইউরোপের লোকেরাই মুসলমানদের দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য আসতো।

সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত-আটশ' বছরে আদর্শ, নৈতিকতা ও চরিত্রের দিক দিয়ে ক্রমে ক্রমে মুসলিম জাতি অধঃপতনের দিকে চলে যায় এবং শাসকরা বিলাসিতা ও দুনিয়া ভোগ করার দিকেই ধাবিত হয়। জ্ঞানসাধনা যে কঠোর পরিশ্রমের দাবী করে তার অভ্যাস কমে যায়। ঐ সময় পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেটুকু উন্নতি তাদের হাতে হয়েছিল সে ফসলটুকু ভোগ করার মধ্যেই তারা আত্মনিয়োগ করে।

যখন দুনিয়ার অমুসলিম জনগণের নিকট ইসলামকে পরিবেশন করার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অবহেলা করে শাসকেরা আপোষ ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তখন ইউরোপের যে সমস্ত লোক মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করলো তারা নিজ নিজ দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে এগিয়ে যেতে থাকলো এবং উন্নততর জ্ঞান-বুদ্ধি ও অস্ত্র বলে সজ্জিত হয়ে নেতৃত্বের কোন্দলে লিপ্ত মুসলিম দেশগুলোতে ক্রমে ক্রমে শাসন ক্ষমতা দখল করে বসলো।

বর্তমানে যদিও মুসলিম দেশগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে বিদেশীদের গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েছে, তথাপি দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইউরোপের দাসত্বই করে চলেছে। এর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম দেশগুলোতে কিছুটা অগ্রগতি হলেও তারা ইসলামী আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক মানের অভাবে ইউরোপ এবং আমেরিকাকেই উস্তাদ মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হলে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, আইন, নৈতিকতা ইত্যাদিতে মুসলিম শাসকদেরকে আন্তরিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বস্ত অনুসারী হতে হবে। তা না হলে ইউরোপ ও আমেরিকার সাগরিদীর মর্যাদা থেকে উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রশ্ন ঃ আল্লামা কাকে বলে ? এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন। আল্লামা ও মুজাদ্দিদের মধ্যে পার্থক্য কী ?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ 'আল্লামা' শব্দটা 'আলিম' শব্দের 'সুপারলেটিভ' ডিগ্রি। খুব বড় আলিম বা ইলম-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা ব্যুৎপত্তি লাভ করেন তাদেরকে 'আল্লামা' বলা হয়। আর 'তাজদীদ' শব্দ থেকে 'মুজাদ্দিদ' শব্দ গঠিত তাজদীদ অর্থ 'নতুনত্ব' অর্থাৎ ইসলামের যেসব দিক আসলরূপে চালু নেই সেইসব দিককে নতুন করে চালু করা। এই কাজটিকে পুনরুজ্জীবনও বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের যে রূপ প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে বহুদিক দিয়েই ক্ষমতালিপ্সু কায়েমী স্বার্থবাদী ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ইসলামের আসল রূপ বিকৃত হয়ে পড়ে। যুগে যুগে এ বিকৃত অবস্থা থেকে আসলরূপে ইসলামকে বহাল করার জন্য যে প্রচেষ্টা চলে তাকে 'তাজদীদ' বলা হয় এবং যাদের দ্বারা এ মহান কাজ সমাধা হয় তাদেরকেই 'মুজাদ্দিদ' হিসেবে গণ্য করা হয়।

'মুজাদ্দিদ' হওয়ার জন্য 'আল্লামা' হওয়া জরুরী, কিন্তু আল্লামা হওয়ার জন্য মুজাদ্দিদ হওয়া জরুরী নয়। যিনি আল্লামা তিনি তাঁর ইল্‌মকে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনার মাধ্যমে কাজে না লাগলে তাজদীদের কোনো কাজই তাঁর দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। কারণ তাজদীদের কাজ এমন জটিল ও গভীর যে, এর জন্য সাধারণভাবে আলিম হওয়া মোটেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাজদীদের কাজ না করেও একজন বড় আলিম 'আল্লামা' হিসেবে গণ্য হতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ কালেমা পড়ে মারা গেলে যদি বেহেশতে যাওয়া যায় তাহলে আত্মহত্যা করার সময় কেউ যদি কালেমা পড়ে সে কি বেহেশতে যেতে পারবে ?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আত্মহত্যাকারী দোযখেই যাবে। তাই আত্মহত্যাকারী মৃত্যুর সময়ে কালেমা উচ্চারণ করলেও জান্নাতী হওয়া স্বাভাবিক নয়। মনস্তাত্ত্বিক দিকে দিয়েও কালেমায়ে তাইয়েবা মানুষের মনে যে দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে তার ফলে আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতাই সৃষ্টি হয়। যে আত্মহত্যা করে সে এ কথাই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ থেকেও নিরাশ। সুতরাং বাস্তবে আল্লাহতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে আত্মহত্যা করা স্বাভাবিক মনে হয় না।

কালেমা তাইয়েবা কতগুলো শব্দ সর্বস্ব বাক্যই নয়। কালেমা তাইয়েবার মাধ্যমে আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের যে ঘোষণা দেয়া হয় তা অনুভব না করলে এবং অন্তরে সেই বিশ্বাস বদ্ধমুল না হলে ঈমান মজবুত হতে পারে না। তাই না বুঝে কেউ আত্মহত্যার সময় কালেমা পড়লেও তা ঈমানের পরিচয় দেয় না। মুখে কালেমার উচ্চারণের সাথে সাথে অন্তরে এ কালেমার বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া ঈমান হয় না।

নবী করীম (সাঃ)-এর সময়ও একজন লোক সাহাবায়ে কেরামের সাথে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে শত্রু নিধন করে চলছিলেন। নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট তাঁর যুদ্ধের পারদর্শিতা ও সাহসিকতার খবর দেয়া হলে তিনি বললেন—'এ লোকটি তো দোযখী বলে আমাকে জানানো হয়েছে।' একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ঐ লোকটি আহত অবস্থায় যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে নিজের

www.amarboi.org

অস্ত্র দিয়েই আত্মহত্যা করলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম মন্তব্য করলেন যে, রাসূল (সাঃ)-এর খবর মিথ্যা হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের পর তাঁকে ততক্ষণ পর্যন্ত দাফন করা হয়নি যতক্ষণ মুসলিমদের জন্য নেতা নির্বাচিত হয়নি। এটা কি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল ?

উত্তর ঃ সামষ্টিক কোনো বিষয়ে একার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্বশীল মারা গেলে বা পদত্যাগ করলে সঙ্গে সঙ্গে অন্ততপক্ষে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল মনোনীত করা ছাড়া ঐ প্রতিষ্ঠান একদিনও চলতে পারে না।

নবী করীম (সাঃ) একটি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর সে রাষ্ট্র আর সরকারের দায়িত্ব কার ওপরে থাকবে সে সিদ্ধান্ত হওয়াটাই প্রথম প্রয়োজন ছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাফনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব কে পালন করবে তা পূর্বে নির্ধারিত হয়নি। সে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান নির্বাচিত করার প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকাল এত বিরাট ঘটনা যে, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কারো উপর অর্পিত হওয়া বিলম্বিত হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবর্তমানে নামাযের ইমামতি, রাসূলুল্লাহর কবরের স্থান নির্বাচন ইত্যাদির ব্যাপারেও শৃঙ্খলার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমস্যা দেখা দিতো।

রাসূল (সাঃ) রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বশীল মনোনীত করে যাননি বলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সাহাবায়ে কেরামের প্রথম কর্তব্য ছিল। এর থেকেই একথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সমাজে ইমামত ও খেলাফতের গুরুত্ব কত বেশী। এ কারণেই হযরত উমর (রাঃ) বলেছিলেন—'জামায়াত ছাড়া দ্বীন টিকতে পারে না, আর আমীর ছাড়া জামায়াত চলতে পারে না।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর রাসূলের প্রতিনিধি (খলিফা) নির্বাচনের গুরুত্ব সাহাবায়ে কেরাম অনুভব করেছিলেন বলেই এ সিদ্ধান্ত সর্বাগ্রে নেয়া প্রয়োজন বোধ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ মুজাদ্দিদ শব্দের অর্থ কি ? প্রথম মুজাদ্দিদ কে ছিলেন ?

উত্তর ঃ 'মুজাদ্দিদ' শব্দটি আরবী 'তাজদীদ' শব্দ থেকে এসেছে। আর তাজদীদ শব্দটি জাদীদ শব্দটি থেকে গঠিত। 'জাদীদ' শব্দের অর্থ 'নতুন'। তাজদীদ মানে নতুনভাবে গঠন করার কাজ। মুজাদ্দিদ অর্থ যিনি নতুনভাবে গড়েন। ইসলামী পরিভাষায় 'মুজাদ্দিদ' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি ইসলামের এমন কোনো বিষয় যা সমাজে প্রচলিত নয় তা নতুন সমাজে প্রচলন করার চেষ্টা করেন অথবা যা ইসলামে নেই তা ইসলামের নামে সমাজে প্রচলিত হয়ে থাকলে সেটাকে সমাজ থেকে উৎখাত করে ইসলামের আসল রূপ বহাল করার চেষ্টা করেন।

www.amarboi.org

সাধারণভাবে 'মুজাদ্দিদ' শব্দের বাংলা করা হয় 'সংস্কারক'। এই শব্দের দ্বারা ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ারও আশংকা থেকে যায়। ইসলাম আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান। এর সংস্কার বা সংশোধন করার ইখতিয়ার মানুষের নেই। ওহীর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী (সাঃ)-এর নিকট ইসলামের যে চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের কোনো অধিকার কারো নেই। মুজাদ্দিদকে শুধু এ অর্থে সংস্কারক বলা যেতে পারে যে, ইসলামের আসল রূপের বিপরীত কিছু চালু হয়ে থাকলে যার কোনো ভিত্তি কুরআন-হাদীসে নেই সেটার প্রচলন বন্ধ করার চেষ্টা করা। এই হিসেবে মুজাদ্দিদের কাজ ইসলামের সংস্কার ও সংশোধন নয়, বরং ইসলামের ভিত্তিতে সমাজের সংস্কার ও সংশোধন।

এই ধরনের সমাজ সংস্কার ও সংশোধনের কাজের পরিমাণ অল্প হতে পারে, বেশীও হতে পারে। সে হিসেবে মুজাদ্দিদও ছোট-বড় হতে পারে। বড় ধরনের তাজদীদের কাজ করলে কোনো ব্যক্তি যুগের মুজাদ্দিদ বলেও গণ্য হতে পারেন।

নবী করীম (সাঃ) ইসলামের যে বিশুদ্ধ রূপ দুনিয়ায় রেখে গেলেন তা বাস্তবে চালু রাখার জন্য ইসলামী খেলাফতের আকারে একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা খোলাফায়ে রাশেদার যুগে চালু ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সময়ে যখন ধীরে ধীরে খেলাফত ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করলো এবং ইয়াজিদকে খলিফার নামে বাদশাহ হিসেবে গদীতে বসানো হলো তখন হযরত হুসাইন (রাঃ) তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এ হিসেবে তাঁকেই ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদ বলা যায়। কিন্তু তাজদীদের যে কাজ তিনি করতে চেয়েছিলেন সেটা উমর বিন আবদুল আজীজ (রাহঃ)-এর সময়ে সফলতা লাভ করে। সে হিসেবে উমর বিন আবদুল আজিজ (রাহঃ)-কে প্রথম সফল মুজাদ্দিদ বলা যায়।

প্রশ্ন ঃ হাদীসে কুদসী কী ? এটি যদি আল্লাহর কথা হয়ে থাকে তাহলে তা ওহী বলে গণ্য নয় কেন ?

উত্তর ঃ 'হাদীসে কুদসী' ঐ হাদীসকে বলা হয় যে হাদীসে রাসূল (সাঃ) কোনো কথা 'আল্লাহ বলেছেন' বলে উল্লেখ করেন। যেমন রাসূল (সাঃ) বলেছেন—'আল্লাহ বলেন' একথা দিয়ে যেসব হাদীস শুরু হয় সেসব হাদীসকে 'হাদীসে কুদসী' বলা হয়।

রাসূল (সাঃ)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে 'হাদীস' বলা হয়। হাদীসের ভাষা কুরআনের মতো আল্লাহর ভাষা নয় বটে, কিন্তু হাদীসের মধ্যে সে 'ভাব' প্রকাশ করা হয় তা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকেই করা হয়। সুতরাং হাদীসও ওহী। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য এটুকুই যে, কুরআনের ভাব ও ভাষা দুটোই আল্লাহর, কিন্তু হাদীসের ভাষা আল্লাহর নয়। তাই কুরআনকে বলা হয় 'ওহী মাতলু' (যা তিলাওয়াত করা হয়), আর হাদীসকে বলা হয় 'ওহী গাইরী মাতলু' (যা কুরআনের মতো তিলাওয়াতের বিষয় নয়)। 'মাতলু' অর্থ যা জিব্রাইল (আঃ) রাসূল (সাঃ)-এর নিকট তিলাওয়াত করেছিলেন।

সুতরাং হাদীসে কুদসীকে 'ওহী' গণ্য করা হয় না বলে ধারণা সহীহ নয়। যেখানে সব হাদীসই ওহী সেখানে হাদীসে কুদসীকে ওহী গণ্য না করার কোনো কারণ নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, হাদীসে কুদসী কুরআনের মতো ওহী মাতলু নয়।

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে ঘোষণা দিয়েছেন যে, রাসূল (সাঃ) আল্লাহর ইশারা ছাড়া নিজের মত থেকে দ্বীনের ব্যাপারে কোনো কথা বলেন না। সুতরাং হাদীসও ওহী।

প্রশ্ন ঃ সূর্য কোন্ আসমানে ? যদি প্রথম আসমানে হয় তার প্রমাণ কী ? আর ৪র্থ আসমানে হলে তার প্রমাণ কী ?

উত্তর ঃ সূরা মূলক-এর ৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন—'আমি (তোমাদের) কাছের আসমানকে বড় বড় বাতি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি।' এর দ্বারা নিশ্চিতরূপে একথাই বুঝা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা পৃথিবী আলোকিত তা পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানের অন্তর্গত। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সূর্য এবং চন্দ্র ছাড়া পৃথিবীর জন্য বড় কোনো বাতি নেই। আল্লাহ বলেছেন, এ বাতি নিকটবর্তী আসমানে রয়েছে। সুতরাং একথাই প্রমাণিত হয় যে, সূর্য প্রথম আসমানেই অবস্থিত।

আসমান বলতে এই পৃথিবীর বাইরের শূন্যলোককেই বুঝায়। মহাশূন্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে তা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহের একটি বিরাট জগৎ রয়েছে যার মধ্যে পৃথিবী একটি গ্রহ মাত্র। সূর্যকেন্দ্রিক এ গোটা সৃষ্টিকে আমরা 'সৌরজগত' বলে থাকি। বৈজ্ঞানিকদের মতে এ রকম কোটি কোটি 'সৌরজগত রয়েছে। হয়তো সেসব অন্য আসমানের সৃষ্টি বলে গণ্য।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতি সত্ত্বেও কুরআনে বর্ণিত সাত আসমান সম্পর্কে এখনও সঠিক ধারণায় পৌছা সম্ভব হয়নি। তবে মহাশূন্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান যেটুকু ধারণা দিয়েছে তা থেকে সূর্যকে প্রথম আসমানের অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে হয়।

প্রশ্ন ঃ বুদ্ধিজীবী কাকে বলে ? বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা কি ৩১-এর বেশী নেই, কারণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখা যায় বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি ৩১ জনের বেশী হয় না।

উত্তর ঃ বুদ্ধিজীবী শব্দটা শ্রমজীবীর বিপরীত অর্থই বহন করে। যারা দৈহিক পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করে তাদের 'শ্রমজীবী' বলে। আর যারা বিদ্যা-বুদ্ধি প্রয়োগ করে জীবিকা অর্জন করে তাদেরকেই 'বুদ্ধিজীবী' বলা হয়। যদিও শ্রমজীবীদের কিছু না কিছু বুদ্ধির দরকার হয়। আর বুদ্ধিজীবীদের কিছু না কিছু কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। তবু শ্রমজীবীরা প্রধানতঃ দৈহিক পরিশ্রম করে থাকে। আর বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত বিদ্যা-বুদ্ধিকেই কাজে লাগান।

উক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষক, আইনজীবী, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ওয়ায়েজ, কবি, সাহিত্যিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পপতি, বড় ব্যবসায়ী ইত্যাদি সবাইকে 'বুদ্ধিজীবী' বলে স্বীকার করা উচিত।

গত কিছুদিন থেকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ৩১ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি বারবার পত্রিকায় আসায় এ ধারণা করা উচিত নয় যে, বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা মাত্র ৩১ জন। বর্তমানে বাংলাদেশে মন্ত্রীসভায় যতজন লোক মন্ত্রী রয়েছেন তাদেরকেই যেমন মন্ত্রীত্বের একমাত্র উপযুক্ত বলা যুক্তিযুক্ত নয়, তেমনি বুদ্ধিজীবীর পরিচয় দিয়ে বারবার বিবৃতি দেয়ার কারণেই একমাত্র তাদেরকেই বুদ্ধিজীবী মনে করারও কোনো

www.amarboi.org

যুক্তি নেই। যারা সমাজে কোনো না কোনোভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, স্বাভাবিকভাবেই তাদের নাম জনগণের সামনে আসে। ৩১ জন বুদ্ধিজীবীর বাইরে যত বুদ্ধিজীবী আছেন তাদের কোনো সক্রিয় ভূমিকা না থাকলে এ ৩১ জনকে একমাত্র বুদ্ধিজীবী দাবী করার দোষে অপরাধী মনে করা যায় না।

প্রশ্ন ঃ 'বিকেলের আসর' বইতে মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) বলেছেন 'গ্রামের মেয়েরা প্রয়োজনে ফসল কাটে, খাবার পৌঁছিয়ে দেয়, মূলতঃ তা ঘরের কাজ।' আমি বলতে চাই, যেসব নারী পুরুষের সাথে চাকরী করে তারাও তো পরিবার চালানোর কার্যে চাকরীর টাকা ব্যয় করে। সুতরাং এটা কি ঘরের কাজ নয় ?

উত্তর ঃ মাওলানা মওদূদী যা বলেছেন আমার নিকট তার সরল অর্থ এই যে, গ্রামের মেয়েরা প্রয়োজন হলে তাদের স্বামীর সাথে জমির ফসল কাটতে বাধ্য হয় এবং মাঠে খাবার পৌঁছাবার যোগ্য ছেলে না থাকলে স্ত্রীকেই স্বামীর খাবার পৌঁছাতে হয়। এ জাতীয় কাজকে তিনি ঘরের কাজ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। কারণ এ কাজের জন্য তাকে পর পুরুষের সাথে মেলামেশার কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এটুকুকে ভিত্তি করে আপনি নারী-পুরুষের একসাথে চাকরী করা পর্যন্ত কি করে জায়েজ মনে করতে পারেন ?

পরিবারে আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে যদি আপনি মেয়েদেরকেও পুরুষদের সাথে চাকরী করা সঠিক মনে করেন তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) এর ঐ বক্তব্যটুকুই এর দলিল হিসেবে পেশ করা মোটেও যুক্তিপূর্ণ নয়। কারণ পরিবারের কোনো মেয়ে পরিবারের লোকদের সাথে দায়ে পড়ে ফসল কাটা আর ভিন্ন পুরুষের সাথে চাকরী করার পরিবেশ কখনও এক হতে পারে না। আর মাঠে পরিবারের লোকজনের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া পর্দার খেলাফ মোটেই নয়। মেয়েদের বাইরে যেতে হলে তো পর্দার সাথেই যেতে হয়।

প্রশ্ন ঃ এপ্রিল '৮৮ সংখ্যা মাসিক পৃথিবীতে 'সূর্য কোন্ আসমানে' এই প্রশ্নের জবাবে আপনি বলেছেন—'বৈজ্ঞানিকদের মতে এ রকম কোটি কোটি 'সৌরজগৎ' রয়েছে। হয়তো সেসব অন্য আসমানের সৃষ্টি বলে গণ্য।' এই উত্তরের 'সৌরজগৎ' বাক্যাংশটি না হয়ে সম্ভবতঃ 'নক্ষত্র জগৎ' হওয়া উচিত ছিল। কেননা সূর্যও একটি নক্ষত্র এবং সূর্যের ন্যায় কোটি কোটি নক্ষত্রই আরো বিদ্যমান তাদের নিজস্ব জগৎ নিয়ে। ঐ সমস্ত নক্ষত্রকে আপনি 'হয়তো অন্য আসমানের' বলে বলেছেন। এই ধারণাটি সম্ভবতঃ সঠিক নয়। এতে আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ ছোট হয়ে যাচ্ছে। কেবল সৌরজগৎকে নিয়ে ১ম আসমান হলে অন্যান্য নক্ষত্রের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না। বস্তুতঃ আল্লাহর সৃষ্টি এত বিরাট এবং অসীম যে তার সামান্যই আমরা দেখতে পাই। বৈজ্ঞানিকগণও যা আবিষ্কার করেছেন এবং যা ধারণা করেছেন তা ১ম আসমানের কতকাংশের, সম্পূর্ণটার নয়। নক্ষত্রের (সূর্যের) আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ড ১,৮৬,০০০ মাইল। বৈজ্ঞানিকদের কথা হচ্ছে যে, নক্ষত্রের আলো সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে চলতে চলতে যখন পৃথিবীতে পৌঁছে তখন সেটা আবিষ্কৃত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে সর্বশেষ যে নক্ষত্রটি আবিষ্কৃত হয় তার নাম 'ভেগা'। এখনও কিছু নক্ষত্র

www.amarboi.org

অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে। এই সমস্তই ১ম আসমানের জিনিস, নইলে পৃথিবীতে তার আলো আসতে পারে না এবং আবিষ্কৃতও হতে পারে না।

এরপরে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম আসমান—যাদের সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহরই জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক এবং যতটুকু ওহীর মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন কালামে পাকে নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়া আছে। আমার এই ধারণা সম্পর্কে আপনার মতামত কী তা জানাবেন ?

উত্তর ঃ সাত আসমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেয়ার জন্য মহাশূন্য সম্পর্কে যতটুকু এ পর্যন্ত জানা গেছে তা অতি সামান্য। প্রথম আসমান বলতে কতটুকু বুঝায় সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার সাধ্য আমার নেই। এ ব্যাপারে আপনার ধারণাও সত্য হতে পারে। তবে আপনার এ যুক্তিটি বলিষ্ঠ বলে মনে হয় না যে, এ পৃথিবীর মানুষের পক্ষে প্রথম আসমানের বাইরে অন্য আসমানের কোনো জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ যখন এ পৃথিবীর মানুষকে সাত আসমানের অস্তিত্ব সম্পর্কে খবর দিয়েছেন তখন আসমানের বাইরে আর কোনো আসমানের জ্ঞান না পাওয়ার কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমি একথা বলিনি যে, আমাদের সৌরজগতের বাইরে যে কোটি কোটি সৌরজগৎ রয়েছে তা প্রথম আসমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি শুধু এটুকুই বলেছি যে, সেসব প্রথম আসমানের বাইরেও হতে পারে। এটা একটা অনুমান মাত্র। আর অনুমান নির্ভুল না-ও হতে পারে। আপনি প্রথম আসমান সম্পর্কে যে ধারণা করেছেন তাও—অনুমানই বটে। সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী জ্ঞান এখনো আমাদের কাছে নেই।

প্রশ্ন ঃ মহানবী (সাঃ) বলেছেন—'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানের সন্ধানে ফিরবে।' এটা কি শুধু দ্বীনি ইলম প্রসঙ্গে আমরা ধরবো ? নাকি অন্য শিক্ষা প্রসঙ্গেও ধরবো ?

উত্তর ঃ কুরআন ও হাদীসে 'ইল্‌ম' শব্দটি প্রধানত একটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সে পরিভাষা অনুযায়ী 'ইল্‌ম' মানে ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত জ্ঞান। এ ছাড়া 'ইল্‌ম' শব্দটি 'নির্ভুল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। বহু জায়গায় আল্লাহ বলেছেন—'তোমরা যা কিছু বলছো নিছক ধারণা বা অলীক কল্পনার ভিত্তিতে বলছো। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা তোমাদের নেই। যেমন-সূরা আন নিসা ঃ ১৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে, কল্পনার আনুগত্য করা ছাড়া তাদের নিকট এ বিষয়ে কোনো ইল্‌ম নেই।'

'ইল্‌ম' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'জ্ঞান'। আর জ্ঞান সত্যিকারভাবে তাই যা নির্ভুল। যেহেতু সব বিষয়ে কোনো না কোনো একটা ধারণায় না পৌছা পর্যন্ত মানুষ শান্তিবোধ করে না এবং তার জ্ঞানপিপাসা বিভিন্ন বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে তাকে বাধ্য করে সেহেতু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার পক্ষে নির্ভুল জ্ঞান হাসিল করা সম্ভব হয় না। তাই যে জ্ঞান নির্ভুল নয় তা জ্ঞান হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তা নিছক ধারণা বা অনুমান মাত্র।

ওহী ব্যতীত আর যে তিনটি জ্ঞানের উৎস রয়েছে তা নির্ভুল বলে প্রমাণিত নয়। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বোধী (intuition) এ তিনটির মাধ্যমে সাধারণতঃ মানুষ জ্ঞান পেয়ে

www.amarboi.org

থাকে। কিন্তু সে জ্ঞানের সবটুকু নিশ্চিতভাবে সঠিক বলে দাবী করা সম্ভব নয়। কারণ সঠিক বলে ধারণা করার পরও বহু জ্ঞান অশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়ে যায়।

নির্ভুল জ্ঞানের উৎস একমাত্র ওহী। কারণ সব বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তাই ওহীর জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই না করে অন্য তিনটি উৎসের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে নির্ভুল মনে করা মোটেই নিরাপদ নয়।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইল্‌ম অর্জন করা ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। এখানে ইল্‌ম বলতে ওহীর ইল্‌মই বুঝায়। যে ওহীর ইল্‌ম অর্জনের চেষ্টা করে তার দুনিয়ার যাবতীয় ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান সন্ধান করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

ইল্‌ম ফরয বলার অর্থ এটা নয় যে, ওহীর মাধ্যমে যত ইল্‌ম পাঠানো হয়েছে সে সব ইল্‌মই সব মানুষের অর্জন করা ফরয। কোনো মানুষের পক্ষেই ওহীর সবটুকু ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়। যদি ওহীর সবটুকু ইলম অর্জন করা ফরয হয় তাহলে কোনো মানুষের পক্ষেই এ ফরয আদায় করা সম্ভব নয়। ইল্‌ম ফরয বলার অর্থ এটাই যে, যার ওপর যে দায়িত্ব রয়েছে তা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো আদায় করার জন্য যে পরিমাণ ওহীর ইল্‌ম প্রয়োজন তা অর্জন করাই তার ওপর ফরয। যেমন যার ওপরে হজ্ব ফরয, হজ্ব সংক্রান্ত ওহীর ইল্‌ম অর্জন করা তার ওপর ফরয। যার ওপর হজ্ব ফরয নয়, তিনি হজ্বের ইল্‌ম অর্জন না করলে দোষী হবেন না। তেমনিভাবে যারা বিয়ে করেনি 'দাম্পত্য জীবন' সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ইল্‌ম তাদের ওপরও ফরয নয়। কিন্তু বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে মুসিলম হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে তাদের ওপর এ বিষয়ে ওহীর ইল্‌ম অর্জন করা ফরয। এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের জন্য ওহীর যেটুকু ইল্‌ম জরুরী তা অর্জনের জন্য আজীবন চেষ্টা করার ওপরই উপরোক্ত হাদীসে রাসূল (সাঃ) তাগিদ দিয়েছেন। এ হিসেবে ওহীর ইল্‌ম হাসিলের চেষ্টা করা সরাসরি ফরয।

ওহীর ইল্‌মের বাইরেও বাস্তব জীবনে আরও কিছু ইল্‌ম অর্জন করা পরোক্ষভাবে ফরয। যেমন যে ব্যক্তি ডাক্তারী পেশা গ্রহণ করছে তার ওপর ভালোভাবে চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন করা ফরয। কারণ আল্লাহ তায়ালা হালাল রুজি তালাশ করা ফরয করেছেন। চিকিৎসা পেশার মাধ্যমে তাকে হালাল রুজি পেতে হলে এ বিদ্যা সঠিকভাবে শিখতে হবে। তা না শিখলে মানুষকে প্রতারণাই করা হবে।

প্রশ্ন ঃ মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ছাড়া আর কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করেন না। অথচ সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল নিজেই বলেছেন—'সাহাবীগণ তারকার মতো'। এর ভিত্তিতেই বলা হয় সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ। এখন মাওলানার এ রকম মনে করা ঠিক আছে কি না ? থাকলে তা কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে জানতে চাচ্ছি।

উত্তর ঃ অনেকেই সমালোচনার সঠিক অর্থ বোঝে না বলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমালোচনার অর্থ গালিগালাজ করা বা হেয় সাব্যস্ত করা নয়। সমালোচনার অর্থ হলো যুক্তির বিচারে ভুলত্রুটি আলোচনা করা। 'আল্লাহ এবং রাসূল ছাড়া আর কেউ

www.amarboi.org

সমালোচনার উর্ধ্বে নয়'-একথাটির সহজ অর্থ এটাই যে, একমাত্র আল্লাহরই কোনো ভুল হয় না এবং রাসূল আল্লাহর প্রেরিত ওহীর দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দরুন রাসূলও ভুলের উর্ধ্বে। এ কারণেই আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশ আমাদের যুক্তি এবং বুদ্ধির নাগালের বাইরে হলেও তা অন্ধভাবে মেনে নেয়া ঈমানের দাবী।

কুরআন মজীদের সূরা আল আহযাবের ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে—'কোনো মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের এই অধিকার নেই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেন তখন সে ঐ ব্যাপারে নিজে কোনো ফায়সালা করার ইখতিয়ার রাখবে। আর যে লোক আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করবে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত।'

কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) ছাড়া অন্য সকলেরই ভুল হওয়া সম্ভব। এমনকি সাহাবায়ে কেরামও ভুলত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না। এ কারণেই মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলন করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত হাদীসের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে তাঁদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমালোচনা করেছেন। অবশ্য এ সমালোচনার উদ্দেশ্য হাদীসের সত্যতার বিচার করা। সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা এতে একটুও ক্ষুন্ন হয়নি।

কালিমা তাইয়েবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র মর্মকথা এই যে, একমাত্র আল্লাহকে মনিব মেনে এবং তাঁর রাসূলকে আদর্শ জেনে চলতে হবে। পিতা-মাতা, উস্তাদ ও নেতাকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের অধীনেই মানতে হবে। (সূরা আন নিসা ঃ ৫৯ আয়াত)

'সাহাবাগণ তারকা' এ মর্মে যে হাদীসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সহীহ হাদীস কি না এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ প্রশ্ন তুলেছেন। এ হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করলেও কোনো সমস্যা নেই। এ হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা এভাবে করলো বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকে না—তারকার উল্লেখ থেকে স্পষ্টেই বুঝা যায় যে, সাহাবাগণকে সূর্য বা চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়নি। সূর্য হলো সকল আলোর উৎস। চন্দ্রও সেখান থেকেই আলো পায়।

আকাশে যখন সূর্য থাকে তখন চাঁদের আলোর কোনো প্রয়োজন হয় না। যখন সূর্য থাকে না তখন চাঁদের আলোই সবচেয়ে উজ্জ্বল। রাতে যখন চাঁদ থাকে না তখনই তারকার প্রয়োজন পড়ে। এ হিসেবে আমরা আল্লাহ পাককে সূর্যের সঙ্গে এবং রাসূল (সাঃ)-কে চন্দ্রের সাথে তুলনা করতে পারি।

সুতরাং যেসব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ থেকে কোনো আলো পাওয়া যায় না সেসব বিষয়ে যদি সাহাবায়ে কেরামের কোনো মতামত পাওয়া যায় তাহলে তার গুরুত্ব অবশ্য দিতে হবে। এ অর্থেই সাহাবায়ে কেরামকে তারকার মর্যাদা দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়।

প্রশ্ন ঃ আধুনিক সরকারের আইনসভা ও মজলিসে শূরার মৌলিক পার্থক্য কী ? রাসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার সময়ের শূরা সদস্যগণ কি গোপন ব্যালটে জনগণের

www.amarboi.org

প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন, নাকি অন্যকোনো পন্থায় ? মজলিসে শূ'রার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী কী ? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জানাবেন।

উত্তর ঃ আধুনিক যুগের আইনসভার যে দায়িত্ব তা পালন করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে যে আইনসভা গঠিত হওয়া উচিত, ইসলামী পরিভাষায় তারই নাম 'মজলিসে শূ'রা'।

দেশের জন্য আইন রচনা ও প্রয়োজনে পরিবর্তন করা আইন সভার দায়িত্ব। যদি সরকার ইসলামী না হয় তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী কোনো আইন করার পথে কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূ'রা শুধু কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আইন রচনা করেই ক্ষান্ত হয় না, প্রচলিত কোনো আইন যদি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী হয় তা-ও সংশোধন করে ছাড়ে। এটাই আধুনিক সরকারের আইনসভা ও ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূ'রার মধ্যে পার্থক্য।

রাসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার সময়ে নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অনুযায়ী শূ'রার সদস্যগণ নির্বাচিত হননি, এমনকি প্রথম চারজন খলিফাও একই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হননি। তা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সকল দেশ ও সকল কালের জন্য ইসলাম নির্বাচনের কোনো একটি পদ্ধতিই বাধ্যতামূলক করে দেয়নি। কিন্তু বিনা নির্বাচনে নিজের ইচ্ছায় ক্ষমতা দখল করা যে ইসলামের নিয়ম নয় সে কথা স্বীকৃত। এ কারণেই হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাহাবীর মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নির্বাচিত নন বলে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য নন। অথচ হযরত উমর বিন আবদুল আযীয সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত হওয়ার কারণে দ্বিতীয় উমর ও পঞ্চম 'খলিফায়ে রাশেদ' হিসেবে গণ্য। এর দ্বারা ইসলামের নির্বাচনের গুরুত্ব সুস্পষ্ট।

কিন্তু নির্বাচন পদ্ধতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে জনগণের অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম হতে পারে। বর্তমান যুগে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের যে পদ্ধতি চালু হয়েছে খোলাফায়ে রাশেদার সময় তা গড়ে ওঠেনি। তাই সে সময়কার শূ'রার সদস্য তারাই হতেন যাদেরকে আমীরুল মু'মিনীন এ কাজের যোগ্য মনে করতেন। মজলিসে শূ'রার গঠন ও কার্যাবলী কিরূপ হওয়া উচিত তা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারীরাই নির্ধারণ করার অধিকারী।

প্রশ্ন ঃ আমরা সকলেই মুসলমান দাবী করি। কিন্তু খাঁটি মুসলমান কোন্ ব্যক্তি ? সেই ব্যক্তিদের চিনবো কিভাবে ? বিস্তারিত আলোচনা করবেন কি ?

উত্তর ঃ খাঁটি মুসলমান চিনতে হলে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। ইসলাম মানুষকে আল্লাহর খলিফার মর্যাদা পাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। কি কি গুণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হলে সেই মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় তা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

এ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এবং মৃত্যুর পরপারের অবস্থা সম্বন্ধে ইসলাম যে সঠিক জ্ঞান দিয়েছে তার ভিত্তিতে একজন মুসলিমের আকীদা-বিশ্বাস নির্মিত হয়। এ

www.amarboi.org

আকীদা-বিশ্বাস যে পরিমাণ মজবুত হয় সে পরিমাণই তার বাস্তব কর্মজীবন ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ বিষয়ে মুসলিম সমাজে সাধারণভাবে মোটামুটি জ্ঞান রয়েছে। তারই ফলে সমাজের ভালো মুসলমানদেরকে জনগণ শ্রদ্ধা করে এবং এই ধরনের কোনো মুসলমান মারা গেলে সকলেই তার সম্বন্ধে আফসোস করে বলে, 'লোকটা বড়ই ভালো মানুষ ছিল।' এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভালো মুসলমান চিনতে তেমন বেগ পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে নারীদের অবনতির জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী কে বা কী ?

উত্তর ঃ অবনতির শুধু নারীদেরই হয়নি, নারী-পুরুষ সকলেরই হয়েছে। বরং পুরুষদের অবনতির কারণেই নারীদের অবনতি হয়েছে। ইসলামের জ্ঞান ও চরিত্রের বিকাশের অভাবই এ অবনতির মূল কারণ।

আমাদের দেশে দুইশ' বছর ইংরেজের শাসনের ফলে শিক্ষাব্যবস্থা, আইন ও প্রচার ব্যবস্থা, ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র সৃষ্টির বদলে বিপরীত গুণ বিশিষ্ট লোকই সৃষ্টি করেছে। ইসলামী শাসন, ইসলামী আইন, ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও ইসলামী শিক্ষার অভাবেই আমরা অবনতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে গেছি।

এ পরিস্থিতিতে পুরুষদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও ইসলামী চরিত্র গঠনের যেটুকু চেষ্টা হয়ে এসেছে তারই ফলে অন্ততঃ একদল লোক ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী এবং ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী সৃষ্টি হয়েছে। তাদের প্রভাবেই মুসলিম জনগণের মধ্যে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস এখনও অটুট আছে। অবশ্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অভাবে জনগণের চরিত্র ঈমানের মান অনুযায়ী গঠিত হতে পারছে না।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পুরুষদের মধ্যে যেটুকু কাজ করা হয়েছে নারী সমাজ তা থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছে। মহিলাদের মধ্যে উলামা তৈরীর কোনো চেষ্টা পূর্বে না থাকার কারণে মহিলা অঙ্গনে ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারাই নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। এর ফলে নারী সমাজের নিকট ইসলামী জ্ঞান ব্যাপকভাবে পেশ করা সম্ভব হয়নি। এবং ইসলামী চরিত্রের নমুনা পেশ করার যোগ্য একদল শিক্ষিতা মহিলা সমাজে গড়ে ওঠতে পারেনি। আল্লাহর মেহেরবানীতে বর্তমানে এ অভাব পূরণের জন্য কাজ চলছে। এ অভাব যে পরিমাণ পূরণ হবে সে পরিমাণই নারী সমাজের অবনতি দূর হবে।

নারী সমাজের উন্নতি ও অবনতি পুরুষদের ওপরে নির্ভর করে। তাই নারীদের যে অবনতির কথা বলা হয় তার জন্য নারীদেরকে দায়ী করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রশ্ন ঃ ইবলিস কে ? সে কিভাবে মালাইকাদের মধ্যে প্রবেশ করলো ? আর যদি সে মালাইকা-ই হয়, তাহলে কেন সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করলো ?

উত্তর ঃ ইবলিস জ্বীন জাতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ইবাদত করতে করতে সে এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলো যে, সত্তার দিক দিয়ে ফেরেশতাদের মতো নিষ্পাপ না

www.amarboi.org

হলেও গুণের দিক দিয়ে ফেরেশতাদের সমান মর্যাদা আল্লাহর নিকট পেয়েছিল। সে কারণেই যখন আদম (আঃ)-কে সেজদা করার নির্দেশ ফেরেশতাদের দেয়া হলো তখন তারও সে আদেশ পালন করা উচিত ছিল। ফেরেশতাদের আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কোনো ইখতিয়ারই নেই। কিন্তু জ্বীন জাতির ইখতিয়ার আছে। আল্লাহ ফেরেশতাদের মতো ইবলিসকে আল্লাহর হুকুম পালন করতে বাধ্য করেননি। তাই ইবলিস তার ইখতিয়ার প্রয়োগ করে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে।

এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, জ্বীন-ইনসান ইবাদতের মাধ্যমে যত উচ্চ মর্যাদাই লাভ করুক, আল্লাহর দেয়া যেকোনো পরীক্ষায় ফেল করা তাদের পক্ষে সম্ভব। এর থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, বেশী ইবাদত করছে বলে অহংকার সৃষ্টি হলে পতনের আশংকা থেকেই যায়। ইবলিসের এ অহংকারই ছিল যে, সে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর হুকুমকে এ অহংকারের কারণেই সে অমান্য করেছে।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে রাষ্ট্রীয় বিধানে যেমন একজন ধর্মমন্ত্রীর পদ আছে, ইসলাম কায়েম হলে ইসলামী রাষ্ট্রে কি ধর্মমন্ত্রীর পদ থাকবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে নিছক ধর্মীয় বিষয়ের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় থাকবে কিনা সেটা রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র বা সরকারই সিদ্ধান্ত নেবে। এটা নিতান্তই একটা ব্যবস্থাপনার ব্যাপার। মসজিদগুলোকে সর্বদিক দিয়ে ইসলামী সমাজ গড়ার যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেও পৃথক মন্ত্রণালয় হতে পারে। এভাবে ফতোয়া বিভাগের জন্যও আলাদা মন্ত্রণালয় থাকতে পারে। সুতরাং এ জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা আগে থেকে করে রাখার প্রয়োজন নেই। ইসলামী সরকারই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

বর্তমানে সেক্যুলার সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় যে আকারে আছে সে ধরনের মন্ত্রণালয় ইসলামী রাষ্ট্রে থাকা স্বাভাবিক নয়।

প্রশ্ন ঃ একটা চিন্তা অহরহই মনকে পীড়া দিচ্ছে যে, আমরা মুসলমান, একই আল্লাহর বান্দাহ এবং একই নবীর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে এতে মতবিরোধ কেন ? কেন এত দলাদলি সৃষ্টি ? একদল মাযহাব মানেন, একদল মানেন না। একদল পীরের ভক্ত আর একদল পীর বিরোধী। মাযহাবপন্থীদের সাথে যদিও লা-মাযহাবী বা আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের ইসলামের মৌলিক বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই তথাপি এই মতবিরোধ এবং কোনো কোনো আনুষ্ঠানিক পার্থক্য হেতু কোনো কোনো আলেম তাদের পেছনে নামায পড়া নাজায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কেউ কেউ লা-মাযহাবী বা মুহাম্মদীগণকে ইসলামত্যাগী বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একথা অবশ্য সত্য যে, লা-মাযহাবীগণ নিজেদেরকে একটা পৃথক সম্প্রদায় বলে মনে করেন এবং কোনো কোনো এলাকায় তাদের পৃথক মসজিদও রয়েছে। এই সব বৈষম্য ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিমূলে ফাটলের সৃষ্টি করে কি না ? আর এ ফাটল যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, ভিত্তিমূলকে কিছুটা দুর্বল অবশ্যই করবে এবং ইসলামের শত্রুরাও কুমন্ত্রণার বিষ এ ফাটলে ঢুকাবার প্রয়াস পাবে। এ বৈষম্য দূর করার কি কোনো উপায় নেই ?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ মুসলমানগণ এক আল্লাহ, এক কুরআন ও এক রাসূলকে মানা সত্ত্বেও বিভিন্ন মাযহাব ও ফেরকায় বিভক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর ব্যাখ্যায় যেসব ক্ষেত্রে মতবিরোধের কোনো ফাঁকই রাখা হয়নি সেখানে কোনো মতবিরোধ নেই এবং সেগুলোর কারণে কোনো 'ফেরকা' বা 'মাযহাব' সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যেসব বিষয়ে আল্লাহ এবং রাসূলের বক্তব্যকে নেক নিয়তের সাথেই ব্যাখ্যা করার বেলায় মতপার্থক্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে মতবিরোধ শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেই দূষণীয় নয়। এ কারণেই চার মাযহাবের মধ্যে কতক বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও সকল মতকেই সকল মাযহাব শরীয়তসম্মত বলে স্বীকার করে এবং মাযহাবের পার্থক্যের কারণে এক মাযহাবের লোক অন্য মাযহাবের লোকের পেছনে নামায পড়তে কোনো আপত্তি করে না।

যারা মাযহাব মানেন না এবং কুরআন-হাদীসকে সরাসরি অনুসরণ করার চেষ্টা করেন তারাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। চার মাযহাব ও আহলে হাদীসের লোকদের একসাথে নামায পড়া এবং একের পিচনে অপরের নামায পড়তে কোনো আপত্তি হওয়ার কথা নয়। বরং একে অপরকে গোমরাহ মনে করাই দূষণীয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এসব বিষয়ে আমাদের মধ্যে কিছু লোক বাড়াবাড়ি করে থাকেন। তারা আহলে হাদীস ও মাযহাবপন্থীদের মধ্যে যে যে বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায় সেগুলোকে এত গুরুত্ব দেন যে, শতকরা ৯৫ ভাগেই পূর্ণ মিল থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক ঐক্যবোধ করেন না। এ জাতীয় বাড়াবাড়ি শরীয়তের বিধান নয়।

কোনো এলাকায় আহলে হাদীসগণের আলাদা মসজিদ থাকাটা দূষণীয় নয়। যদি সেই মসজিদে মাযহাবপন্থীদের নামাযে কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আলাদা মসজিদ হওয়াটা ক্ষতিকরও নয়।

পীরভক্ত ও পীরবিরোধী হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন ফেরকা গঠন করাও বাড়াবাড়ির আর একটি নমুনা। যদি দ্বীন শিক্ষার জন্য এবং দ্বীনের পথে চলার উদ্দেশ্যে উস্তাদ হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে পীর মানা হয় তাহলে এতেও আপত্তি করার কিছু নেই। পীরভক্ত ও পীরবিরোধীদের ঝগড়া সাধারণত তখনই সৃষ্টি হয় যখন একদল লোক পীর না ধরলে বেহেশতে যাবে না দাবী করে অথবা এমন লোককে পীর ধরার জন্য প্রচার চালায় যে ইলম ও আমলের দিক দিয়ে হাক্কানী পীর হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য নয়।

এ জাতীয় যত বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা আমাদের দেশে দেখা যায় তার মূল কারণ এই যে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু না থাকায় ইসলাম ইয়াতিমের মালে পরিণত হয়েছে। যার যেমন খুশী ইসলামের নাম দিয়ে উম্মতের মধ্যে ফিতনার সৃষ্টি করছে। তাই এসব দেখে যারা বেদনাবোধ করেন তাদের ঐ মূল কারণ দূর করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর তরীকায় ইসলামী আন্দোলন করার মাধ্যমে এসব ফিতনার মোকাবিলা করা সম্ভব।

www.amarboi.org

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ইসলামের সীমার ভিতরে থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে শরয়ী কারণেই বিভিন্ন মাযহাব বা ফেরকা থাকতে পারে। এটা অস্বাভাবিকও নয়, দূষণীয়ও নয়। কিন্তু এসব নিয়ে দলাদলি করা, একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো, ফতোয়াবাজী করা অবশ্যই দূষণীয়। এসবই উম্মতের ঐক্য বিনষ্টকারী। সাধারণতঃ একশ্রেণীর সংকীর্ণমনা ধর্ম ব্যবসায়ীদের কারণেই এ জাতীয় ফেতনার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ঃ প্রচলিত ধারণা, বিবাহে কোনো আত্মীয়-বন্ধু উপহার প্রদান করলে তা পরিশোধ করা অপরিহার্য। অর্থাৎ এই উপহার নাকি কর্জ। তাই ঐ উপহার দেয়া বন্ধুর অনুষ্ঠানে উপহার প্রদান করে কর্জমুক্ত হতে হবে। আমার প্রশ্ন, আসলে কি এ উপহার কর্জ হিসেবে বিবেচ্য হবে?

উত্তর ঃ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিবাহ-শাদীতে পরস্পর যে উপহার বিনিময় করে থাকে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কর্জ নয়। কর্জ তাকেই বলে যা কর্জ গ্রহণকারী ফেরত দিবার শর্তে কর্জদাতার নিকট থেকে চেয়ে নেয়। বিবাহের উপহার এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কর্জ হতে পারে না।

তবে যে আত্মীয়ের নিকট থেকে উপহার পাওয়া গেল সেই আত্মীয়ের ছেলে মেয়ের বিয়েতে উপহার দেয়া নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করা স্বাভাবিক। এ কারণেই অনেক সময় গরীব আত্মীয়দের জন্য উপহারের আদান-প্রদান আর্থিক বোঝা হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। তাই গরীব আত্মীয়দেরকে বিয়ের দাওয়াত দেয়ার সময় উপহার না আনার অনুরোধ করলে বিনা সংকোচে তারা বিবাহে শরীক হতে পারে।

এ জাতীয় উপহার সৌজন্যমূলক হয়ে থাকে। কেউ দিতে অক্ষম বলে তাকে হেয় মনে করা বা কেউ বেশী সক্ষম বলে তাকেথঅতিরিক্ত সমাদর করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ পাথরের মধ্যে কি জীবনের অস্তিত্ব আছে? বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রোটোপ্লাজ ম ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু কুরআনে আছে 'আর কোনো কোনো পাথর এমনও হয়ে থাকে যা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কোনো কোনোটি ফেটে গিয়ে তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কোনো কোনোটি আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়ে ভূতলে পতিত হয়। আর আল্লাহ তোমাদের ক্রিয়া কলাপ সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন।' (সূরা আল-বাকারা ঃ ৯ম রুকু)

উপরোক্ত আয়াত কি পাথরের জীবনীশক্তির ইঙ্গিত বহন করে না? আপনার মতামত পেশ করুন।

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির মধ্যে যে সমস্ত বস্তুকে বিজ্ঞান প্রাণহীন মনে করে তা বস্তুবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রাণহীন বলে গণ্য হলেও আল্লাহর নিকট জীবনহীন নয়। আল্লাহ তো জীবন্ত বস্তু থেকেও মৃত বস্তু বের করেন এবং প্রাণহীন উপাদান থেকেও জীবনের সঞ্চার করেন। কুরআন পাকে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, আসমান-যমীনের সকল বস্তুই আল্লাহর তসবিহ করে কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে আল্লাহর বক্তব্যের সাথে বস্তুবিজ্ঞানের মতামতের তুলনা করা চলে না।

www.amarboi.org

সূরা আল বাকারার যে আয়াতটি উল্লেখ করে এ প্রশ্নটি করা হয়েছে সে আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ দাবী করেননি যে, পাথরের মধ্যেও জীবন আছে। এ আয়াতের বক্তব্য ভিন্ন। যেসব লোক ওহীর জ্ঞান ও রাসূল (সাঃ)-এর জীবন চরিত থেকে হঠকারিতার কারণে এবং তাদের স্বার্থের বিপরীত বলে হেদায়াত গ্রহণ করতে রাজী হয়নি তারা যে নির্জীব পাথরের চেয়েও অধম সে কথা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ তায়ালা কথাটিকে এভাবে বলেছেন। তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ইংরেজী তারিখ অনুযায়ী বাংলাদেশে যে দিন ও তারিখে কোনো উৎসব পালন করা হয়, সারাবিশ্বের প্রতিটি দেশেও ঐ একই দিন-তারিখ অনুযায়ী একই সাথে উৎসব পালন করা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরবী তারিখ এই সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে আজ ঈদ হলে সৌদি আরবে ২ দিন আগে হয়ে যায়। এভাবে কোনো একটি ইবাদত আমরা সারাবিশ্বে একই সাথে করতে পারছি না। এ সমস্যার সমাধান ইসলাম কিভাবে দেয় ? যদি ইসলামে এর সমাধান না থাকে তাহলে কি ইসলাম ভৌগলিক সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে ? বিস্তারিত বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা রোযা, ঈদ, হজ্জ ইত্যাদি চান্দ্রমাসের হিসাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে হিসেবেই চাঁদ দেখে রোযা রাখা ও ঈদ করার নির্দেশ হাদীসে দেয়া হয়েছে। এর ফলে একই দিনে সবদেশে ঈদের উৎসব পালন করা যায় না বলে যারা এটাকে সমস্যা মনে করেন তাদের চিন্তার ভিত্তি কি তা আমার জানা নেই। একদিনে ঈদ করতে পারা গেল না বলেই ইসলাম ভৌগলিক সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি বলে মনে করার যুক্তিটিও আমার বোধগম্য নয়। এটাকে সমস্যা মনে করাটাই আসল সমস্যা।

তারা কি চান যে, ফযরের নামায সারা দুনিয়ায় একই সঙ্গে হোক এবং সারা দুনিয়ায় চাঁদ একই সঙ্গে উঠুক। যদি সেরকমই চান তা হলে সেটার ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহকেই বলতে হবে। যদি তিনি এ পৃথিবীকে নতুন করে তাদের দাবী অনুযায়ী তৈরী করেন তবেই সেটা হতে পারে।

রাত ও দিনের পরিবর্তন, চাঁদ ও সূর্যের পরিক্রমণ এবং সময়ের বিভিন্নতা আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি এবং তিনি স্বয়ং ইবাদতসমূহ পালনের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম পালন করায় কোনো সমস্যা নেই।

যদি চাঁদের বদলে সৌর মাসের হিসাবে রোযা ও ঈদ পালনের ব্যবস্থা করা হতো তাহলে মানুষের ওপর যুলুম হতো। হয়তো কোনো এলাকার লোকদের ওপর বেশী অনুগ্রহ হতো এবং অন্য এলাকার লোকদের ওপর চরম যুলুম হতো। সৌর মাসের ভিত্তিতে রোযার জন্য কোনো মাস নির্ধারিত হলে সেই মাস সবসময়ই একই ঋতুতে আসে। সেই হিসেবে কোনো দেশের লোক সারাজীবনই কঠিন শীতের সময়ই রোযা রাখতে বাধ্য হবে এবং কোনো দেশের লোক কঠিন গরমে সারাজীবন রোযা রাখতে বাধ্য হবে। চান্দ্র মাস সকল ঋতুতে আবর্তিত হয় বলে দুনিয়ার সকল মানুষ সকল ঋতুতেই রোযা রাখার সুযোগ পায়। আল্লাহ তায়ালা চান্দ্র মাসে রোযার ব্যবস্থা করে

www.amarboi.org

তাঁর বান্দাহদের ওপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন তা উপলব্ধি করলে সৌর মাসের দাবী কারো মনে সৃষ্টিই হতে পারে না। ঈদ রোযার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে আলাদাভাবে সৌর মাসের হিসেবে ঈদ পালন করার উপায় নেই।

এছাড়া আপনার বক্তব্য অনুযায়ী ইংরেজী তারিখের দিনও সরাবিশ্বে একই সময় হয় না। আমাদের দেশে যখন 'দিন' তখন ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে 'রাত' হয়ে থাকে। আবার সেসব দেশে যখন 'দিন' হয় আমাদের দেশে তখন 'রাত' থাকে। এমনি এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে সময়ের আরও বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান আছে এবং এটাও আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখা 'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ' নামক বইয়ের ২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন —'জীবনের অগণিত সমস্যায় মানুষ যখন মুক্তির সন্ধানে... শুধু রবিবারে গির্জায় আমার আনুগত্য দাবী করে।' এখানে প্রশ্ন হলো আল্লাহ বা ইসলাম তো মানুষের অগণিত সমস্যার পার্থিব সমাধান দেয় না, শুধু পরকালের ভয় ও লোভের মধ্যে সীমিত রাখে। যেমন একটি নিষ্পাপ শিশুকন্যা বড় হয়ে মানব নামক পশুর দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে সমাজে বিচার না পেয়ে আমৃত্যু মানবেতর জীবন যাপন করছে। কই খোদা তো এর পার্থিব কোনো সমাধান দিলেন না। বলবেন এর জন্য সমাজ দায়ী। তবে সমাজের অপরাধের জন্য শাস্তি এ অসহায় নারী পাবে কেন ?

উত্তর ঃ আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, আমার লেখা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ বইয়ের ঐ উদ্ধৃতির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ঐ বইতে একথাই বলেছি যে, কুরআনে আল্লাহ গির্জার গড (God)-এর মতো শুধু পূজাই দাবী করেন না, তিনি কুরআনে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধানও দান করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীরা স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মীয় সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই আল্লাহর বিধান সন্ধান করার প্রয়োজন মনে করে না। ধর্মকে এ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করার জন্য অন্যসব ধর্ম রাজী থাকলেও কুরআন এতে রাজী হয়নি। শুধু ধর্মীয় অংশটুকু মানা এবং অন্যান্য বিধান অমান্য করা গোটা কুরআনকে অমান্য করার সমান বলেই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। তাই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কুরআনের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমার ঐ বইতে এ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা করেছি।

আপনার যে প্রশ্ন তার বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ যেসব বিধান দিয়েছেন সে বিধান সমাজে চালু করার দায়িত্ব মানুষের। আল্লাহ তা মানতে বাধ্য করেননি। সমাজে ইসলামী বিধান চালু হলে এ জাতীয় ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক নয়। যদি কোনো নরপশু দ্বারা এ ধরনের ঘটনা ঘটে, তবে ইসলামী আইনে দোষী ব্যক্তির চরম শাস্তি ও নির্যাতীত ব্যক্তির জন্য সুব্যবস্থা সে সমাজে অবশ্যই করা হবে। বর্তমানে অনৈসলামী সমাজের একটি ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করার দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পক্ষে কোনো যুক্তির সৃষ্টি হয় না। আপনার উদাহরণে হয়নি।

প্রশ্ন ঃ সমাজে একশ্রেণীর লোক শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে; আর দরিদ্রতার কষাঘাতে সুশিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হয়ে ধর্মপালন ও জানার

www.amarboi.org

সুযোগ পাচ্ছে না। এটা কি স্রষ্টার বিধান ? যদি তা না হয় তবে এর প্রতিকার কি বা এদের সান্ত্বনা কোথায় ?

উত্তর ঃ এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার বিধান দায়ী নয়। বরং এটা স্রষ্টার বিধান জারি না থাকারই কুফল। ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী সরকার, ইসলামী আইন, ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাই এ জাতীয় দূরবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। স্রষ্টার বিধানের অনুপস্থিতিতেই এ জাতীয় দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্রষ্টার ঐ বিধান সমাজে চালু করার দায়িত্ব মানুষের ওপরই দেয়া হয়েছে। সে বিধান চালু না করলে সমাজ এ রকম দুরবস্থায় পতিত হবে—এটাও আল্লাহরই বিধান।

প্রশ্ন ঃ 'মাওলানা' শব্দের অর্থ কী ? এটি কি কুরআনের শব্দ ? দুনিয়ার 'প্রথম মাওলানা' কে ছিলেন ? তাঁর নাম ও কার্যপ্রণালী কেমন ছিল ? বিস্তারিতভাবে জানালে বাধিত হবো।

উত্তর ঃ 'মাওলানা' শব্দের অর্থ 'কর্ম সম্পাদনকারী, পৃষ্ঠপোষক'। মাওলানা মানে আমাদের পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারী। কুরআন মজীদে এর দ্বারা আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। মাওলানা শব্দের আরও কয়েকটি অর্থ আছে। যেমন–বন্ধু, সাহায্যকারী ইত্যাদি।

আমাদের দেশে এ শব্দটি দ্বীনি আলেমদের জন্য ব্যবহার করা হয়। সুদানে উচ্চ শিক্ষিত লোকদের জন্য এ শব্দটির ব্যবহার চালু আছে। অন্যান্য আরব দেশে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণতঃ যেমন গুণব্যচক নাম আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হয় তা মানুষের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। আল্লাহর কতক গুণবাচক নাম কোনো অবস্থায়ই অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কিন্তু কোনো কোনো গুণবাচক শব্দ আল্লাহ নিজেও কুরআনে মানুষের জন্য ব্যবহার করেছেন।

যেমন—'মুমেন, আলী, রাউফুর, রাহীম'। এ কারণেই আরো কতক শব্দ মানুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ বলে উলামায়ে কেরাম মনে করেন। 'ওয়ালী' ও 'মাওলানা' শব্দ তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু এই শব্দ আল্লাহ এবং মানুষের জন্য ব্যবহার করা হলেও একই অর্থে ব্যবহার করা হয় না। যেমন 'মুমেন' শব্দ আল্লাহর সাথে ব্যবহার করা হলে অর্থ হয় 'নিরাপত্তাদাতা'। মানুষের জন্য ব্যবহার করা হলে তার অর্থ হয় নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। তেমনি 'ওয়ালী' শব্দ আল্লাহর সঙ্গে ব্যবহার করা হলে তার অর্থ হয় অভিভাবক, স্নেহপরায়ণ। আর এ শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় আল্লাহর স্নেহভাজন বা আল্লাহর অভিভাবকত্বের অধীন।

মাওলানা শব্দ মানুষের সাথে ব্যবহার করলে অর্থ হয় আল্লাহর হেফাজতপ্রাপ্ত। দ্বীনের ইল্‌ম থাকার কারণে গোমরাহী থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন বলেই এ শব্দটি তার প্রতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। দুনিয়ায় কোন্ ব্যক্তি পয়লা মাওলানা উপাধির অধিকারী হয়েছিলেন তা আমার জানা নেই।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ মাসিক পৃথিবী আগষ্ট '৮৯ সংখ্যায় 'মাওলানা' সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তর পড়ে আমার মনে অত্যন্ত খটকার সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরের শেষাংশে আপনি বলেছেন— মাওলানা শব্দ মানুষের সাথে ব্যবহার করলে অর্থ হয় আল্লাহর হেফাজতপ্রাপ্ত। দ্বীনের ইলম থাকার কারণে গোমরাহী থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন বলেই এ শব্দটি তার প্রতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।'

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই উত্তরের পক্ষে কুরআন-হাদীসের দলিল কি ? বাংলাদেশে টাইটেল পাশ যে কোনো ব্যক্তিকেই 'মাওলানা' বলা হয়, কিন্তু এই ব্যক্তিকে আল্লাহ গোমরাহী থেকে রক্ষা করেছেন কিনা আমরা বুঝবো কি করে ? আপনার কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনি ইল্‌ম যাদের মধ্যে আছে তারাই শুধু গোমরাহী থেকে মুক্ত। এ ছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি যার ইল্‌ম নেই, কিন্তু সে ফরয, ওয়াজিব, হারাম-হালাল মেনে চলেন এবং আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি, সে-ও কি গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত? আর আপনার এই যুক্তির ভিত্তিতে আমরা এটাই মনে করবো যে, বাংলাদেশের যে সমস্ত মানুষের নামের শুরুতে 'মাওলানা' লাগানো হয়, তাদের অধিকাংশই মাওলানার যোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ কাদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করেছেন আর কাদেরকে রক্ষা করেননি তা আমাদের জানা নেই। এ ব্যাপারে দলিল দিয়ে বুঝিয়ে দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর ঃ মাওলানা শব্দের ব্যবহার করা কুরআনের নির্দেশ নয়। তাই ইতিপূর্বে আমি যে ব্যখ্যা দিয়েছি তার দলিল কুরআন থেকে দেয়ার দাবী করা অযৌক্তিক।

আমার বক্তব্যকে ভিত্তি করে এর বিপরীত যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে তা-ও অযৌক্তিক। যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে 'মুসলিম' বলে। 'মুসলিম' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী। কিন্তু যত লোককে আমরা 'মুসলিম' বলি সবাই কি আত্মসমর্পণকারী ? আর কেউ বাস্তবে আত্মসমর্পণকারী না হলেই তাকে কি আমরা 'অমুসলিম' বলি ?

তেমনিভাবে যাদেরকে মাওলানা বলা হয় তারা সবাই গোমরাহী থেকে রক্ষা পেয়েছেন বলে নিশ্চয়তা কে দেবে ? আর সেটা জানারই বা উপায় কী ? আর তা জানতে না পারার কারণে তাকে মাওলানা বলাই যাবে না এমন দাবী করা কি যুক্তিপূর্ণ ?

এ সম্পর্কে আমার পূর্বের জবাবে উল্লেখ করেছি যে, শব্দটি আমাদের সমাজে যেভাবে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জন্য ব্যবহার করা হয় সেভাবে আরব দেশে ব্যবহৃত হয় না। একটা পরিভাষা হিসেবে আমাদের সমাজে এটা চালু হয়ে গেছে। এ পরিভাষা ব্যবহারে কারো আপত্তি থাকলে তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারেন। কিন্তু যাদের নামের সাথে এ পরিভাষা ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে এ পরিভাষার তাৎপর্য আছে কি না তা বিচার করার ইখতিয়ার আমার নেই।

এ ছাড়া আপনার বক্তব্য অনুযায়ী যে ব্যক্তি ফরয, ওয়াজিব, হালাল-হারাম মেনে চলেন সে বে-এলেম নয়। ইল্‌ম না থাকলে তা করা সম্ভব নয়। আল্লাহওয়ালা হতে গেলেও ইলমের প্রয়োজন।

www.amarboi.org

প্রশ্ন ঃ 'প্রভু' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার জায়েজ কি না ? জনৈক আবদুল খালেক রচিত 'আমাদের ভাষা ও রচনা'-র ২৮ পৃষ্ঠায় 'প্রভু' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'প্রভুপত্নী' লিখা রয়েছে। অনুগ্রহ করে জবাব দানে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ প্রভু শব্দটি আল্লাহ শব্দের বিকল্প নয়। আল্লাহ ছাড়াও প্রভু শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত আছে। ভৃত্যের বিপরীত শব্দ হিসেবেও প্রভু শব্দটি ব্যবহার করা হয়। রাজা, বাদশাহ, স্বামী, হুকুমকর্তা ইত্যাদি অর্থে প্রভু শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কারণেই তাদের স্ত্রীদেরকে প্রভুপত্নী বলা হয়।

ইসলামী পরিভাষায় এ শব্দটির ব্যবহার সঠিক নয়। মুসলমানগণ আল্লাহকেই একমাত্র প্রভু বা মনিব বলে বিশ্বাস করে। তাই ইসলামী সাহিত্যে মানুষের জন্য 'প্রভু' শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায় না।

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী মহিলা কলেজে অনার্স কোর্স নেই। কিছু কিছু মহিলা কলেজে অনার্স কোর্স আছে। পাশ কোর্সে ডিগ্রী পড়ার ব্যবস্থাও আছে। প্রাইভেট মাষ্টারস কোর্সও করা যায়। এটুকু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্ট্যাটাস বাড়ানোর জন্য বা ভবিষ্যতে ভালো চাকরী করার জন্য অনেক ধার্মিক পরিবারের মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ার জন্য বোরকা পরে ছেলেদের পাশে বসে ক্লাশ করছে। এ অবস্থায় মেয়েদেরকে অনার্স পড়োনো জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ যারা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েম করতে আগ্রহ রাখেন তারা সঙ্গত কারণেই শিক্ষাব্যবস্থাকেও ইসলামের ছাঁচে ঢালাই করার গুরুত্ব অনুভব করেন। এর স্বাভাবিক দাবী ছিল মেয়েদের পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। যদি মেয়েরা বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ডিগ্রির অধিকারী না হয় তাহলে মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কি করে সম্ভব হবে ? উপযুক্ত অধ্যাপিকার অভাবে বহু মহিলা কলেজেও অধ্যাপক কর্মরত রয়েছে। সহশিক্ষার অভিশাপ থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হলে মহিলাদের অনার্স ডিগ্রি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ্রেণীর ছাত্রী যে ধরনের অশালীন পোশাক পরে, সেখানে বোরকা পরে যাওয়ার হিম্মত যে ছাত্রীরা করে তারা জিহাদের বিরাট দায়িত্বই পালন করছে। এর দ্বারা ছাত্রীসমাজের ওপর তাদের নৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। ইসলামের পর্দার বিধান শুধু মাওলানা সাহেবদের ওয়াজ দ্বারা কখনও সমাজে বাস্তবে চালু হতে পারে না। বোরকা পরে যে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ সৎসাহসের পরিচয় দিচ্ছে এবং তা ওয়াজের তুলনায় অনেক বেশী বাস্তব ও কার্যকর।

এক শ্রেণীর ডিগ্রিধারী মহিলা ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে অথবা তাদের পারিবারিক পরিবেশের কারণে অথবা তথাকথিত ভোগবাদী পুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম মহিলাদেরকে অশ্লীলতার দিকে উদ্বুদ্ধ করার যে ঘৃণ্য অভিযান চালাচ্ছে তা রোধ করা পুরুষদের দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। উচ্চ শিক্ষিতা ঈমানদার মহিলারা তাদের বাস্তব জীবন দিয়ে মহিলা সমাজের নিকট উদাহরণ স্থাপন করতে সক্ষম হলেই এ

www.amarboi.org

কলঙ্ক থেকে সমাজকে উদ্ধার করা সম্ভব। এ জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বীনদার মহিলাদেরকে বেশী সংখ্যায় ডিগ্রী নেয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—'রাসূলে খোদা (সাঃ) লোকদের নীচে রেখে ইমামকে উচ্চাসনে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।'—দারুকুত্নী

এ হাদীস অনুসারে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বা বসে নীচে উপবিষ্ট জনতার উদ্দেশ্যে ওয়াজ নসীহত বা বক্তৃতা করা অথবা মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়া কি অবৈধ নয় ?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিয়েছেন এবং শ্রোতাগণ তাঁর থেকে নীচে বসে খুৎবা শুনেছেন। খুৎবা মানেই বক্তৃতা। সুতরাং উচ্চ মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেয়া শরীয়তে নিষেধ নয়। এ নিষেধাজ্ঞা শুধু নামাযের জন্যই প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ জ্বীন এবং ইনসান এই দুই জাতির বিচার করবেন। ইবলিস জ্বীন জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং মানুষের প্রধান শত্রু। প্রশ্ন হলো—মানুষের মতো জ্বীনেরা যদি মরণশীল হয়, তবে ইবলিস কিয়ামত পর্যন্ত কিভাবে বেঁচে থাকবে ? আমাদের প্রধান শত্রু যেমন ইবলিস, জ্বীনদের কি অনুরূপ কোনো শত্রু আছে ? না থাকলে কেন ? মানুষ মাটির তৈরি, আগুনের দ্বারা তার আযাব হবে। জ্বীনেরা আগুনের তৈরি, তাদের কোন ধরনের আযাব হবে ? কিয়ামত কি একই সময়ে হবে ?

উত্তর ঃ মানুষের মতো জ্বীনেরা মরণশীল। তবে তাদের হায়াত কতটুকু লম্বা তা জানা যায় না। 'ইবলিস' জ্বীন জাতির একজন ব্যক্তি। শুধু সে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করেছিল। তা মঞ্জুর হওয়ার কারণেই সে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। তার এ দরখাস্ত থেকে প্রমাণ হয় জ্বীন মরণশীল। তা না হলে এ দরখাস্তের প্রয়োজন হতো না। মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এই ইবলিসেরই নেতৃত্বে জ্বীন ও ইনসানের মধ্যে বিরাট বাহিনী তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা ইবলিসকে আমাদের মহাশত্রু বলে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। জ্বীন জাতিরও অনেককে ইবলিস পথভ্রষ্ট করে এবং তার অনুসারী বানায়। সে হিসেবে ইবলিস জ্বীন জাতিরও তেমনি শত্রু যেমন মানুষের শত্রু।

কুরআনে আল্লাহ পাক স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহর নাফরমান জ্বীন এবং মানুষকে দোযখে দেবেন। দোযখের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে বহুগুণ বেশী উত্তপ্ত বলেই জ্বীনদের শাস্তি আগুন দিয়ে দেয়া সম্ভব। যেমন মাটির তৈরী মানুষকে মাটির ঢেলা দিয়ে আঘাত করলে ব্যথা পায় এবং আগুনে তৈরি জ্বীনকে অধিক শক্তিশালী আগুন দিয়ে আযাব দেয়া হবে।

কিয়ামত, হাশর, বিচার এ সবই জ্বীন-ইনসানের একই সাথে হবে বলে বুঝা যায়। এ বিষয়ে পৃথক ব্যবস্থার কথা কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই।

প্রশ্ন ঃ 'মিশকাতুল মাছাবীহ' বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর ঃ 'মিশকাত শব্দের অর্থ তাক—যেখানে কোনো জিনিস রাখা হয়। যেমন

www.amarboi.org

দেয়ালে, আলমীরায়, সেলফ-এর মধ্যে তাক থাকে। 'মাছাবীহ' শব্দটি 'মিছবাহুন' শব্দের বহুবচন। 'মেছবাহ' অর্থ 'প্রদীপ' বা বাতি।

'মিশকাতুল মাছাবীহ' একটি বিখ্যাত এবং সংক্ষিপ্ত হাদীস সংকলনের নাম। সহীহ হাদীসের প্রসিদ্ধ সংকলনগুলো থেকে বাছাই করে যেসব হাদীস মুসলমানদের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন বলে সংকলক মনে করেছেন তা তিনি এখানে একত্র করে দিয়েছেন।

বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে হাজার হাজার হাদীস রয়েছে। সকলের পক্ষে তত বেশী হাদীস অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। সম্ভবত এদিকে খেয়াল করেই মিশকাত শরীফের সংকলক একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন তৈরি করার প্রয়োজন মনে করেছেন। হাদীসের আলো সংগ্রহ করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এর নামকরণ করেছেন 'প্রদীপের তাক'। এ নাম দিয়ে তিনি যেন বলতে চাচ্ছেন, যারা রাসূলের কাছ থেকে আলোর সন্ধান করতে চান তাঁরা এ তাকের মধ্যে সে আলো পাবেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কবরের স্থান নির্বাচন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বলে যাওয়া কথা অনুযায়ী হয়েছিল, না খলিফার নির্দেশ অনুযায়ী হয়েছিল ? সঠিক উত্তর বা তথ্য জানতে চাই।

উত্তর ঃ রাসূল (সাঃ)-এর কবরের স্থান নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর যখন এ প্রশ্ন সৃষ্টি হলো যে, তাঁর কবর কোথায় হবে তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সবাইকে এ খবর দিলেন— আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, নবীর মৃত্যু যে স্থানে হয় সেখানেই তার কবর হওয়া উচিত।

সুতরাং রাসূল (সাঃ)-এর কবরের স্থান কোনো খলিফার ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়নি। আল্লাহ যেখানে তাঁর মৃত্যু নির্দিষ্ট করেছেন সেখানেই তাঁর কবর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ 'মিল্লাত' শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী ? এর রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা দিলে উপকৃত হবো। অথবা কোনো তাফসীরে এর বর্ণনা থাকলে নির্দেশনা দেবেন।

উত্তর ঃ 'মিল্লাত' শব্দটি কুরআন মজীদে কয়েক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ বাংলায়-আদর্শ, পন্থা, নীতি ইত্যাদি। আর ইংরেজীতে Creed, Cult ইত্যাদি। ইমাম রাগেব তাঁর মুফরাদাতের মধ্যে মিল্লাত শব্দটিকে দ্বীনের সামর্থক শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কুরআন মজীদে 'মিল্লাতা আবীকুম ইবরাহীম' শব্দে দ্বীনই বুঝানো হয়েছে। কুরআনে বাতিল দ্বীনের জন্যও মিল্লাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউসুফের ৩৭ আয়াতে ইউসুফ (আঃ) বলেছেন—'যে কাওম আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না আমি তাদের মিল্লাত ত্যাগ করছি।

প্রশ্ন ঃ ইদানিং জন্মদিন ও বিবাহ দিবস পালন করার প্রচলন শুরু হয়েছে। বিদেশে এর প্রচলন বেশী। অনেকে জন্মদিবসে কেক কাটার পাশাপাশি দোয়ার অনুষ্ঠানও করেন। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কী ?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ সন্তানদের জন্মদিবস পালন, বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠান করা এবং এ জাতীয় যতসব সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে। এগুলোকে সরাসরি হারাম বলা যায় না। এ সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে যেসব কাজ করা হয় সে কাজগুলো যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ না হয় তাহলে এ ধরনের দিবস পালনককে গুনাহের কাজ বলা ঠিক নয়।

এটা সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, সমাজের সচ্ছল লোকেরাই এসব অনুষ্ঠান করে থাকে। একই লোক যে গরীব অবস্থায় এগুলো করেনি, সে যখন পয়সাওয়ালাদের দাওয়াতে যেয়ে সেখানে উপহার দিতে বাধ্য হয় তখন পাল্টা উপহার পাওয়ার জন্য সে-ও অনুষ্ঠান শুরু করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব কাজ হচ্ছে পয়সাওয়ালাদের এক প্রকার বিলাসিতা

আমাদের দেশের শতকরা কতজন লোকের পক্ষে এ বিলাসিতা করা সম্ভব তা বিবেচনা করলে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আপত্তিকর দিক হলো এটা যে, গরীব আত্মীয়রা পয়সাওয়ালা আত্মীয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ গরীব আত্মীয়দেরকে এ জাতীয় দাওয়াত কমই দেয়া হয়। আর যদি কোনো গরীব আত্মীয় একবার আসে এ উপহারের বহর দেখে তার নিজের উপহার দেয়ার অক্ষমতার কারণে লজ্জিত হয় এবং পরে আর আসতে সাহস পায় না।

প্রশ্ন ঃ পবিত্র ঈদুল আযহার যে কুরবানী আমরা দিয়ে থাকি তা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বদলে তখন একটি দুম্বা কুরবানী হয়। অর্থাৎ একটি জানের ছদকা একটি জান। কিন্তু আমরা ১টি গরু বা উটের কুরবানী ৭টি নামে দেই কেন ? এটা কী করে সম্ভব ? বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর ঃ শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে নীতিগতভাবে একথা আমাদের জানা দরকার, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমকে বিনা যুক্তিতে মেনে নিতে হবে। কারণ সবকিছুরই যুক্তি বুঝার ক্ষমতা কারোই হতে পারে না। এ জন্যেই মুমিনের নিকট এ যুক্তিই যথেষ্ট যে, আল্লাহ যেটা হুকুম করেছেন সেটা করব আর যেটা নিষেধ করছেন সেটা করবো না।

এরপরও মানুষের মনে প্রশ্নে সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এ হুকুমটা কেন করা হলো, এর পেছনে কি যুক্তি আছে, এটা কি কারণে নিষেধ করা হলো ইত্যাদি জানার যে আগ্রহ সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক সে যুক্তি তালাশ করাও দূষণীয় নয়। কিন্তু যুক্তিপূর্ণ হলে মানবো, না হলে মানবো না—এ মনোভাব আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালনের ব্যাপারে ঈমানের পরিচায়ক নয়। বরং যুক্তি তালাশ করে পেলে পালন করতে অধিকতর তৃপ্তি পাওয়া যায়।

এ হিসেবে ছাগল ভেড়া, দুম্বা এক নামে দেয়া আর গুরু উট ইত্যাদিতে ৭ নামে দেয়া যাবে এর যুক্তি আমি তালাশ করে পাইনি। যদি মূল্যের বিবেচনা করা হয় তাহলে একটি খাসির এমন মূল্যও হয় যা সাধারণ গরুর মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং আল্লাহর রাসূল যেসব পশুর বেলায় ৭জনের নাম দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন সে অনুমতির যুক্তিতেই আমরা কুরবানী দিয়ে থাকি। কিন্তু যেসব পশুর কুরবানীতে ৭টি

www.amarboi.org

নামের কুরবানী দেয়া যায় সেগুলোতে ৭টি নামই দিতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কেউ ইচ্ছে করলে ১ নামেও ১টি গরু দিতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ অনেক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বলেন যে, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার বন্ধন অচল হয়ে গেছে। কারণ মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম ইউরোপে কয়েকটি রাষ্ট্রের ভৌগলিক সহাবস্থান, ভাষাগত ঐক্য এবং ধর্মীয় ঐক্য থাকা সত্ত্বেও এক জাতিতে পরিণত হতে পারছে না। বাস্তবেও কি তাই ? তাই যদি না হয়, তবে সৌদি আরবের পাশাপাশি বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও এবং পৃথিবীতে প্রায় ৪৫টির অধিক মুসলিম রাষ্ট্র থাকা অবস্থায় দুনিয়ায় প্রায় ১০০ কোটিরও অধিক মুসলমান একটা বৃহৎ জাতি গঠনপূর্বক একক বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতে পারছে না কেন ? এতে প্রতিবন্ধকতা কোথায় ?

উত্তর ঃ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা ইসলামী জাতীয়তা নয়। ইসলাম মানুষের শুধু ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ পরিপূর্ণ একমাত্র বিধান। এ বিধানে বিশ্বাসী দুনিয়ার সকল মানুষকে একই রাষ্ট্রভুক্ত হওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। কিন্তু যেসব রাষ্ট্র সত্যিকারভাবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তাদের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তাবোধ তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিরাট শক্তির উৎস। আল ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলো পরিচালিত না হওয়ার কারণেই মুসলিম জাতি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতে পারছে না।

প্রশ্ন ঃ লেখাপড়া জানে না এমন ব্যক্তিকে কেউ যদি যে কোনো আরবী কথাবার্তাকে কুরআনের আয়াত অথবা হাদীস বলে বিশ্বাস করাতে চায় তখন কিভাবে সে এ গোমরাহী থেকে রেহাই পাবে ?

উত্তর ঃ আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ এমন লোক রয়েছে যারা মাতৃভাষার একটি অক্ষরও শিখেনি। অথচ শৈশবকালে মসজিদে-মক্তবে কুরআন পড়া শিখছে এবং আজীবন নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করছে। তারা সাধ্যমতো আলিমদের কাছ থেকে ইসলামকে জেনে আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা করছে। নিরক্ষর মুসলমানেরা ইসলামকে না জানার কারণে আমলের দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম চরিত্রের অধিকারী না হলেও ইসলাম বিরোধী নয়। তাদেরকে যে কোনো আরবী কথা কুরআন বলে বিশ্বাস করানো স্বাভাবিক নয়। কারণ যারা গোমরাহ করে তারা এর জন্য আরবী ভাষা ব্যবহার করে বলে আমাদের জানা নেই। গোমরাহ করার জন্য হাজারো পথ খোলা আছে এবং আরো সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়া আমাদের ঈমানের দিক দিয়ে যারা গোমরাহ তারা নিরক্ষর লোক নয়। শিক্ষিত লোকদের একাংশই চিন্তার ক্ষেত্রে গোমরাহ বলে প্রমাণ দিচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সাঃ)-এর মধ্যে দুটো সত্তা ছিল (১) মানব সত্তা ও (২) পয়গাম্বর সত্তা। মানব সত্তার দিক দিয়ে রাসূল (সা) কোনো কোনো ভুল করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পয়গাম্বর সত্তার (ওহীর) দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধি রাসূল (সা) কোন সত্তার ভিত্তিতে করেছিলেন এ সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

www.amarboi.org

উত্তর ঃ সূরা আল ফাতহ-এর তাফসীর থেকে একথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি নবী করীম (সাঃ) ওহীর দ্বারা নির্দেশ পেয়েই সম্পন্ন করেছিলেন। কুরআন মজীদের যে কোনো তাফসীর অধ্যয়ন করলে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে। কারণ এ ব্যাপারে মুফাসসীরগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

প্রশ্ন ঃ বাইয়াতে রিদওয়ানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ)-এর হাতে জীবন দেয়ার শপথ করেছিলেন। সেই সাহাবা কেন হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসূল (সাঃ)-কে বাধা দিলেন ? সাহাবাদের এই আচরণ কি বাইয়াতের বিপরীত হয়নি ?

উত্তর ঃ এ ধারণা ঠিক নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়ার সন্ধির বিরোধিতা করেছিলেন। রাসূল (সা)-এর নির্দেশে যে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর পথে জীবন কুরবান করার জন্য প্রস্তুত হলেন তাঁদের পক্ষে নবী করীম (সাঃ)-এর কোনো কাজের বিরোধিতা করার প্রশ্নই ওঠে না। প্রকৃতপক্ষে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো ইসলাম ও রাসূল (সাঃ)-এর মর্যাদার খেলাফ বলে সাহাবায়ে কেরামের মনে খটকা ছিল। বাইয়াতে রিদওয়ানে সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের মর্যাদার জন্যই জীবন দিতে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। 'সন্ধির শর্তাবলী কিভাবে ইসলামের মর্যাদার রক্ষক হতে পারে'—একথা সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারছিলো না। কারণ আপাতঃদৃষ্টিতে সন্ধির শর্তসমূহ অসম্মানজনক বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এমনকি মক্কার কাফির নেতৃবৃন্দের দাবীতে সন্ধিপত্রে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি পর্যন্ত বাদ দেয়ার দাবী সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে কবুল করা সত্যিই কঠিন ছিল।

কিন্তু যখন রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশেই সন্ধির শর্তগুলো মেনে নিচ্ছেন তখন সাহাবাগণ আর আপত্তি করেননি।

'এ সন্ধি ইসলামের জন্য কেমন করে কল্যাণকর হবে'—একথা স্পষ্ট না বুঝার কারণে মনের দিক দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম তখনও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই সন্ধির পর সাহাবায়ে কেরাম বিষণ্ন মনে মদীনায় ফেরত যাবার পথে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ প্রিয় বান্দাহদের মনের খটকা দূর করে তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সূরায়ে আল ফাতহ নাযিল করলেন।

উক্ত সূরার শুরুতেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করলেন যে, হুদায়াবিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য শুধু সম্মানজনকই নয়, বরং এটা সুস্পষ্ট বিরাট বিজয়। এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর ঐ বান্দাহদেরকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন মনে করলেন যারা তাঁর দ্বীনের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁদেরকে মনমরা অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকতে দিতে তিনি কিছুতেই পারলেন না।

প্রশ্ন ঃ কুরবানী আসলে কোটি কোটি টাকার পশু জবাই করা হয়। এতে বহু গবাদি পশু ক্ষয় হয়ে থাকে। ফলে নাস্তিক্যবাদীরা গরীব দেশের অজুহাত দেখিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। সুতরাং এ মুহূর্তে অন্যকোনো কায়দায় কুরবানী করা যাবে কি না ?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে হজ্ব-এর ৩৪ থেকে ৩৭ আয়াতে কুরবানী সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।-'সকল নবীর উম্মতকেই কুরবানী করার হুকুম দেয়া হয়েছে।' যে সমস্ত গৃহপালিত পশু মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যেই পশু কুরবানীর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ঐ সূরায় ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে-'আল্লাহ তায়ালার নিকট কুরবানীর গোশত বা রক্ত পৌঁছে না।' ৩৬ আয়াতে কুরবানীর গোশত সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যারা কুরবানী দেয় তারা নিজেরাও এ গোশত যেন খায় আর আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও গরীব-মিসকিনকেও যেন খাওয়ায়। এ ব্যবস্থা এই জন্যই করা হয়েছে যাতে তারা আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে পশু কুরবানী দেয়।

৩৭ আয়াতের শেষ অংশে কুরবানীর আরও একটি উদ্দেশ্য এই বলা হয়েছে 'আল্লাহু আকবার' বলে পশু জবেহ করার মাধ্যমে কুরবানীদাতার এ জযবা যেন প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেছেন বলেই কুরবানীর পশুর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তায়ালার বলে স্বীকৃতি দিতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে কুরবানীর মাধ্যমে একদিকে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ ও হেদায়াত করার শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং অপরদিকে মানব জীবনের জন্য হাজারো রকমের উপকারী পশুকে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। নামায-রোযার দ্বারা দৈহিক ও মানসিক নিয়ামতের শুকরিয়া, যাকাত দ্বারা মালের শুকরিয়া এবং হজ্বের দ্বারা জান ও মালের শুকরিয়া আদায়ের সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যারা আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের ধার ধারে না এবং যারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের কোনো জযবা মনে পোষণ করে না তারা ইসলামের কোন্ বিধানের কী অপব্যাখ্যা করছে তার কোনোরূপ পরোয়া করা কোনো ঈমানদারের জন্য শোভা পায় না। তারা তো ইসলামের কোনো কিছুকেই পছন্দ করে না। সুতরাং তাদের কোনো কথা সামান্য গুরুত্বের দাবীও রাখে না।

এ কুরবানীর মাধ্যমে গরীব দেশের লাখ লাখ পশুর অপচয় হয় বলে যে পণ্ডিত মূর্খরা আপত্তি তোলে তাদের কি একথাটুকু বোঝাবারও যোগ্যতা নেই যে, কুরবানীর দ্বারা আসলে গরীবেরাই প্রধানত উপকৃত হয়। প্রথমত সাধারণ লোকেরাই কুরবানীর হাটে ভালো মূল্য পাওয়ার আশায় যত্নের সাথে গরু-ছাগল লালন-পালন করে এবং কুরবানীর সময় ধনীদের কাছ থেকে এর উচ্চমূল্য হাসিল করার সুযোগ পায়। কুরবানীর এ সুযোগ না থাকলে সাধারণ লোক এভাবে পশু পালনে মনোযোগী হতো না। দ্বিতীয়তঃ কুরবানীর গোশতের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ এমনসব গরীব লোকেরা খেতে পায় যারা হয়তো সারা বছরও গোশতের মুখ দেখতে পায় না। তা ছাড়া কুরবানীদাতার গরীব আত্মীয়-স্বজনদের যারা কুরবানী দিতে সক্ষম নন তারাও কুরবানী

www.amarboi.org

গোশত থেকে বঞ্চিত থাকেন না। তৃতীয়তঃ কুরবানীর চামড়ার মূল্যও গরীবেরাই পায়। এমনকি এসব পশুর ফেলে দেয়া হাড়গুলোও গরীব লোকেরা কুড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করে উপকৃত হয়।

যারা চিন্তাশীল তারা একথা সহজেই বুঝতে পারে যে, কুরবানীর কারণে পশুসংখ্যা কমে না, বরং কুরবানীর প্রয়োজনেই পশুর সংখ্যা বাড়ে। 'যে জিনিসের চাহিদা থাকে সে জিনিসেরই উৎপাদন বেশী হয়।'—অর্থনীতির এ সাধারণ নিয়ম পশুর বেলায়ও সত্য। গরু একবারে একটি মাত্র বাচ্চা প্রসব করে আর কুকুর-বিড়াল একবারে একটি থেকে ছয়টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। অথচ মানুষ 'কুকুর-বিড়াল' না খাওয়া সত্ত্বেও তাদের সংখ্যা বিরাট হয় না। কারণ বাজারে তাদের কোনো চাহিদা নেই বলে এর উৎপাদনের চেষ্টা কেউ করে না।

প্রশ্ন ঃ সাহাবীদের শানে কুরআন পাকে কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে কি ? সাহাবীদের নাম বলার পর 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' বলতে হয় কেন ?

উত্তর ঃ সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী সম্পর্কে পরোক্ষভাবে কুরআন মজীদে বহু জায়গাতেই উল্লেখ রয়েছে। সূরা আল-ফাতহ-এর ২৯ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীদের প্রশংসা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সাথী তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে খুবই দয়াশীল। তাদেরকে তোমরা রুকু সেজদায় রত এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষের তালাশে মগ্ন দেখতে পাবে'।

কুরআন শরীফে বহু জায়গায় পাশাপাশি মু'মিনদের গুণাবলী ও বেঈমানদের দোষত্রুটি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে ঐসব ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে সাহাবায়ে কেরামেরই গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে। হুদায়াবিয়ার সন্ধির পূর্বে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে কুরাইশদের মোকাবিলায় জান কুরবান করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ)-এর হাতে যে বাইয়াত করেছিলেন সেকথা উল্লেখ করে সূরায়ে আল ফাতহ'র ১৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন—'হে রাসূল গাছের নিচে যে মু'মিনগণ আপনার হাতে বাইয়াত হয়েছে আল্লাহ তাদের ওপরে সন্তুষ্ট (রাজী) হয়েছেন।' সাহাবায়ে কেরামের ওপর আল্লাহর এ সন্তুষ্টির সুস্পষ্ট ঘোষণার কারণেই সাহাবীদের নাম বলার পর 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' বলতে হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার লিখিত 'ইকামাতে 'দ্বীন' গ্রন্থ পড়ে বুঝতে পারলাম মুসলিম লীগ মাওলানা মাওদূদী (রাহঃ)-এর 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' বইটিকে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহঃ)-এর 'একজাতি তত্ত্ব'-এর বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এরপরে ১৯৪০ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা মওদূদীর 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' শীর্ষক বক্তৃতার ফলে মুসলিম লীগ মহল তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। কারণ সেখানে ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচী ছিল। মুসলিম লীগ তাঁর কর্মসূচীতে সাড়া না দেয়ায় তিনি 'জামায়াতে ইসলামী' গঠন করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জামায়াত গঠনের

www.amarboi.org

পর মাওলানা মওদূদী ও তাঁর দলের ভূমিকা কি পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে ছিল ? কেউ কেউ এ সময় তাঁর ভূমিকাকে বৃটিশের পক্ষে ছিল বলে মন্তব্য করেন।

উত্তর ঃ মাওলানা মওদূদী ও তাঁর দল মুসলিম লীগে যোগদান না করায় এবং ইসলামের শ্লোগান দেয়া সত্ত্বেও ইসলাম অনুযায়ী কাজ না করার কারণে মুসলিম লীগের সমালোচনা করায় এক শ্রেণীর মুসলিম লীগ নেতা এ জাতীয় অপপ্রচার চালিয়েছে। মাওলানা মাওদূদী মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৯২০ সালে জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক তাজ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বৃটিশ বিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকার দরুন পত্রিকাটিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। তিনি আজীবন বৃটিশ শাসন বিরোধী ভূমিকা পালন করেছেন। তার বিরুদ্ধে এ জাতীয় অপবাদ সত্যের নিকৃষ্ট অপলাপ মাত্র।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতারা মুসলিম লীগ এবং কায়েদে আযমকে বৃটিশের দালাল বলে গালি দিতো। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এভাবে গালি দেয়ার কু-প্রথা আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত। জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে বিরোধীরা যতরকম গালি দিয়েছে তার মধ্যে এটাও একটা।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

কুরআন ◆ ইসলাম
নামায ◆ সিয়াম
যাকাত ◆ হজ্ব
পোশাক ◆ পর্দা
বিয়ে-তালাক ◆ নির্যাতিতা স্ত্রী
অপব্যবহার ◆ হালাল-হারাম
ঘুষ ও জুয়া ◆ অর্থনীতি
মীরাস ◆ তকদীর
ইসলামী আন্দোলন ◆ ইসলামী সমাজ
রাজনীতি ◆ আন্তর্জাতিক

ইতিহাস-ঐতিহ্য
গান-ছায়াছবি ও খেলাধূলা
বিবিধ